আলোচনা-প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় খণ্ড

(পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)

SATSANG PUBLISHING HOUSE
SATSANG.

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক :

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, এস্‌-পি

প্রথম প্রকাশ :

১লা শ্রাবণ, ১৩৬৫

চতুর্থ সংস্করণ :

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪

মুদ্রণ :

প্রিণ্টিং সেণ্টার

১৮বি, ভুবন ধর লেন

কলিকাতা ৭০০ ০১২

বাইণ্ডার :

কৌশিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

১৮বি, ভুবন ধর লেন

কলিকাতা ৭০০ ০১২

মূল্য—তেরো টাকা

Alochana Prasange, 2nd Part (4th Edition)

Price Rs. Thirteen only.

নিবেদন

ছেলেবেলা থেকে একান্ত সাধ ছিল যেন জীবনে এমন কোন কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে পারি, যার ফলে সমগ্র মানব-সমাজকে নিয়ে চিরন্তন কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায়। যখন থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে তাঁর বাণী ও কথোপকথন লিপিবদ্ধ করবার সুযোগ পেলাম, তখন থেকে মনে হ'তো—পরমপিতা বাঞ্ছাকল্পতরু, তিনি আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন, আর আমার চাইবার কিছু নেই। সত্যই আমি ধন্য, কৃতকৃতার্থ। স্বতঃই নিরন্তর যোগযুক্ত থাকব—এমনতর তপস্যার জোর আমার নেই। কিন্তু পরমদয়াল দয়া ক'রে এমন কাজ আমাকে দিয়েছেন যে সেই ব্যপদেশে তাঁর সঙ্গ ও স্মরণ, মনন নিয়তই চলতে থাকে, আর সেইটেই পরম আনন্দের। লেখাগুলির মাধ্যমে পাঠকগণের ভিতর যদি সেই সাত্বত আনন্দ-চেতনা লীলায়িত হ'য়ে ওঠে—সক্রিয় যোগযুক্ত জীবনের পটভূমিকা রচনা ক'রে,—তাহ'লেই বুঝব—আমাদের প্রয়াস সফল ও সার্থক।

এই সঙ্কলন-ব্যাপারে আমরা দুটি দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করেছি। তার একটি হ'লো—শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলির যা'তে বিকৃত পরিবেষণ না হয়, অপরটি হ'লো—যা'তে সেগুলি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়। এগুলি পূর্ব্বেই 'আলোচনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে শোনান হয়েছে এবং প্রয়োজনমত সংশোধন করা হয়েছে। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রেসে দেওয়ার পূর্ব্বেও আমরা সমালোচনী দৃষ্টি নিয়ে ভাল ক'রে দেখে-শুনে দিতে চেষ্টা করেছি। তাই খানিকটা ভরসা হয় যে মূল ভাবধারা মোটামুটি ঠিকই আছে। কিন্তু লেখাগুলি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়েছে কিনা, সে বিচারের ভার পাঠকগণের উপর।

এই খণ্ডে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের মাত্র তিন সপ্তাহের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তখন প্রায় প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে আলোচনা চলতো, প্রত্যুষে অন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা তো আলোচনা-বৈঠক বসতোই, তা'ছাড়া অন্যান্য সময়ও গভীর আলোচনা চলতো। এক-একদিনের কথোপকথন তাই দেখা যাবে অতি বিশাল। তাঁর শ্রীমুখে সেগুলি শুনতে এত ভাল লাগতো, যে মনে হ'তো আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কেবল শুনি আর লিখি। অনেক সময় ঐ সুধানির্ঝ'রে অবগাহন ক'রে ভাবভূরিতায় এমন বিভোরতার সৃষ্টি হ'তো যে অজ্ঞাতে লেখনী বন্ধ হ'য়ে যেতো। পরে বাড়ীতে এসে সেগুলি মোটামুটি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতাম। এইসব ও অন্যান্য কাজ করতে তখন প্রায়ই দৈনন্দিন ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে

হ'তো, কিন্তু কোন ক্লেশ বোধ হ'তো না। একটা নেশার ঘোরে দিনরাত কোনদিক দিয়ে যেতো টের পেতাম না।

তখন বহু জটিল বিষয় নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা চলতো। যাঁরা একক্রমে দীর্ঘ সময় ধ'রে সুগভীর চিন্তা ও আলোচনায় অভ্যস্ত নন, তাঁরা মাথা টনটন করে ব'লে কিছু সময় পরে উঠে পড়তেন। পাঠকদের মধ্যে একাংশেরও তেমনতর অসুবিধা হওয়া অসম্ভব নয়। কারণ, তাঁরা হয়তো কোথাও-কোথাও দেখতে পাবেন, একাদিক্রমে বহু পৃষ্ঠা ধ'রে নিরবচ্ছিন্নভাবে গুরুগম্ভীর আলোচনার স্রোত ব'য়ে চলেছে। এ-সব ক্ষেত্রে আমরা পঠনসৌখ্যের খাতিরে কোন কলাগত বৈচিত্র্যের অবতারণা ক'রে পাঠকবর্গের মানসিক শ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা করিনি। অবশ্য বেশীর ভাগ আলোচনার মধ্যেই একটা রস-বৈচিত্র্যের স্বাদ স্বতঃই অনুভূত হবে। তাই বিশেষ কোন শিল্প বা সাহিত্যরীতির আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে বাস্তবে যা ঘটেছে, আমাদের অপটু লেখনীতে নাংলাভাবে তাই-ই পরিবেষণ করতে চেষ্টা করেছি মাত্র। পাঠকবর্গ সঙ্কলনের দোষত্রুটিকে উপেক্ষা ক'রে বিষয়বস্তুর মর্ম অনুধাবনে তৎপর হ'লে অনুগৃহীত হব।

সৎসঙ্গ (দেওঘর) শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস
৬ই আষাঢ়, ১৩৬৫
২১।৬।১৯৫৮

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

আলোচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। বহু-প্রচারিত এই পুস্তক খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটির ৪র্থ সংস্করণ পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল।

সৎসঙ্গ, দেওঘর প্রকাশক
২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৪

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

অ

আ

ই

চ

ছ

জ

ট

ঠ

ড

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

A

C

D

E

F

G

I

M

P

R

S

T

আলোচনা-প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় খণ্ড

আলোচনা-প্রসঙ্গে

২৫শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৪৮ (ইং ১০।১২।৪১)

'তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে-গেঁথে আনে।' ছিন্ন জীবন গ্রথিত হয় তাঁর মঙ্গল-কর-স্পর্শে, ব্যক্তিত্ব যাদের প্রবৃত্তি-বিচ্ছিন্ন, বিখণ্ডিত, তাঁর প্রতি অনুরাগে, তা' সংহত, সম্পূর্ণ ও সংগ্রথিত হ'তে থাকে, আবার মানুষ যারা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন, যাদের মধ্যে নেই কোন যোগ-সূত্র, প্রীতি-সূত্র, তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই তারা মালাকারে গ্রথিত হ'য়ে ওঠে, গভীরভাবে প্রীতি-নিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে। তিনি এসেছেন, হারান যা', ছড়ান যা', তা' কুড়িয়ে নিতে। এইভাবে তাঁর মঙ্গল-মঞ্জিলে পূজারীর দল নানা দিক-দেশ হ'তে নানা ভাব নিয়ে এসে সমবেত হয়, প্রত্যেকের থাকে স্বতন্ত্র লক্ষ্য, স্বতন্ত্র চাহিদা, কিন্তু তাঁকে ভালবেসে তারা একৈক-লক্ষ্য, একৈক-সঙ্কল্প হ'য়ে উঠতে থাকে। সেই ঐকায়নী সূত্র-বেদীমূলে তাই তারা বার-বার সমবেত হয়, বার-বার মিলিত হয়, কারণ ঐ মহামণ্ডপই তাদের সুখস্বর্গ। আজ প্রভাতেও তার ব্যত্যয় হয়নি—ভক্তবৃন্দ মিলিত হয়েছেন শ্রীমন্দির-অঙ্গনে। মধুস্রবা তিনি—অবারিত ও অবিরত জীবনের মধু বিলিয়ে চলেছেন তিনি অকুন্ঠভাবে, আর দৈন্য-পীড়িত মানব তা' আকন্ঠ পান ক'রে ধন্য হচ্ছে, কৃতকৃতার্থ হচ্ছে, তৃপ্তি-পুষ্ট হ'য়ে উঠছে। কোলের শিশুকে স্তন্য-পরিতৃপ্ত ক'রে মায়ের যে সুখ, সেবায়, সোহাগে, শাসনে, ভৎ'সনে, অমৃত নির্দ্দেশদানে মানুষের জীবনকে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে পরিস্ফূর্ত্ত ও নধরকান্তি-বিশিষ্ট ক'রে তুলে তাঁর সেই সুখ, এ না ক'রে তাঁর নিস্তার নেই, এই তাঁর স্বভাব, এই তাঁর প্রকৃতি—এতেই নিত্যনিরত তিনি !

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—মানুষের তো প্রবৃত্তির অন্ত নেই, তা' নিয়ন্ত্রিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা মিলেমিশে আপনার পথে চলব কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবার common interest (একই স্বার্থ) থাকলে difference (অনৈক্য) die out করবেই (তিরোহিত হবেই), difference (অনৈক্য) থাকলেই বুঝতে হবে কোথাও তা' থেকে deviation (বিচ্যুতি) হয়েছে। Difference (অনৈক্য) sincere (খাঁটি) insincere (অখাঁটি)-এর মধ্যে, এবং insincere (অখাঁটি) insincere (অখাঁটি)-এর মধ্যে

উভয়তঃ আসতে পারে। Sincere (খাঁটি) মানুষ যারা, তারা হয় uncompromising (আপোষরফাহীন), তাই তারা insincerity (কপটতা) বরদাস্ত করতে পারে না, সেখানে তারা রুখে দাঁড়ায়, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে কারও প্রতি তাদের এমনতর আক্রোশ থাকে না, যে তাদের স্বভাব শোধরালেও তাদের নিয়ে তারা মিলেমিশে চলতে পারবে না। বরং মানুষকে পরিশুদ্ধ ক'রে নেবার ঝোঁক তাদের মধ্যে খুব প্রবল দেখা যায়। তাই খাঁটি ও অখাঁটির মধ্যে যে অনৈক্য তার একটা সুষ্ঠু সমাধান হ'তে পারে। কিন্তু অখাঁটি অখাঁটির মধ্যে যে অনৈক্য, সে অনৈক্যের সমাধান দুরূহ,—শেয়ানায়-শেয়ানায় কোলাকুলির মত মাঝখানে মুঠমহাত ফাঁক থেকেই যায়। তাদের মধ্যে যে অনৈক্য, প্রকৃতির তরফ থেকেই তার একটা প্রয়োজন আছে। তারা যদি অসদুদ্দেশ্য সাধনের জন্যও স্থায়ীভাবে পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারতো, তাহ'লে সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে জগতের অনেক বেশী ক্ষতি করতে পারতো। অবশ্য অনেক সময় যে তারা ঐভাবে সমশত্রু নিধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ না হয়, তা' নয়, কিন্তু সেখানেও থাকে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সন্দেহ ও অবিশ্বাস, তাই সে মিতালি ধোপে টেকে না। আদত কথা, Ideal (আদর্শ)-এর interest (স্বার্থ) prominent (প্রধান) হ'য়ে ওঠা চাই, তখনই সব adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, একটা complex (প্রবৃত্তি) interest (স্বার্থ) হ'য়ে উঠলে দেখেন না মানুষ কি করে। ঐ কানী বোষ্টমীর কথাই হয়তো কতভাবে কয়, তার জন্য সবকিছু ignore (উপেক্ষা) ক'রে তাকেই সতী-সাবিত্রীর আসনে বসাতে চায়। বুকখানা যদি একবার কাবেজ হয়, ইষ্টের মুখখানা অহরহ যদি চোখের সামনে ভাসে, তিনিই যদি সবের বাড়া হন, তখন আপনা থেকেই বেয়াড়া যা' তা adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। Adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে কি তারপর interested (অন্তরাসী) হয়? তা' কখনো হয় না, আর এ ছাড়া adjustment (নিয়ন্ত্রণ)-এর পথও নেই।

প্রফুল্ল—মনুষ্যেতর যা'-কিছু সম্বন্ধে আমাদের যা'-কিছু ধারণা তা' তো anthropomorphic (মনুষ্যোচিত)—সে সবের সত্যতা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যখন মানুষ তখন মানুষের standard-এ (মাপকাঠিতে) ভাবা ও চলা ছাড়া আমাদের উপায় নেই—এই গণ্ডীর মধ্যে আমরা আবদ্ধ, তবে আমাদের knowledge (জ্ঞান) ও experience (অভিজ্ঞতা)-র accuracy (যথার্থতা) বুঝব—তা' দিয়ে আমাদের কতখানি ঈশত্ব বা আধিপত্য বিস্তার হয়—সেই মাপকাঠি দিয়ে। কোন বিষয়ে আমরা যদি শুধু মনগড়া ধারণা নিয়ে চলি, তাহ'লে বাস্তব প্রয়োগ বা উপযোগিতার ক্ষেত্রে ফলে মিলবে না,

উল্টো হ'য়ে যাবে। গ্রহ, উপগ্রহ, জল, বায়ু, সাপ, বিড়াল, বাঘ, কুমীর, যত বিষয়ে আমাদের যত জ্ঞানই থাক না কেন, সেই জ্ঞানের সাহায্যে ওগুলিকে কাবেজে এনে আমাদের কাজে যদি লাগাতে পারি, তখন বুঝব সে জ্ঞান সত্য ও বাস্তব। এমনতর জ্ঞানকেই বলে বিজ্ঞান, তাই বিজ্ঞান মানুষকে ক'রে তোলে শক্তিমান। কিন্তু এই জ্ঞান ও শক্তি যদি কাউতে সার্থক হ'য়ে না ওঠে, আত্ম-ভোগোপকরণ আহরণই যদি তার কাম্য হয়, তবে মানুষ দানব হ'য়ে ওঠে, তাই আসে ধর্ম্মের প্রয়োজন। আদর্শানুগ না হ'লে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শক্তি কোনটারই মূল্য নেই। আবার, আদর্শ ও ধর্ম্মের অনুসরণ আছে, কিন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞানশক্তির বিকাশ নেই—সেও এক আজগবী ব্যাপার। ধর্ম্মানুগ, আদর্শানুগ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শক্তির পথে চলাই আমাদের অমৃত অভিযান।

প্রশ্ন—দেবলোক কী? দেবলোক ব'লে কিছু আছে নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবতা মানে যিনি দীপ্তি পান। দেবলোক মানুষের life (জীবন)-এর একটা plane (স্তর)-বিশেষ। মানুষ যখন with all his characteristics (তার সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে) তার পারিপার্শ্বিকের fulfilment (পরিপূরণ)-এর ভিতর-দিয়ে তাদের প্রত্যেকের object of regard and interest (শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র) হ'য়ে দাঁড়ায়, মানুষের ইষ্টানুগ সেবায় তার জীবন যখন দীপ্তি পেতে-পেতে এগিয়ে চলে—স্বতঃস্ফূর্ত্ত চারিত্রিক অভিব্যক্তি ও অনুরঞ্জনায়,—তখন সে দেবলোকে বাস করে। ঐ active (সক্রিয়) characteristics (বৈশিষ্ট্যগুলি)-ই হয় তার plane (স্তর)। ভারতকে এক সময় পৃথিবীর লোকে দেবভূমি বলতো, তার মানে ভারতবর্ষে যে-সব লোক বাস করতো, তাদের বেশীর ভাগ লোকের চরিত্রই ছিল দেবোপম। এই ভারতবর্ষই আবার দেবভূমি, দেবলোক হ'তে পারে যদি তোমরা আর্য্যাচারে চল। বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমের অনুবর্ত্তন, বর্ণাশ্রম, দশবিধ-সংস্কার, নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ, আদর্শ বিবাহ, আদর্শ শিক্ষা, অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ, দৈনন্দিন জীবনে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, পারিপার্শ্বিকের সেবা, সদাচার পালন, ব্রত ও তীর্থের অনুসেবন—এই সবগুলি হলো আর্য্যাচারের অঙ্গীভূত। এইগুলির অনুসেবনে মানুষ ধীরে-ধীরে বংশ-পরম্পরায় দেবতুল্য হ'য়ে ওঠে। এবং সে শুধু এক-আধ জন নয়, গোটে-গোটে হ'তে থাকে, ঘরে-ঘরে হ'তে থাকে। আর, আজ যে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে এত হানাহানি, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যুগ-পুরুষোত্তমকে ধ'রে চলার রীতি যদি থাকে, তাহ'লে বিভিন্ন সম্প্রদায় থাকলেও সাম্প্রদায়িকতা থাকে না, প্রত্যেকে

প্রত্যেককে মনে করে, আমারই একজন, কারণ যুগপুরুষোত্তমের মধ্যে পূর্ব্বতন প্রত্যেকটি অবতার মহাপুরুষই জীয়ন্ত থাকেন। তাঁকে ভালবাসলে আমরা পূর্ব্বতন কাউকেই অবজ্ঞা করতে পারি না—প্রত্যেককেই মনে করি, 'আমার ঠাকুর।' তাই গুরুভাইয়ের প্রতি যে প্রীতি, সেই প্রীতিরই জাগরণ হয় সকলের প্রতি। সাম্প্রদায়িকতা সেখানে আসবে কোথা থেকে? তাই দেশকে যদি এ বিষ থেকে বাঁচাতে চাও, যাজনের ভিতর-দিয়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়, সকলের চোখ খুলে দাও, যা'তে শয়তান তার প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। এখনই যদি কোমর-বেঁধে না লাগ, পরে আর সামাল দিতে পারবে না। অনৈক্য ও বিভেদই কায়েম হ'য়ে চলবে।

এর মধ্যে একটি নূতন দাদা বাইরে থেকে এইমাত্র এলেন, তিনি মাতৃমন্দিরের ও মায়ের কুটিরের মাঝখান অতিক্রম করতে না করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উঁচু গলায় উচ্ছ্বসিত কন্ঠে ব'লে উঠলেন—কিরে! কখন আলি? আয়, আয়।

দাদাটি এই প্রথম এসেছেন আশ্রমে, শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহসিক্ত কন্ঠের প্রাণকাড়া মধুর আহ্বান শুনে তিনি আনন্দে ডগমগ হ'য়ে দ্রুতপদে এগিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন, প্রণাম ক'রে উঠে বললেন, 'এইমাত্র আসছি।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা! যা! তাহ'লে গেষ্ট হাউসে যেয়ে জিনিস-পত্র রেখে হাতমুখ ধুয়ে ঠিকঠাক হ'য়ে আয় গিয়ে। পরে শুনবোনে সব খবর। ওরে ভূষণ! (ভূষণদা দাঁড়িয়েছিলেন) এরে নিয়ে যা তো! ও নতুন মানুষ, ভাল ক'রে দেখাশুনো করিস্। আর দ্যাখ্ (উক্ত দাদাটিকে), এখানে কিন্তু অনেক সময় চুরিটুরি হয়, টাকা-পয়সা, ঘড়ি, কলম সাবধানে রাখিস্।

ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী) দাদাটিকে নিয়ে গেষ্ট হাউসের দিকে রওনা হলেন। দাদাটির এক হাতে একটি বিছানা, আর হাতে একটি সুটকেশ—তার তেমন কষ্ট হচ্ছিল না নিতে, কোনটাই তেমন ভারি নয়।

কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর ভূষণদাকে বললেন—একটা জিনিস তুই হাতে নে, বুঝিস্ না, রাতে জেগে গাড়ীতে এসেছে, শীতে কষ্ট হ'চ্ছে।

ওরা চ'লে যাবার পর গেষ্ট হাউসের (অতিথিশালার) চুরি-সম্বন্ধে আবার কথা উঠলো—

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই চুরিটা যে তোমরা বন্ধ করতে পারছ না, এ তোমাদেরই দোষ। চোর তো চুরি করবেই, চুরি করা তার পেশা, কিন্তু গৃহস্থ সজাগ থাকবে না কেন? চোর ঠেকাবার মত সজাগ ও সাবধান যদি আমরা না থাকি, তবে সব ব্যাপারেই ঐ শৈথিল্য ও অসাবধানতা র'য়ে যাবে, এবং তা'তে কত ক্ষতি যে

হ'তে পারে তার ইয়ত্তা নেই। অনেকে বানরের উৎপাতের কথা বলে, আমি ইচ্ছা ক'রেই বানরগুলি রেখে দিয়েছি। বানর তো উৎপাত করেই, কিন্তু যা'তে আমাদের ক্ষতি করতে না পারে, ততখানি alert (হুঁশিয়ার) থাকা লাগবে। এই হুঁশিয়ার ও সপ্রতিভ থাকার অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন। পরের service (সেবা) নিয়ে-নিয়ে আমরা পঙ্গু হ'য়ে গেছি, একেই বলে পরাধীনতা। আমাদের সব-কিছুর জন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী, আত্মরক্ষা ও বাঁচা-বাড়ার জন্য যা'-যা' প্রয়োজন, সেগুলি যত আমরা নিজেরা করতে পারব, ততই আমরা স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাব। স্বাধীনতার মধ্যেও instinctive capacity (সহজাত সামর্থ্য)-অনুযায়ী বৃত্তিবিভাগ থাকবে, পরস্পর নির্ভরশীলতা থাকবে, কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ বর্ণোচিত কর্ম্মদক্ষতার ভিত্তির উপর যত চৌকস হ'য়ে ওঠে ততই ভাল। শিক্ষার ধারাকেও ঐ ভাবে মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়—তাই আমি হাতে-কলমে কাজের উপর অত জোর দিই। বাজার-হাট, ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ী, দোর, পুকুর, রাস্তা-ঘাট, স্বাস্থ্য, খাদ্য-খানা, আয়-উপার্জ্জন, আমোদ, আনন্দ, কাজ-কারবার সব দিক সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখতে গেলে একটা active acquaintance (সক্রিয় পরিচিতি) রাখা লাগে বাস্তব ব্যাপারগুলির সঙ্গে। শিক্ষা-ব্যবস্থার যদি এগুলির সঙ্গে সংস্রব না থাকে, তবে তা' কার্য্যকরী হয় না, জীবন-রক্ষণী হয় না। তাই আমরা যত বেশী স্বাবলম্বী হ'তে পারি, সতর্ক হ'তে পারি, অতন্দ্র হ'তে পারি, সেই চেষ্টা করা লাগবে।

প্রশ্ন—প্রেতলোক কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, মানুষ মরে গেলেও বেঁচে থাকে এবং সেই অবস্থাকে প্রেতলোক বলে।

প্রশ্ন—তাদের সঙ্গে যোগাযোগের কি কোন উপায় নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত কী-ই তো শুনি। গোপাল তো investigation (গবেষণা) করছিল। গোপাল নাকি পড়েছিল—একটা কাঁচের tube (নল)-এর মধ্যে একটা ইঁদুর মারার পর rodopsin screen (রডপসিনের পর্দ্দা)-র উপর নাকি হুবহু ইঁদুরের shape (আকৃতি)-র একটা সূক্ষ্ম ছায়া পড়েছিল। আমি একদিন বেলগাছতলার ঘরে শুয়েছিলাম। যেন দেহ থেকে বেরিয়ে গেলাম। রাস্তায় দুধওয়ালার সঙ্গে দেখা হ'লো, তার সঙ্গে কথা বললাম, আরো কি-কি হ'লো সব মনে নেই, পরে এসে বহু কষ্টে আবার দেহের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। পরে মিলিয়ে দেখলাম—দুধওয়ালাকে যে কাজ করতে বলেছিলাম, সে ঠিক তাই করেছে। একলা দেখলে তো হয় না, স্বপন দেখার মত হয়।

স্বপন একজনের ব্যক্তিগত বোধ। জিনিসটা যদি এমন হয় যে, environment (পরিবেশ)-এর কারও বোধ করার কোন অন্তরায় না থাকে, তবেই তার যথার্থতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, সেইজন্য scientific research (বৈজ্ঞানিক গবেষণা) দরকার। গোপাল আরম্ভ করেছিল, চ'লে গেল, সে মানুষই বা কোথায় পাই ?

প্রশ্ন—গয়ায় পিণ্ডদানে কী হয় ? ওটা তো একটা সংস্কার বই আর কিছু নয়। পৃথিবীর কতলোক ওসব করে না, তাদের তো কোন অসুবিধা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যবদনে)—গয় রাজার রচিত পুরী গয়া,—গয়্ এসেছে 'গৈ'-ধাতু হ'তে, গৈ-ধাতু মানে, গান, কীর্ত্তন। আমার মনে হয়, মানুষের নামগুলি accidental (আকস্মিক) নয়, নামের অর্থের সঙ্গে নামধারীর প্রকৃতির সামঞ্জস্য থাকে। উক্ত গয় রাজার যে special activity (বিশেষ কর্ম্ম), সেখানেও তার ছাপ থাকা সম্ভব অর্থাৎ গয়া এমন একটি স্থান যেখানে মানুষের স্মৃতি, মানুষের গুণ গীত হয়, কীর্ত্তিত হয়। আবার, ওখানে রয়েছে সর্ব্ববন্ধনবিমোচন বিষ্ণুপাদপদ্ম, গদাধরের পাদপদ্ম। ওস্থানের এমনই মাহাত্ম্য, ওর সঙ্গে এমনই tradition (চিরপ্রচলিত রীতি) জড়িত যে ওখানে গেলেই মানুষ স্বতঃই যুগপৎ শ্রীহরি ও বিগত প্রিয়জন যারা—তাঁদের স্মরণ, মনন, গুণকীর্ত্তনে বিভোর হ'য়ে ওঠে। Hypnotism (সম্মোহন)-এর ব্যাপারে দেখ না—একটা বোতাম সম্বন্ধে এমন suggestion (সঙ্কেত) হয়তো দিয়ে দিল যে, ১৫ বছর পরেও সে বোতাম দেখলে hypnotised (সম্মোহিত) হ'য়ে যায়। যা' হোক, গয়ায় গিয়ে নানা ceremony (অনুষ্ঠান)-এর ভিতর-দিয়ে ঐভাবে মন concentrated (কেন্দ্রীভূত) হয়। তাছাড়া, গয়ায় পিণ্ডদান হিন্দুদের ঘরে এমনই একটা important (গুরুত্বপূর্ণ) ব্যাপার যে, কেউ গয়ায় গেলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুস্থানীয় যারা তারাও হয়তো তার গয়ায় যাওয়া উপলক্ষ্য ক'রে সেই বিগত আত্মার চিন্তা নিয়ে জড়িত থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে পতিতপাবন বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-চিন্তনও ওর সঙ্গে মিশে থাকে। বিগত আত্মার প্রিয়জন যারা তাদের স্ত্রী-পুরুষ সবার মধ্যে যদি এমন ভাব থাকে, তবে তার পিণ্ড ধারণের অর্থাৎ ঐ বিদেহী সত্তার disintegrated (বিশ্লিষ্ট) molecules (পিণ্ডিকা)-গুলির integrated (সংহত) হবার, দেহ ধারণ করবার, ecto-plasmic body (আতিবাহিক দেহ)-এর protoplasmic body-তে (জৈবী শরীরে) রূপ পরিগ্রহ করবার সুবিধা- হবারই কথা। ঐ বিষ্ণুপাদপদ্ম হলো সার্থক বিবর্ত্তনী ও কেন্দ্রায়নী সূত্র। বিগত আত্মার স্মৃতির

সঙ্গে ঐ বিষ্ণুচিন্তা জাগরূক থাকায়, সেই জীবাত্মা তার ভালমন্দ সব নিয়ে ও একটা সুকেন্দ্রিক উদ্বর্ত্তনী সুর নিয়ে আসবার সুযোগ পায়। আমার এই রকম মনে হয়। তাই সপরিবেশ ভাব-সমন্বিত হ'য়ে গয়ায় পিণ্ডদানের একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে ব'লেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তা'ছাড়া পিতৃতর্পণ হিন্দুদের নিত্যকরণীয়ের মধ্যে। এতে পিতৃপুরুষের স্মৃতি আমাদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে জাগ্রত থাকে এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাও সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে! ঐ জীয়ন্ত শ্রদ্ধা ও আভিজাত্যবোধ আমাদের চরিত্রকে অনেকখানি উন্নত ক'রে তোলে। আনুষ্ঠানিকভাবে এগুলি করার প্রয়োজন আছে এইজন্য যে, অনুষ্ঠান-গুলি আমাদের ভিতরের ভাবকে পুষ্ট ক'রে তোলে। আচার, অনুষ্ঠান ও অভিব্যক্তি যদি বন্ধ ক'রে দেওয়া যায়, তবে ভিতরের ভাবও আস্তে-আস্তে শুকিয়ে যেতে থাকে। আমাদের দেশে রীতি আছে, স্বামী বা গুরুজন বাইরে থেকে আসলে স্ত্রী যদি ব'সে থাকে তবে তখনই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে বসাবে এবং তিনি বসতে আদেশ করলে বসবে। (শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে-বলতে চকিতে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখালেন—কেমন ত্রস্তব্যস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়ে, কি ভঙ্গিতে, কেমন আগ্রহ ও বিনয় সহকারে গুরুজনকে অভ্যর্থনা করতে হয়)। এই অভিব্যক্তিটুকু যদি না দেখায়, আর যদি বলে—অন্তরে শ্রদ্ধা থাকলেই হ'ল তাহ'লে কিন্তু অন্তরের শ্রদ্ধাও ধীরে-ধীরে উবে যেতে থাকে। গয়ায় পিণ্ডদান বা পিতৃতর্পণ আমাদের মধ্যে যেমন ক'রে যেভাবে আছে, অন্য দেশে বা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমনভাবে না থাকলেও, তাদের মধ্যেও পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিপূজা তাদের মত ক'রে আছে। পিতৃপুরুষের স্মৃতি-তর্পণ যদি না থাকে, তবে কোন জাতিই বড় হ'তে পারে না। ওই-ই তো মানুষকে প্রেরণা জোগায়। তোমরা যে ইতিহাস পড়, সেও তো ঐ জিনিস। জাতের ইতিহাসের প্রতি মানুষের সত্যিকার শ্রদ্ধা হয় না, যত দিন মানুষ নিজের বংশের, নিজের পিতৃপুরুষের ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাবান হ'য়ে না ওঠে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সে-শ্রদ্ধা নিবেদন না করে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৮ (ইং ১১।১২।৪১)

বেণুবনে পাখীর কাকলী অনাগত প্রভাতের আগমনী ঘোষণা করে, আর সুপ্তিমগ্ন আশ্রমবাসিগণ চকিতে জেগে ওঠে। শান্ত, মৌন, নিস্তব্ধ আশ্রমভূমি, তার মাথার উপরে জ্বল-জ্বল ক'রে জ্বলে ভোরের শুকতারা, মাটিতে ঝ'রে পড়ে

শিশির-কণা, পদ্মাচরের শ্যাম তৃণবিতান গা এলিয়ে প'ড়ে থাকে, অদূরে ঝিলের জলরাশি নিস্তরঙ্গ নিথর হ'য়ে আলস্য-বিলাসে আপনমনে শোভা পায়, গরুগুলি, কুকুরগুলি—তারাও শুয়ে-শুয়ে ঘুমায়, কারও কোন তাড়া নেই, নেই কোন ত্বরা, কাল যেন অফুরন্ত প্রত্যেকের হাতে। কিন্তু তারই মাঝে আশ্রমবাসিগণ চকিত-চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ভাবে—বুঝিবা আজ দেরী হ'য়ে গেল। কত কথা হ'য়ে গেল তাঁর কাছে, আমরা সময়মত পৌঁছাতে পারলাম না। নেশাখোরের যেমন নেশার সময় এলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না, নেশার বস্তু পাওয়াই চাই তক্ষুণি—এও যেন তেমনি। একজন মানুষের জন্য নেশা—তাঁকে দেখতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে, তাঁর জন্যে কষ্ট স'য়েও আরাম লাগে। এই যাদু-মানুষটির মধুস্পর্শ না হ'লে প্রাণ সবার উপবাসী থাকে, ভাল লাগে না কারও কিছু। তাই ছুটে আসে, তাঁকে দেখে, তাঁকে শোনে, আর মৌতাত জমে ওঠে।

প্রশ্ন—স্বপ্নের ভিতর আমাদের নিরুদ্ধ গ্রন্থিগুলি আত্মপ্রকাশ করে ব'লে শুনেছি, কিন্তু স্বপ্নের সবটাই কি তাই? স্বপ্নদৃষ্ট সব ব্যাপারের তো যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মস্তিষ্কে যে ইচ্ছা, চিন্তা, কল্পনা ও স্মৃতির ছাপ থাকে, তাই স্বপ্ন আকারে দেখা দেয়। আমাদের অপূর্ণ বহু ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্য-দিয়ে তৃপ্তির সন্ধান খোঁজে। জোড়াতালি দিয়ে চিন্তামাফিক নানাভাবে হাজির হয়। এ জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই, এমন কত জিনিসও স্বপ্নের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের মাথাটা হ'ল চিত্রগুপ্তের খাতা। অনন্ত জীবনের ইতিহাস লেখা আছে ওর পাতায়-পাতায়। নাম-ধ্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের কোষগুলি যদি উপযুক্ত-ভাবে জাগ্রত ক'রে তোলা যায়, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জীবনের অনেক কিছু স্মৃতিই স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় ধরা দিতে পারে। আমাদের মন যখন যে ভাব-ভূমিতে থাকে, সাধারণতঃ তখন তজ্জাতীয় স্বপ্ন দেখা যায়। স্বপ্নে যে কেবল অতীতকেই দেখা যায় তা' নয়, ভবিষ্যৎকেও জানা যায়, কোন আত্মা এসে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে গেল। একই স্বপ্ন simultaneously (যুগপৎ) কয়েকজন দেখছে এমনতরও দেখা যায়। এ-সব tuning (একতানতা)-র ব্যাপার। যা' আমরা চোখে দেখি না, কানে শুনি না, ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধ করি না, তা' যে নেই, তা' নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি সীমাবদ্ধ, তাই তার উপরে যা', তা' আমাদের কাছে না-থাকা হ'য়ে আছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তি অনুশীলনের সাহায্যে অফুরন্তভাবে বাড়ান যায়, তখন আমাদের অনুভবের রাজ্যও অতোখানি বিস্তার লাভ করে। তখন একটা মানুষের বাহ্যে-প্রস্রাব

দেখেই হয়তো তার চরিত্র ও চেহারা পর্য্যন্ত ব'লে দিতে পারবে। আমি একবার ছেলেবেলায় একজনের গু পাড়িয়েছিলাম, পাড়া দিয়েই মনে হলো 'এ ভাসার গু', পাড়া দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই যে হেগেছে তার চলন-চরিত্র, চেহারা, প্রকৃতি সবই যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, আমি নির্ঘাত বুঝলাম কে হেগেছে। তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করতে সে হাসতে-হাসতে বললো—'তুই আবার ওখানে গিছিলি কেন ?'

প্রশ্ন—আমাদের নিবৃদ্ধ গ্রন্থিগুলি নিরসন ও সমাধানের উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় ঐ ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার urge (আকূতি)। নামধ্যানে ওগুলি জেগে উঠতে থাকে, এবং তার নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানের পথ আবিষ্কৃত হয়। 'ইষ্ট আর ইষ্টস্বার্থে মনের আনাগোনা, এমনি ক'রে ধ্যানে আসে চিত্ত-সংযোজনা।' মস্তিষ্ককোষগুলি নামের তরঙ্গে যতই আন্দোলিত ও আলোড়িত হ'তে থাকে, ততই ওগুলির ভিতর অনুস্যূত নানা ছাপ আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। অনেক বীভৎস চিন্তা, কল্পনা ও প্রবৃত্তি হাজির হ'তে থাকে। অনেকে ঐ সব দেখে আঁতকে ওঠে, ভাবে 'আমার বুঝি অধোগতি হচ্ছে', আবার কেউ-কেউ, মন একাগ্র ও সংযত হচ্ছে না, মনের চঞ্চলতা ও মলিনতা বেড়ে যাচ্ছে, ইত্যাদি ভেবে নাম করা ছেড়ে দেয়। তা' কিন্তু ঠিক নয়। নামে সুপ্ত গুপ্ত যা', তা' যে আত্মপ্রকাশ করে, সেইটেই লাভ, তখন বোঝা যায় নামের ক্রিয়া হচ্ছে, কিন্তু ধ্যান-সমন্বিত নাম চাই। মনের কোণে যাই উঁকি মারুক না কেন, ধ্যানের সাহায্যে সেটাকে ইষ্টের সঙ্গে সঙ্গতিশীল ও ইষ্টার্থপূরক ক'রে তোলার কায়দাটা মাথায় এঁচে নিতে হয়, আবার বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে হাতে-কলমে করতেও হয় তেমনি। এমনতর ক'রে চলার মধ্য-দিয়ে ওগুলির সমাধান ও নিরসন হয়, নচেৎ ধামাচাপা দেওয়া অবস্থায় থাকে। কখন যে কোন্ প্রবৃত্তি বেঘোরে ফেলে তার ঠিক নেই।

শরৎদা (হালদার)—ধরুন, নামধ্যানের সময় একটা জঘন্য চিন্তা আমার মাথায় এলো, তখন কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অস্তি-বৃদ্ধির বিরোধী যা', ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার প্রতিকূল যা', তাকেই বলতে পারেন জঘন্য। এখন আপনার কাছে যা' জঘন্য হ'য়ে আছে, তাকেই আপনি সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে তুলতে পারেন, যদি তা'কে অস্তিবৃদ্ধি-অনুগ ও ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার সহায়ক ক'রে তুলতে পারেন। ধরুন, কোন মেয়েছেলের প্রতি অবাঞ্ছিত অনুরাগ আছে আপনার, এবং এটা আপনার মনের তলায় চাপা আছে, নাম-ধ্যানের সময় সেই চিন্তাটা ভেসে উঠলো, তখন ঐ চিন্তায় অস্থির

হ'য়ে আপনি ওটাকে যতই তাড়াতে চেষ্টা করছেন, ততই যেন ওটা আপনাকে পেয়ে বসছে। কিন্তু তখন যদি আপনি চিন্তা করেন, আমি যদি ভালই বাসি কাউকে, তার যা'তে ভাল হয় তাই তো আমার করণীয়। পরমপিতার কাছে তার মঙ্গলের জন্য যদি প্রার্থনা করেন, সে যা'তে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হয়, সুখী হয়, সেজন্য আপনার যদি কিছু করবার থাকে, সম্মানযোগ্য ব্যবধান বজায় রেখে আপনার বংশ-মর্য্যাদা ও ইষ্টগৌরব স্মরণে রেখে তা' কিভাবে করা যায় তার কোন উপায় যদি আপনি চিন্তা করেন তা' তো দোষণীয় হবে না। বরং ঐ চিন্তা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে গ্রথিত হওয়ার দরুন মঙ্গলপ্রসূ-ই হবে। একেই বলে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান। সমাধান শুধু মাথায় আসলেই হবে না, তাকে কাজের মধ্য-দিয়ে বাস্তবতায় রূপ দিতে হবে। ধরুন, একজনের প্রতি গভীর বিদ্বেষভাব পোষণ করেন, ধ্যানের সময় ঐ চিন্তা আপনাকে পীড়া দিচ্ছে। আপনি হয়তো ধ্যানে ব'সে ঠিক করলেন, তার সঙ্গে এরপর থেকে বন্ধুর মত মিশব, আজই তার বাড়ীতে যাব আমার গাছের একটা লাউ হাতে ক'রে নিয়ে, আর তার ছেলেপেলেদের জন্য কিছু চিনেবাদাম নিয়ে যাব। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ভিতরের নিরোধ-প্রবৃত্তির দরুন তা' আর আপনি করলেন না, আর মনে-মনে হয়তো ভাবলেন, আমার অন্তরে বিদ্বেষ না থাকলেই হলো, বাইরে এসব করার দরকার কি ? কিন্তু James বলেছেন— It is purpose that God looks at, and not the intention. Purpose-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'চ্ছে set forth, অর্থাৎ কী উদ্দেশ্য নিয়ে কী কাজের মধ্যে তুমি নিজেকে ন্যস্ত করেছ সেইটে হ'লো কথা, তোমার অলস ইচ্ছার কোন দাম নাই।

প্রফুল্ল—নাম-ধ্যানের সময় চঞ্চল মনের পিছনে যদি ছুটতে হয়, তাহ'লে চঞ্চলতা বেড়েই যাবে, মন আর স্থির হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তো মনের পিছনে ছুটবে না, ছুটবে ইষ্টের পাছে, —তোমার যা' আছে তাই নিয়ে তোমার ভালমন্দ সব-কিছুকেই ইষ্টের হাতিয়ার ক'রে নিতে হবে। ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে তোমার ভালমন্দ সব-কিছুকে re-adjust (নবীনভাবে বিনায়িত) ক'রে তুলতে হবে। এই যদি না কর, তবে তোমার undivided personality (অখণ্ড ব্যক্তিত্ব) গ'ড়ে উঠবে না। তোমার তথাকথিত ভালটাকে যদি ইষ্টের কাজে লাগাতে পার, তথাকথিত মন্দটাকেই বা লাগাতে পারবে না কেন ? সব প্রবৃত্তিকেই যে তাঁর কাজে লাগান যায়, আর এই লাগানটাই ধর্ম্ম। জীবনের ক্ষেত্রে সব-প্রবৃত্তিরই উপযোগিতা আছে, যদি তা' ধর্ম্মানুগ হয়, ইষ্টানুগ হয়। তুমি যেটাকে ছেঁটে-কেটে বাদ দেবে—সেইটের সেবা

ও সুফল থেকে ততখানি বঞ্চিত হবে। ধর, তুমি ক্রোধী, এই ক্রোধ বিসর্জ্জন দিতে গিয়ে যদি তুমি righteous indignation অর্থাৎ পরাক্রমকে বিদায় দাও, তাহ'লে তোমার জীবনই দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে, আর দিন-দিন অসৎকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হবে। আবার, একটা প্রবৃত্তিও যদি তোমার ইষ্টার্থ-সংন্যস্ত হ'তে বাকী থাকে, অসংলগ্ন থাকে, তবে তার প্ররোচনায় তুমি কখন যে কী করতে পার, তার ঠিক নেই, অমনতর বিচ্ছিন্ন জীবন কখনই নির্ভরযোগ্য নয়। চঞ্চলতা হলো মনের ধর্ম্ম, চঞ্চলতা লাখ বাড়ুক তা'তে ক্ষতি নেই, যদি তা' ইষ্টার্থে হয়। বিভিন্ন প্রকারের চঞ্চলতা যখন ইষ্টার্থী হ'য়ে আসে তখনই আসে স্থৈর্য্য, তখনই আসে সাম্যভাব, অর্থাৎ balance. তখন লাখো কর্ম্ম ও দায়িত্বের মধ্যেও আমরা দিশেহারা হই না, সবটাকে সুসামঞ্জস্যে অন্বিত ক'রে তোলার শক্তি গজায় অসীম। আর এটা খুব ঠিক কথা, মানুষ যতই ইষ্টময় হ'য়ে উঠতে থাকে, ততই তার শরীর-মনের অবান্তর বিক্ষেপ ও বিশৃঙ্খলা স্তিমিত হ'য়ে আসতে থাকে। উত্তাল কর্ম্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও সে গভীর প্রশান্তি অনুভব করে। তথাকথিত ভাল-মন্দের দ্বারা সে বড় একটা আবিষ্ট হয় না, সাক্ষীস্বরূপ সবই দেখে যায় এবং নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান, বিনিয়োগ, প্রত্যাহার, উপেক্ষা বা তিতিক্ষা যেখানে যেমন প্রয়োজন তাই-ই ক'রে চলে। জীবনকে নিয়ে সে তখন আর বিব্রত বোধ করে না। তাই বলে 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'। এই যুক্ত যে, তার জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব থাকে না, কিন্তু তাই ব'লে ব্যতিক্রমী চলন থাকে না। কারণ, একের জন্যই সে বহুকে চায়, সর্ব্বাবস্থায় একের অর্থাৎ ইষ্টের পরিপূরণ ও পরিচর্য্যাই তার লক্ষ্য। তাই সব বৈচিত্র্য 'সূত্রে মণিগণা ইব' মালাকারে গ্রথিত হ'য়ে ওঠে, chaos (বিশৃঙ্খলা) cosmos-এ (শৃঙ্খলায়) পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুতে তক্তপোষে ব'সে উত্তরাস্য হ'য়ে কথা বলছেন, কাঁথা দিয়ে গা-টা ঢেকে বসেছেন, একটা হাঁটুর নীচে একটা কোলবালিশ, আর-একটা হাঁটু আসন-গাড়া অবস্থায়। কথা যখন খুব জমাট বেঁধে উঠছে তখন মাঝে-মাঝে ঝঁকে-ঝঁকে কথা বলছেন—মুখখানি হাসি-হাসি আনন্দে ভরা। চোখের চৌম্বক চাহনি সকলের মনপ্রাণ হরণ ক'রে নিচ্ছে—সে চোখে আছে করুণা, আছে মমতা, আছে আশ্বাস, আছে ভরসা, আছে উদ্দীপনা, আছে আপনকরা আত্মীয়তা, আছে সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্ব্বাবস্থায় একান্ত-নির্ভরযোগ্য পরম-স্নেহাশ্রয়। তক্তপোষের চারিপাশে ঘিরে ভিতরে-বাইরে দাদা ও মায়েরা ব'সে অনিমেষ নয়নে ভক্তি-আপ্লুতচিত্তে তাঁর সেই লোচনলোভন মনোহর রূপ দেখছেন, আর মন্ত্রমুগ্ধবৎ

তাঁর আলাপন শুনছেন। শ্রাবক চিত্ত আনন্দে, বেদনায় বিগলিত হ'য়ে উঠছে। তাঁকে পেয়ে আনন্দ, আবার তাঁকে পেয়েও তাঁর মনোমত হ'য়ে উঠতে না পারায় বেদনা। মিলন ও বিরহ, আনন্দ ও বেদনা যেন গাঁটছড়া বেঁধে আছে মানুষের জীবনে। উপস্থিত সবার উচ্ছ্বাসহীন স্বল্প-তরঙ্গ চেতনার সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে ছড়িয়ে পড়েছে এক গভীর প্রশান্তি ও দানাবাঁধা অনুভবযোগ্য বাস্তব সার্থকতা-বোধ। মন তাদের ধ্যানমগ্ন, বাইরের কোন বিক্ষেপ বা ঝামেলা তাই তাদের তখন ভাল লাগবার কথা নয়।

এমন সময় একটি মা হাঁকপাক ক'রে ছুটে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করলেন যে, তার ছেলেটি খুব অসুস্থ, ডাক্তার বলছে এখনই ৪০ টাকার ওষুধ লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখনই উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট দু'জনকে লক্ষ্য ক'রে তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন—যা তো! ২০ টাকা ক'রে নিয়ে আয় তো এক্ষুণি। তাড়াতাড়ি আনবি, দেরী করিস্ না কিন্তু। তাই ব'লে ধার করবি না বা ধাপ্পা দিয়ে আনবি না—মানুষকে খুশি ক'রে নিয়ে আসবি।

যাঁদের টাকা নিয়ে আসতে বললেন—তাঁরা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গসুখ ত্যাগ ক'রে এবং নিজেদের ভাবমুগ্ধ আমেজটা নষ্ট ক'রে তখনই যেতে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে বললেন—আমার কাছে ব'সে লাখ ধর্ম্মকথা শোন, তা'তে কিছুই হবে না, যদি আমি যা' বলি তা' না কর। না বলতেই যদি কর, সেই-ই সব থেকে ভাল। 'না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে সেই সে সেবক নাম, সেবক হইয়া কহিলে না করে, তাহার করম বাম।' আমাকে যদি ভালবাস তবে আমার দায়িত্বগুলো তোমাদের মাথায় নাও। আর, আমার দায়িত্ব ব'লে নয়, এ তোমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব। মনে রেখো, তোমরা তোমাদের পারিপার্শ্বিকের কাউকে পড়তে দেবে না। পরিবেশকে সুস্থ, সমর্থ, বর্দ্ধনমুখর ক'রে রাখা মানে নিজেরই স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। তোমার ভাল থাকা একলা তোমার হাতে নেই, এর অনেকখানি রয়েছে পরিবেশের হাতে। তাই পরিবেশকে সব দিক দিয়ে ভাল ও উন্নত ক'রে তোলা তোমার আত্ম-সংরক্ষণী নিত্য কর্ম্মের অঙ্গীভূত। এ যদি না কর তবে ধর্ম্ম হবে না, অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার পথে চলা হবে না, বিন্যাস-বিভূতি লাভ করা যাবে না। তবে এ সব-কিছু করা চাই সুকেন্দ্রিক হ'য়ে, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠামুখর হ'য়ে, আর তাই-ই ধর্ম্ম। নচেৎ ইষ্টের সঙ্গে সঙ্গতি নেই, খুব সেবা ক'রে বেড়াচ্ছি, ও কিন্তু প্রবৃত্তির সেবা। আবার,

পরের জন্য খুব করি, নিজের দিকে মোটেই খেয়াল নেই, নিজেকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত ক'রে তুলছি, তারও কোন মানে হয় না। আমাকে নিজেকেও সুস্থ রাখতে হবে, সক্রিয় রাখতে হবে, চলৎশীল রাখতে হবে। আমি নিজে যদি ঠিক না থাকি তবে ইষ্টার্থী সেবা করব কিভাবে ? মনে রাখতে হবে—আমার এ জীবনও আমার ইষ্টের, তাই একে অবিহিতভাবে নিপীড়িত করবার অধিকার আমার নেই।

কথাগুলি শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আবেগের সঙ্গে বললেন, দাদা দুটি লজ্জিত হ'য়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় ঐ মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ছাওয়ালের কী অসুখ ? কে দেখেছে ?

উক্ত মা—জ্বর, বুকে-পিঠে বেদনা, হয়তো নিউমোনিয়া হ'তে পারে। প্যারীদা দেখেছেন, আমাকে কিছু বলেননি। শুধু তাড়াতাড়ি টাকা জোগাড়ের কথা বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হ'য়ে থাকলে খুব সাবধান। কোনমতে ঠাণ্ডা যেন না লাগে। আর বেশী নড়াচড়া করতে দিবি না। বেডপ্যানে ঘরেই যেন পায়খানা করে। অন্য ছেলেপেলেদের রোগীর কাছে যেতে দিবি না। আর তুই নিজে যদি সেবা-শুশ্রূষা করিস্—সুস্থ যারা তাদের রান্নাবান্না ও পরিবেশন তোর না করাই ভাল। আর, ঠাণ্ডা ঠেকাতে গিয়ে ঘরের হাওয়া-চলাচলের ব্যবস্থা যেন নষ্ট করিস্ না।

উক্ত মা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তুই এখন যা। ওরা আসলে আমি পাঠায়ে দেবোনে।

মা'টি আশ্বস্ত হ'য়ে বিদায় নিলেন।

আবার আলাপ-আলোচনা সুরু হ'ল।

Clairvoyance (অতীন্দ্রিয় দর্শন), Telepathy (ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র-সাহায্য ব্যতিরেকে দূরবর্ত্তী ব্যক্তিদ্বয়ের মনোভাবের যোগাযোগ)—ইত্যাদি কী এবং কেমন ক'রে এ-সব সম্ভব হয়, তার উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি নিজে একবার দেখলাম—একটা জাহাজে আগুন লেগেছে, পরে কাগজে দেখা গেল সত্যিই তাই ঘটেছে, আমি হয়তো তামাকের দরকার বোধ করছি, ঠিক তখনই একজন তামাক নিয়ে হাজির। এ-সব mental tune (মানসিক একতানতা)-র ব্যাপার। একটা wireless (বেতার)-এর transmitting centre (প্রেরণ-কেন্দ্র) থেকে যে wave (তরঙ্গ) বের হয়, in tune (সমতান) যে receiving

set (গ্রহণ-যন্ত্র) যেখানেই থাক না কেন, সেখানেই তা' reproduced (পুনরুৎপাদিত) হয়। আমাদের brain-ও (মস্তিষ্কও) তেমনি একটা mechanism (যন্ত্র), সেও ধরতে পারে—সামনাসামনি একটা ঘটনা না ঘটলেও, তার সূক্ষ্ম impulse-এ (সাড়ায়) brain-এর (মস্তিষ্কের) visual centre (দর্শনকেন্দ্র) excited (উত্তেজিত) হ'য়ে প্রত্যক্ষ দর্শনই যেন ঘটে। আমাদের হয় কি, এক উপলক্ষ্যে কাজ করতে-করতে প্রবৃত্তির দরুন deviated (বিচ্যুত) হ'য়ে যাই, বহু উপলক্ষ্য এসে পড়ে। আমি হয়তো ইন্দুকে একটা কাজের ভার দিলাম, সে এক মা'র অনুরোধে একটা জিনিস কিনবার জন্য পাবনা চ'লে গেল। আমি তার উপর depend (নির্ভর) ক'রে বসে আছি, সে করল অন্যরকম, এমনি ক'রে ভাল intention (অভিপ্রায়) থাকা সত্ত্বেও activity (কর্ম্ম) insincere (কপট) ও treacherous (কৃতঘ্ন) হ'য়ে পড়ে। তুমি একটা কাজের ভার নিয়ে তা করতে গিয়ে, রাস্তায় বাধ্যবাধকতায় জড়িয়ে পড়লে, কোনটাই ঠিকভাবে করতে পারলে না, irresponsible (দায়িত্বহীন) হ'লে, go-between (কথা-খেলাপ) করলে। ভূতের মত ঘুরলে, কিন্তু কোন ফয়দা হ'ল না। আমি আর কী করবো, আমি তত cruel (নিষ্ঠুর) হ'তে পারি না, তুমি নিজেই হয়তো তোমার কাজ justify (সমর্থন) করবার জন্য আমার কাছে কত কথা বলছ, আমার sympathy ও appreciation (তারিফ) চাচ্ছ, তোমার দিকে চেয়ে তখন তোমার complex-এর (প্রবৃত্তির) nurture (পোষণ)-ই দিতে হলো, বললাম (সহাস্যবদনে) 'চেষ্টা তো করেছিস্—তুই আর কী করবি ?'—তুমি খুশি হ'য়ে গেলে। (গম্ভীরকণ্ঠে) বলি, এতে তোমার কী হলো, তুমি তো অহল্যা হ'য়ে চললে, পাষাণ হ'য়ে গেলে, নিজের দোষের গুরুত্ব সম্বন্ধে এতটুকু বোধও তোমার রইল না। খাঁটি কথাটা বলতে গেলে তখন তুমি আঁৎকে উঠবে, কিন্তু বস্তুতঃ তোমার activity (কর্ম্ম) insincere (কপট) ও treacherous (কৃতঘ্ন) হ'লো, আবার, তোমার করা দিয়ে ছাড়া তোমাকে বিচার করার পথ নাই, তাই বলে 'with mere good intentions, hell is proverbially paved'—অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় সদভিপ্রায় দিয়েই নরকের পথ মর্ম্মরখচিত। এইভাবে যদি চলতে থাক, নিজেদের চলনা যদি না বদলাও, তবে তার ফল যা' আসবার, তা'ও আসবে, lumps of disintegrated unadjusted experiences (কতকগুলি অসংহত, অনিয়ন্ত্রিত, অভিজ্ঞতার বিচ্ছিন্ন দলা) ছাড়া আর কিছুই পাবে না। চলার পথে পাকে-পাকে নানা অসংলগ্নতা জড়িয়ে যাবে, দুঃখ-দুর্দ্দৈব ঘিরে ধরবে, আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে থাকবে, অথচ

কোন হদিস পাবে না, জীবনে কেন এই দুর্ভোগ ? ফলকথা, যতদিন হাজার টানে ঘুরবে, ততদিন brain (মস্তিষ্ক) থাকবে scattered (বিক্ষিপ্ত) হ'য়ে, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন ও সমস্যারও সমাধান করতে পারবে না। কিন্তু একের টানে একেরই জন্য যদি পারম্পর্য্যক্রমে যথাবিধি শত কাজও কর, হাজার ব্যাপারেও ঘোরো, তোমার brain (মস্তিষ্ক) সুস্থ থাকবে, স্বস্থ থাকবে, সতেজ থাকবে, কোন সমস্যাকেই দুরূহ মনে হবে না, সমাধান-শক্তির বহির্ভূত মনে হবে না, struggle (সংগ্রাম)-এর মধ্যেও life (জীবন) enjoyable (উপভোগ্য) মনে হবে, তা'ছাড়া তোমার brain-এর (মস্তিষ্কের) tuning-এর (একতানতার) tendency (প্রবণতা) বজায় থাকবে, বেড়ে যাবে. তুমি নিজেই কত কি বোধ করতে পারবে তখন। মানুষের active, normal, concentric (সক্রিয়, সহজ, সুকেন্দ্রিক) চলনার পথে, বহু বিভূতিই অনায়াসলভ্য হ'য়ে ওঠে, কিন্তু সে ওদিকে খেয়াল দেয় না, ওদিকে বেশী নজর দিতে গেলে মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে।

২৭শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪৮ (ইং ১২।১২।১৯৪১)

স্থান—বাঁধের ধারের তাসু।

কাল—প্রাতঃকাল, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল।

'মন চল নিজ নিকেতনে।' প্রিয়জন-পরিবেষ্টিত নিজের গৃহকোণেও মানুষের মন ক্ষণে-ক্ষণে উতলা আকুল হ'য়ে ওঠে, মনে হয়—এ তার চিরকালের ঘর নয়, এ তার চিরদিনের পরিবেশ নয়। সহস্র বান্ধব মাঝে নিজেকে মনে হয় নিঃসঙ্গ, একাকী। তার মনের কথা বুঝবার, প্রাণের ক্ষুধা মেটাবার, তার অন্তহীন আগ্রহ-আকূতি ও ভালবাসার বিনিময়ে তার সত্তাকে সার্থক ক'রে তুলবার কেউ নেই সেখানে। তাই, মানুষ খোঁজে সেই ঘর, সেই মানুষ, যেখানে তার অন্তরাত্মা অখণ্ড মহিমায় বিকশিত হ'য়ে আপন বিভাবৈভবে বিরাজ করতে পারে, যেখানে সত্তা পেতে পারে তার সুসম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীণ আশ্রয়, যেখানে এক প্রেমে মিটতে পারে সর্ব্বপ্রেমতৃষা, যিনি শান্ত হ'য়েও অনন্ত, যাঁর কেন্দ্র আছে কিন্তু পরিধি চিরদিনের মত সীমায়িত হ'য়ে যায়নি অর্থাৎ অনন্ত বিস্তার ও গভীরতাই যাঁর স্বরূপ-কথা। এক কথায়, মানুষ চায় সেই ঘর, মানুষ চায় সেই মানুষ, যেখানে যাঁ'তে আবদ্ধ হ'য়ে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, শাশ্বত সত্তা ক্লিন্ন, ক্ষুণ্ণ, বিপন্ন ও সঙ্কোচশীর্ণ না হয়, বরং

সে তার সুস্থ, স্বস্থ, লীলায়িত জীবন নিয়ে বিশ্ব-বিবর্ত্তনের তালে-তালে পা ফেলে চলতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর মানুষের এই চাওয়া আজ নিরন্তর পরিপূরিত হ'চ্ছে বাংলার এক নিভৃত কেন্দ্রে। সে কেন্দ্র—পাবনা সৎসঙ্গ। তার প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের কাছে তাই জীবনকামী সবাই আসে। তাঁকে, তাঁর আশ্রমকে বিশ্ব-মানব মনে করে আজ—আপন জন, আপন স্থান—নিজ নিকেতন। এই আনন্দনীড়ে সমবেত হ'য়ে সবাই আনন্দ-সুধা পান করে।

বিশ্বের ভাণ্ডারী যিনি—তিনি সুধাসত্র খুলে ব'সে আছেন। পিয়াসী প্রাণ যত, তারা আসে, অন্তরের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করে, পায় তাঁর অমৃত-অবদান, তা' আস্বাদন করে,—ধন্য হয়, তৃপ্ত হয়, পরিপূরিত হয়।

প্রশ্ন—শুনি যা' আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা' আছে ভাণ্ডে, তার অর্থ কী? এবং ভাণ্ডে যা' আছে তা' সব জানতে পারি কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ ওই microcosm (মনুষ্য-শরীর) ও macrocosm (ব্রহ্মাণ্ড)-এর কথা। বিশ্বজগতে যা' আছে, মানুষের শরীরেই তা' আছে কেন্দ্রীভূত হ'য়ে। আবার, মানুষের সমগ্র শরীরে যা' আছে, শরীরের একটি কোষের মধ্যেও তা' আছে। একটা অণুর যা' গঠন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠনও মূলতঃ তাই। স্থূল যা' দেখছ, তার মধ্যে সূক্ষ্মতম যা'-কিছু স্তর-পারম্পর্য্যে ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত হ'য়ে আছে। প্রত্যেকটি যা'-কিছু আজ যে-আকারে দেখছ, হয়তো এ-আকারে ছিল না, কিন্তু এই হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল তা'তে, সেই সম্ভাব্যতাই বিবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে চলেছে প্রকৃতির বক্ষে, পরিবেশের মধ্যে, তাই বর্ত্তমানের মধ্যে অতীতের ছাপ সুপ্ত, লুপ্ত হ'য়ে থাকলেও আছে। একই বহুর মধ্যে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ ক'রে আছে। একই বহু হ'য়ে আছেন, আরো হ'য়ে চলেছেন। সেই ঐক্যসত্রটি ধরতে হবে, যা' বহুতে রূপায়িত। সেই মূল জিনিসটি হ'ল কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ। কেন্দ্রের প্রতি সক্রিয় আকর্ষণকে বাদ দিয়ে কিছুই আত্মরক্ষা করতে পারে না। এই আকর্ষণের আবার একটা সুসীম সীমারেখা আছে, সেটাকে অতিক্রম ক'রে সে যখন কেন্দ্রকেই আত্মসাৎ করতে চায়, তখনই আসে বিকর্ষণ, এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানাটানি ও সংঘাতের মধ্য-দিয়েই নূতনের আবির্ভাব হয়। এইভাবে পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও সংঘাতের মধ্য-দিয়ে আরও নূতনের অভ্যুদয় হয়, এমনি ক'রেই সৃষ্টি গুণিত হ'য়ে চলে। এই তাঁর লীলা। লীলা মানে আলিঙ্গন-গ্রহণ, দেওয়া-নেওয়া, মিলন-বিরহ,

সব হারিয়ে সব পাওয়া, সব পেয়েও নিজের বলতে কিছু না-রাখা, কিছু না-থাকা। 'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই, তুমি তাই পবিত্র সদাই।'

ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী)—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা যেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাঁড়া, দেখিয়ে দিচ্ছি। খাতা, পেনসিল বা কলম আছে তোদের কাছে ?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ, এই নিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন খাতায় এঁকে দেখালেন—Atom-এর (অণুর) negative pole (রিচী মেরু)-গুলি positive pole (ঋজী মেরু)-র দিকে এগুতে থাকলে, তার থেকে quanta (দ্যুতিকণা) কিভাবে ছিটকে-ছিটকে বেরোয়। আবার দেখালেন একটা কোষের রিচী মেরু ঋজী মেরুর দিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে কেমন ক'রে নূতন রিচী মেরু ও ঋজী মেরু সৃষ্টি হ'তে-হ'তে কোষ-বিভাজন হ'য়ে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যখন চিত্র এঁকে বোঝাচ্ছিলেন, তখন সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঝুঁকে প'ড়ে আগ্রহভরে দেখতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখাবার সময় বার-বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—'বুঝলি তো ? বুঝলি তো ?'

সবাই বোঝার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষান্ত হলেন।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ও সবার চোখে-মুখে এক অপার তৃপ্তি। প্রত্যেকে পুনরায় যথাস্থানে উপবেশন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্য বদনে)—গানে আছে, (সুর ক'রে) 'যখন যেখানে যাই, সঙ্গে থাকে গো রাই।' (হাতদু'খানি নেড়ে—বিস্ময়ের ভঙ্গীতে)—এ এক অশৈলি কাণ্ড—positive (ঋজী) যেখানে থাকবে, negative (রিচী) তার পোঁদে-পোঁদে ছুটবে, সেই অবলম্বন ছাড়া সে যেন চলতেই পারে না। একেই বলছিলাম কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ ব'লে। Positive (ঋজী) যেন negative (রিচী)-র কেন্দ্র, এই কেন্দ্রানুযায়ী হ'য়ে ছাড়া তার টিকবার জো নেই, সেই টানে সে ছোটে সেই দিকে। এই ছোটাছুটি, টানাটানির ভিতর-দিয়ে ছিটকে বেরোয় কত কি—অনন্ত কোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-গ্রহ-নক্ষত্র-তারা, ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম, গাছপালা, পশু-পাখী, মানুষ, তুমি-আমি কত কি, মায় ঐ ফড়িংটা পর্য্যন্ত (তাম্বুর মধ্যে একটা ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছিল)। অবশ্য এর নানা পর্য্যায় আছে, নানা স্তর আছে, নানা ক্রম আছে। সদ্‌গুরুকে ধ'রে তাঁর নির্দ্দেশমত বিহিতভাবে সাধন করলে ওগুলি ক্রমে-ক্রমে ফুটে ওঠে। সবই চোখে দেখা যায়, কানে শোনা

যায়। এ-সব হেঁয়ালী কথা কিছু না। এ হ'লো বিজ্ঞান। আমি যেভাবে দেখছি, তোমরাও তেমনি দেখতে পার। তবে গুরুসর্ব্বস্ব না হ'লে, সর্ব্বতো-ভাবে গুরুমুখী না হ'লে তথাকথিত সাধনার কসরতে এ হবার নয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—তোমার অনেক জন্ম অতীত হ'য়ে গেছে, আমারও অনেক জন্ম অতীত হ'য়ে গেছে, তোমাতে আমাতে ভেদ নাই, ভেদ এইটুকু যে তুমি তা' জান না, কিন্তু আমি জানি অর্থাৎ আমার স্মৃতি-চেতনায় আছে তা'। সদ্‌গুরু হলেন সেই জানা-লোক, স্মৃতি-চেতনাওয়ালা লোক, জীবনের সব রহস্যই তাঁর করতলগত। তাই তাঁর উপর প্রাণের টান হ'লে, তাঁর সঙ্গ করলে, সেবা করলে, অনুসরণ করলে, তাঁর প্রীতি-কর্ম্ম করলে, নিজেকে তন্মুখী ক'রে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চললে, নাম-ধ্যান, ভজন-যাজন করতে থাকলে, তাঁর সুখ-সাধ-আহ্লাদের দিকে লক্ষ্য রেখে চললে, বেমালুমভাবে তাঁর জানা কত কী-ই যে নিজের জানার মধ্যে এসে যায়, তা' ঠাওরই পাওয়া যায় না। পথ ঐ সোজা পথ, সদ্‌গুরু হলেন মূর্ত্ত বেদ, কোনকিছুর বালাই নিয়ে তাঁর পিছে ঘুরো না, তাঁর পায়ে নিজেকে উজাড় ক'রে ঢেলে দাও, তাঁরই হও তুমি সর্ব্বতোভাবে—তোমার কিছুই ভাবতে হবে না, তোমার যা' হবার তা' আপনিই হ'য়ে উঠবে।

প্যারীদা কি যেন প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে বললেন, কাণ্ড গুরুচরণ, তুই আগে তামুক খাওয়া দেখি একবার। (প্যারীদা তামাক সাজতে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ব্বধারায় বলতে লাগলেন)—অনুভূতি, জ্ঞান বা দর্শনের কথা ছেড়ে দিলেও সোজা কথায় মানুষ Ideal (আদর্শ) ছাড়া, অবলম্বন ছাড়া চলতেই পারে না, তার অস্তিত্বই বজায় রাখতে পারে না। প্রবৃত্তি তাকে কখন কেমনভাবে সাবাড় ক'রে দেবে তার কি ঠিক আছে? Ideal (আদর্শ) যেন positive (ঋজী-কেন্দ্র) আর সাধারণ মানুষ যেন negative (রিচী-কেন্দ্র)। তাই with all one's passions and complexes (সমস্ত বৃত্তি নিয়ে), Ideal-এ অর্থাৎ পূরয়মাণ জীবন্ত মহাপুরুষে actively interested (সক্রিয়ভাবে অনুরাগী) হ'লে সে powerful man (শক্তিমান মানুষ) হ'য়ে দাঁড়ায়, কিন্তু একটা passion (প্রবৃত্তি)-ও uninterested (আলগা) থাকলে ছিটকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, individuality (ব্যক্তিত্ব) ব'লে কিছু থাকে না, individuality (ব্যক্তিত্ব) মানেই Ideal-এ (আদর্শে) completely (সম্পূর্ণভাবে) integrated (সংহত) হ'য়ে থাকা, একমাত্র Ideal (আদর্শ)-এর attraction (আকর্ষণ)-এ চলা। তাই শুধু ইষ্টকে ধ'রে চলাই যথেষ্ট নয়, সমস্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও সত্তা দিয়ে তাঁ'তে অনুরক্ত হ'তে হবে, তাঁকে অনুসরণ করতে হবে, আর যেখানে

যেটুকু ফাঁক, গরমিল বা গোঁজামিল আছে, সেটুকু ঠিক ক'রে তুলতে হবে, একেই বলে unrepelling adherence (অচ্যুত অনুরাগ)। Blessed is he who is not repelled by anything in me (যে আমার কোন-কিছুর দ্বারাই প্রতিহত না হয়, সেই ধন্য)। এই অচ্যুত অনুরাগসম্পন্ন যারা, তাদের সম্বন্ধেই গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, 'অপি চেৎ সুদুরাচারঃ ভজতে মামনন্যভাক্, সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ।' সম্যকভাবে ইষ্টনিবদ্ধ না হ'লে মানুষ সাধুও হয় না, সন্ন্যাসীও হয় না ; আর সম্যকভাবে ইষ্টনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে যে, সে যদি লাখ দুষমণও হয়, তার দুষমণিও পুণ্যপ্রভা বিকিরণ করে।

প্যারীদা তামাক সেজে এনে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খাচ্ছেন।

প্যারীদা—মানুষের জীবনে Ideal (আদর্শ) না থাকলেই যে তার বাঁচা-বাড়া বিপন্ন হবে তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস যবে ভুলি গেলা, মায়া পিশাচী তার গলে দড়ি দিলা। মানুষ যদি ভগবানের বাঁধনে বাঁধা না থাকে, তাহ'লে শয়তানের বাঁধনে বাঁধা পড়বেই, যে-কোন না কোন রকমে। শয়তান আবার অনেক সময় ধর্ম্মের মুখোস প'রে আসে। সে বলে, কোন জীবন্ত আদর্শকে যে ধরতে হবে, তার মানে কী ? তুমি সৎপথে চললেই হ'লো, সৎকাজ করলেই হ'লো। এই যুক্তি মানুষের বেশ ভাল লাগে, মানুষ তা'তেই সায় দিয়ে চলে। কিন্তু ওই ফাঁক দিয়েই প্রবৃত্তি তার রকমারি কারসাজি চালায় মানুষের সঙ্গে। মজা এমনি যে, মানুষ ঐ অবস্থায় প্রবৃত্তি-অভিভূতিকে প্রবৃত্তি-অভিভূতি ব'লেই চিনতে পারে না। চিনবে কী ক'রে ? সে যে তৎ-সারূপ্য লাভ ক'রে তা'তেই গুলিয়ে আছে। তাই সর্ব্বশাস্ত্র বলছে প্রেরিত পুরুষে শরণাগতির কথা। গীতায় আছে, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥' Bible-এ আছে—'I am the way, the truth, the goal, none can come to the Father but by me', বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—'শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ, গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ', চণ্ডীদাস বলেছেন, 'শুন হে মানুষ ভাই! সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই', কোরাণে আছে—'প্রেরিতকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না', বৌদ্ধদের আছে—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি'। তাই গোড়ার কথাটা ঐ। আর, এই যে Ideal (আদর্শ)-এর selection

(নির্ব্বাচন), তা'তে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীতে নতি রেখে with all fulfilments (সব পরিপূরণ-সহ) চলেছেন কিনা। তেমনতর সর্ব্ববৈশিষ্ট্যের মহাপরিপূরণকারী মানুষকে অবলম্বন ক'রেই whole mass (সমগ্র জনমণ্ডলী) integrated (সংহত) হ'য়ে ওঠে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে তখন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ উপচে ওঠে, অভাব বা খাঁকতি ব'লে কিছু থাকে না। Ideal (আদর্শ)-কে অবলম্বন ক'রে চলা অত্যন্ত normal (স্বাভাবিক) এবং সহজ, অন্যরকম চলাই বরং কঠিন, তা'তে কষ্ট অনেক বেশী, তবু মানুষ কষ্ট ক'রে বিপথে চলে, কারণ, পরিবেশটা অনেকখানি গোলমেলে হ'য়ে গেছে, বিকৃত বুদ্ধির বড় ছড়াছড়ি। ধর, go-between complex (দ্বন্দ্বীবৃত্তি), এটা যেন সমাজে ব্যাধির মত ছড়িয়ে গেছে। এটা form (গঠন) করতেই কি মানুষের কম কষ্ট পেতে হয়! কত খচখচানি, খুঁত-খুঁতভাব। আর, habit form (অভ্যাস-গঠন) ক'রেও যে কী ফল, তা'ও তো বুঝছ। তাই চলার সহজ পথটা মানুষকে ধরিয়ে দেবার জন্য দুনিয়াময় সহস্র-সহস্র ইষ্টনিষ্ঠ, আচারবান ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও যাজকের প্রয়োজন। তাদের গায়ের হাওয়া যেখানে যেয়ে লাগবে, সেখানেই ধর্ম্ম মঞ্জুরিত হ'য়ে উঠবে। এটা ঠিক জেনো—তোমার microcosm-এ (ব্যষ্টিজীবনে) যদি ধর্ম্মের জাগরণ না হয়, তোমার macrocosm-এ (বিশ্বজীবনে) তুমি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কারণ, তুমি যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ জান, তাহ'লেই তুমি দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে, নচেৎ নয়। তত্ত্বতঃ দেখতে গেলে microcosm (ব্যষ্টিজীবনে)-এর ভিতর-দিয়েই macrocosm (বিশ্বজীবন)-কে জানা সম্ভব। আবার, macrocosm (বিশ্বজীবন)-কে জানা যেটা বলছি, সেটা প্রকৃতপক্ষে microcosm (আত্মজীবন)-কেই জানা। কারণ, আমি ও আমা-অতিরিক্ত বস্তু ও ব্যক্তিগোষ্ঠির contrast (দ্বন্দ্ব)-এর ভিতর-দিয়ে আমি কেবল বাইরের সেগুলিকে জানছি না, তার ভিতর-দিয়ে আমি আমাকেও জানছি, আমাকেও বোধ করছি। আমার বাইরে আমাকে সাড়া দেবার মত কোন পরিবেশ যদি না থাকতো, তাহ'লে আমি-বোধই লুপ্ত হ'য়ে যেত, আমিও থাকতাম না সেখানে। তাই microcosm (ব্যষ্টি)-র যে faculties (কার্য্যক্ষমতা) ও capacities (দক্ষতা), তা' play (ক্রিয়া) করার সুযোগ পায় macrocosm-এ (বিশ্বজীবনে) এবং এর ভিতর-দিয়েই ব্যষ্টি নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয় ও তা' উপভোগ করে, যেমন দৃশ্যবস্তু ব'লে কিছু থাকার দরুন দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই এবং দৃশ্যবস্তুও উপভোগ করি। তাই, ধর্ম্মকে পরিবেশে ও

বিশ্বজীবনে যতখানি প্রতিষ্ঠা করি, আমাদের অন্তরেও তা' ততখানি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব যাজন বা ধর্ম্মদান পরোপকার নয়, কিংবা করলেও হয় বা না করলেও হয়, এমনতর কর্ম্ম নয়, এটা হ'ল নিত্যকর্ম্ম। তুমি যদি তোমার জীবনে ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত রাখতে চাও, তবে তোমাকে যজন ও ইষ্টভৃতি যেমন করতে হবে, যাজনও তেমনি অতি অবশ্য করতে হবে। এই যাজন-বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে হবে প্রত্যেকের অন্তরে। এতে প্রত্যেকের পরিবেশ তার বাঁচা-বাড়ার সহায়ক হ'য়ে উঠবে, আর এই নিত্য যাজনের ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকের বোধ ও জ্ঞানের ভাণ্ডারও খুলে যাবে, ইহকালে ও পরকালে কিছুই অপ্রাপ্য থাকবে না তার।

আর, যাঁর আধিপত্য আমাতে থাকার দরুন জগতের যা'-কিছু বোঝা যায়, জানা যায়, সত্তানুপোষণী ক'রে নিয়ন্ত্রিত করা যায় ও সে-সবের উপর আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব হয়, এবং যাঁকে দিয়ে, যাঁর দ্বারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বৈচিত্র্যের সবৈশিষ্ট্য সংহতি আমার কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, সেই তিনি হলেন আমার ইষ্ট, আমার ভগবান, আমার ঈশ্বর। সুতরাং এক পা-ও তাঁকে ছেড়ে চলা আমাদের সম্ভব নয়। বুঝলে প্যারীচরণ? (এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদার চিবুক ধ'রে মায়ের মত সোহাগ করলেন।)

প্যারীদা আহ্লাদে অবশ হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন। পরে আবার তামাক সেজে নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে গাঢ় প্রশান্ত দৃষ্টিতে সবার দিকে চাইতে লাগলেন—সবাই তখন আনন্দে আবিষ্ট, ভাবে ভরপুর, সেই মধুর লগ্নে তাঁর সেই মধুমাখা, মমতাদীপ্ত আঁখিযুগল সকলেরই মনপ্রাণ হরণ ক'রে নিচ্ছিল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করলেন। পরে তিনি মাতৃমন্দিরের বারান্দায় একখানি তক্তপোষের উপর এসে বসলেন। ধীরে-ধীরে বেলা হ'তে লাগল। ফিলানথ্রপী অফিসের কর্ম্মীরা এসে অফিসের কর্ম্মে যোগদান করলেন। তরকারিওয়ালারা মাতৃমন্দিরের পশ্চিম দিকে যার-যার তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসলো, কেউ-কেউ আবার নূতন নলেন-গুড় নিয়ে এসেছে বিক্রী করতে। মায়েরা ও দাদারা সেখান থেকে যার যেমন প্রয়োজন জিনিস কিনছেন। একদল ছেলে একপাশে ডাণ্ডাগুলি খেলছে। সম্মুখে পদ্মার বিস্তৃত চরে গরুগুলি আপন মনে চ'রে বেড়াচ্ছে। মাঝে-মাঝে ঝাঁকে-ঝাঁকে সাদা পাখী দলে-দলে নিরুদ্দেশভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে—তারা যেন বাধাবন্ধহীন কোন দূর পথের যাত্রী। পাশের বাঁশবনে এবং সামনের ঝাউগাছগুলিতে ছোট-ছোট রকমারি পাখীর দল কিচির-

মিচির ক'রে মাঝে-মাঝে কলরবে ভেঙ্গে পড়ছে। ঝিলের জলরাশি উদার নীল আকাশের দিকে মুখ ক'রে শীতের দিনে আরামে রোদ পোহাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তক্তপোষের উপর ব'সে দূর আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। কালিদাসীমা তামাক, জল, সুপুরী দিচ্ছেন। কাছে আছেন বীরেনদা (মিত্র), চুণীদা (রায়চৌধুরী) ও পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য)। এক-একজন মাঝে-মাঝে এসে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন, আর শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের সঙ্গে প্রয়োজনমত দু'চার কথা বলছেন।

সুধীরদা (দাস) এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানার কাজকর্ম্ম সম্পর্কে তাকে কিছু নির্দ্দেশ দিলেন।

পরে আবার অমূল্যদাকে ডাকতে বললেন। অমূল্যদা (ঘোষ) আসলে বললেন—১৩০ টাকার স্বাক্ষর-পত্রগুলি তাড়াতাড়ি ছেপে numbering (নম্বর দেওয়া), perforating (ছিদ্রকরণ), binding (বাঁধান) ইত্যাদি ঠিক ক'রে দিবি। দেখতে যেন খুব সুন্দর হয়। Conference-এর (অধিবেশনের) যত আগে হয় ততই ভাল। আজ পারলে কাল পর্য্যন্ত দেরী করবি না। যা ভূতের মত লেগে যা গিয়ে।

অমূল্যদা 'আচ্ছা' ব'লে খুশি মনে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমর ভাইকে (ঘোষ) বললেন—অমর, শুনলাম গেষ্ট হাউসের কলের পাড়ের ড্রেনটা বন্ধ হ'য়ে যেয়ে সেখানে খুব জল জমে, আর চারিদিকটা খুব পিছল হ'য়ে গেছে, হেমগোবিন্দ ওদের নিয়ে তুই যদি ওটা ঠিক ক'রে দিস্ তো হয়, নয়তো ওখানে মশা হবে, তার থেকে ম্যালেরিয়া ছড়াবে, আর কে কখন জল আনতে গিয়ে আছাড় খাবে তার ঠিক নেই। তুই না করলে হবে নানে, তুই নিজে সঙ্গে থেকে যা'-যা' করা লাগে করবি। যা, এখনই যা।

অমর ভাই উঠে পড়লেন।

বহিরাগত একটি ভাই এসে বললেন—টেষ্ট দিয়ে এসেছি। তিন মাস পরে final (শেষ) পরীক্ষা, যত পড়ি কিছুই তো মনে থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিস্, পরীক্ষা দিতে হবে, ওসব কথা মোটেই ভাববি না। বরং অনুরাগ নিয়ে বিষয়গুলিকে এমন ক'রে আয়ত্ত করতে চেষ্টা কর্—যা'তে যে-কোন মানুষকে তুই তা' বুঝিয়ে দিতে পারিস্। হয়তো তোর ছোট ভাই বা বোনকে গল্পের মত জিনিসগুলি বুঝিয়ে দিবি। আবার ভেবে দেখবি বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে ঐ বিষয়গুলির উপযোগিতা কী, ঐ জ্ঞানকে কোথায় কি কাজে লাগাতে পারিস্। এই বুদ্ধি নিয়ে পড়িস্—দেখবি মাথায়

গেঁথে যাবে, ভুলবি না, অযথা উদ্বেগকে প্রশ্রয় দিবি না, নাম করবি, শরীরটা ঠিক রাখবি, স্ফূর্ত্তিতে থাকবি।

২৮শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪৮ (ইং ১৩।১২।৪১)

স্থান—বাঁধের ধারের তাস্বু (পাবনা আশ্রম)

কাল—প্রাতঃকাল

মানুষের মন চিরদিন সঙ্গ-পিয়াসী। একান্ত নিঃসঙ্গ জীবনে নেই তার আমোদ, নেই তার আনন্দ। সে চায় সমব্যথী সাথী, যে তার সুখে হবে সুখী, দুঃখে হবে দুঃখী, দরদী, যার অন্তর অনুরণিত হ'য়ে উঠবে তারই অন্তরতম অনুভূতির ছন্দানুক্রমণায়। এমন মানুষ না পেলে তার সবই আলুনি লাগে, বৃথাই সে জীবনভার ব'রে নিয়ে চলে, থাকে না তার কোন নিবিড় উপলব্ধি ও উপভোগের উন্মাদনা বা সার্থকতা। তাই মানুষ খোঁজে সাথী, মানুষ খোঁজে বন্ধু, মানুষ খোঁজে আত্মীয়, মানুষ খোঁজে প্রিয় পারিবারিক পরিবেশ, মানুষ খোঁজে প্রণয়বান দরদী, সে খোঁজে সম-মননশীল আড্ডা, মজলিস, সঙ্ঘ, সমাজ, রাষ্ট্রীয় সংস্থা। যেখানে পায় না তা', সেখানে গ'ড়ে তুলতে চায় অনুরূপ কিছু। মোটের পর সত্তা-পোষণী, বৈশিষ্ট্যপূরণী জ্যান্ত পরিবেশ না হ'লে মানুষের চলবে না। পোষণহারা হ'য়ে, প্রেরণহারা হ'য়ে সে শুকিয়ে উঠবে।

তাই সঙ্গ খুঁজতে-খুঁজতে মানুষ সেই সঙ্গে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট ও আসক্ত হয়, যেখানে তার সত্তার সপ্ত স্বর্গ, সপ্ত ভুবন, সপ্ত পাতাল আমান তরঙ্গায়িত, ছন্দায়িত, বোধি-দীপ্ত, সক্রিয় সুবিন্যস্ত ও সার্থক এক-সূত্র-সঙ্গত হ'য়ে ওঠার সুযোগ পায়। কারণ, এমনতর সর্ব্বাঙ্গীণ বিবর্ত্তন, বিবর্দ্ধন ও উপভোগ-বিলাসের অভিলাষী হ'য়েই সে বেরিয়েছে পথ-পরিক্রমায় অগণিত জন্ম-মৃত্যুর অসহনীয় ক্লেশ হেলায় তুচ্ছ ক'রে। ঐটুকু না হ'লে যে তার অনন্ত জীবনের সব কষ্টই মিছে। তাই যুগে-যুগে বার-বার মানুষের অন্তর মথিত হ'য়ে আকুল প্রার্থনা উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে, 'ভগবান! তুমি আবির্ভূত হও', 'পুরুষোত্তম! তুমি এস'। মানুষের ঘরে, মানুষ মায়ের গর্ভে মানুষী তনু ধ'রে, মানুষের আপন জন হ'য়ে তার হাত-ধ'রে-তোলা পরমপথের সাথীয়া হ'য়ে যখন তিনি আসেন, তখন সেখানে তাই মানুষের মহামহোৎসব লেগে যায়। কারণ, সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের অমনতর সুসম্পূর্ণ, সমীচীন পূরণ, পোষণ আর কোথাও

পাবার জো নেই। তাঁর সঙ্গ-নেশায় মানুষ তাই মসগুল হয়, মাতাল হয়। অন্য নেশা ছাড়া যায়, ছাড়ান যায়, কিন্তু এ নেশা একবার ধরলে আর ছাড়ে না। এই নেশায় মাতাল যারা, তারা ক্রমাগত পরিবেশকেও অমনতর মাতাল ক'রে তোলে, আর একযোগে মজাসে আস্বাদন করে সেই সর্ব্বোত্তম পুরুষকে, যিনি 'রসো বৈ সঃ'। সেই উপভোগেরই আসর চলেছে এখন। সুষমামণ্ডিত সুপ্রভাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় ব'সে আছেন—অনিন্দ্য-সুন্দর অপরূপ শোভা বিকিরণ ক'রে। ভক্তবৃন্দ মুগ্ধ নয়নে তাঁকে নিরীক্ষণ করছেন।

নগেনদা (বসু)—আরাধনা ও তপস্যায় কী প্রভেদ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরাধনা মানে সম্যকপ্রকারে নিষ্পন্ন করা, আর তপ মানে সেই পথে বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করতে গিয়ে effort (প্রচেষ্টা)-র দরুন যে তাপের সৃষ্টি হয়, তাই। তপস্যা মানে to bestow efforts to perform something (কোন-কিছু সম্পন্ন করতে চেষ্টা করা)। এই তপস্যার সার্থকতার একটা কেন্দ্র চাই, সেই কেন্দ্র যদি না থাকে এবং আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা যদি তাঁতে সার্থক হ'য়ে না ওঠে, তবে যত তপস্যাই আমরা করি না কেন, কাটাকাটা হ'য়ে যাবে, তার ভিতর-দিয়ে সংহত শক্তির সমাবেশ হবে না, ব্যক্তিত্বও দানা বেঁধে উঠবে না। তপপ্রবুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মস্তিষ্ককোষগুলি সূক্ষ্মতর শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হয়তো প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় বিপথে পরিচালিত হবে, এবং ঐ শক্তি-বলে অপকর্ম্ম হয়তো আরো বেশী ক'রে করবে। তাই গোড়ায় চাই ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন হওয়া, ঐটি হ'লে তুমি ধর্ম্মরাজ্যে ঢোকবার চাবিকাঠিটি হাতে পেলে, তখন আর বেচালে পা পড়বে না। তোমার যতটুকু ক্ষমতাই থাক—তাই-ই কল্যাণের পথে নিয়োজিত হবে। আর, ঐ ইষ্টকে খুশি করার আকূতি থেকে, তুমি আরো-আরো আরাধনা ও তপস্যা করবে, তা'তে তোমার সামর্থ্যও বেড়ে যাবে, আর সে-সামর্থ্য হবে কল্যাণকল্পতরু। নইলে দুনিয়ায় আরাধনা, তপস্যা বা সামর্থ্যের কি অভাব আছে ? কিন্তু থাকলে কি হ'বে ? রাবণের শক্তি, সামর্থ্যে কার কী উপকার হ'য়ে থাকে ? শিবহীন দক্ষযজ্ঞে কার কী সুবিধা হ'য়ে থাকে ? যদি বাঁচতে চান, বাঁচাতে চান, নিজের ও পরিবেশের জীবনে balance (সামঞ্জস্য) আনতে চান, তবে নিজেরা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হন, অন্যকেও ক'রে তোলেন তাই—সেটা intellectually (বুদ্ধিগতভাবে) বা philosophically (দার্শনিকভাবে) নয় ; বাস্তবে, প্রতিটি মুহূর্ত্তে, প্রতিটি ব্যাপারে। ঐ নেশা ক'রে নিতে হয়, তা'তে যা' থাকে কপালে। সব প্রত্যাশা ছেড়ে পাগলের মত

লেগে যেতে হয়, তখন বুকখানা, মুখখানা ডগমগ হ'য়ে থাকে—ভাবে, ভাষায়, আনন্দে।

প্রফুল্ল—মানুষ আনন্দ আনন্দ করে, কিন্তু পদে-পদেই তো পাহাড়-প্রমাণ বাধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংগ্রামই তো জীবন, বিরুদ্ধতাগুলি যেন মৃত্যুর রেশ, তাই সে-গুলিকে জয় করার মধ্যে আমাদের এত আনন্দ—এই হ'লো জীবনের বিধি। কিন্তু আজকাল আমাদের ধারণা বিকৃত হ'য়ে গেছে, সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য বলতে আমরা বুঝি নির্ঝঞ্ঝাট জীবন, কোন ঝামেলা থাকবে না, বাধা থাকবে না, কষ্ট থাকবে না, অভাব থাকবে না, আরামে খাব-দাব আর স্ফূর্ত্তি করব, তা' কিন্তু নয়। বাধা, অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ইত্যাদিকে অতিক্রম করতে গিয়েই আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়, আর তা'তেই আনন্দ। প্রতিকূলকে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধান যে যত করতে পারে, সে নিজেকে ততখানি অনুভব ও উপভোগ করতে পারে, তার বুদ্ধিও ততখানি বিকশিত হ'য়ে ওঠে, ব্যক্তিত্বও বেড়ে যায়, evolution (বিবর্ত্তন) বা becoming (বিবর্দ্ধন) অমনি ক'রেই সম্ভব। বহুদিন ধ'রে পরাধীনতার ফলে, আমরা কেমন আতুরে, অলস, অপোগণ্ড মত হ'য়ে গেছি। বীর্য্যের জীবন, পরাক্রমের জীবন, জয়মুখর সংগ্রামের জীবন আমাদিগকে আজকাল আর প্রলুব্ধ করে না। তাই, ভয়কাতুরে হ'য়ে বাস্তবতাকে এড়িয়ে ফাঁকি দিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। এইভাবে সমস্যাকে যত এড়াতে চাচ্ছি, তার থেকে যত গা বাঁচাতে চাচ্ছি, ততই নানা সমস্যার আঘাতে জর্জ্জরিত, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। ধর্ম্ম করতে আসি, সেখানেও আমাদের ঐ ফাঁকিবুদ্ধি। আমি কিছু করব না, ভগবান তুমি কৃপা ক'রে সব পাইয়ে দাও। ওরে পাগল! বিধির দরবারে ও-সব চালাকি কি খাটে? না ক'রে কি হয়? না, তা'তে কিছু পাওয়া যায়? ফলকথা, ধর্ম্মের মূর্ত্তিই আমরা দেখিনি, ধর্ম্ম যেখানে, সেখানেই বীর্য্য, জয়, যশ, ঐশ্বর্য্য। ভক্তি কখনও মানুষকে দুর্ব্বল করে না, সে মানুষকে ক'রে তোলে চিরপরাক্রমশীল ঊর্জ্জী অনুরাগ-সম্পন্ন। ভক্ত কখনও ইষ্টের বোঝা হয় না, ভার হয় না, গলগ্রহ হয় না, সে হয় তাঁর বল, ভরসা, সম্পদ্, আশা-উদ্দীপনার মাণিক। হনুমানকে দেখ না? রামচন্দ্র মুসড়ে যান তো সে দমে না। তার যে মা জানকীকে উদ্ধার না করলেই নয়। সব দায়িত্ব মাথায় নিয়ে যেমন ক'রে যা' করলে মা জানকীর উদ্ধার হয়, সে তাই করলো। এতে সে পাপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাল, স্বর্গ-মোক্ষ, ভগবান-লাভ কিছুরই ধার ধারেনি। রামচন্দ্রকে সুখী করা, তাঁর মুখে হাসি ফোটান, তাঁর ইচ্ছা পূরণ করা—এই ছাড়া অন্য কোন চাহিদার

বালাই ছিল না তার। নিজেকে ভুলে গিয়ে ইষ্টের তৃপ্তির জন্য, তাঁর প্রীতির জন্য এমন বেপরোয়াভাবে কর্ম্মমাতাল হ'য়ে ওঠাটাই ধর্ম্ম। ওই পথে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ভগবানলাভ, সুখ-শান্তি, আনন্দ, জয়, যশ, ঐশ্বর্য্য, সাফল্য, সার্থকতা সবই এসে সহজে ধরা দেয়, কিন্তু কোনটার জন্যই মাথা ঘামাতে হয় না।

প্রশ্ন—কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে না, এইতো বড় মুশকিলের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটাকে মুশকিল বলছ, আমি তো সেইটেই দেখি আসানের কথা। বিহিত তপস্যার ভিতর-দিয়ে যা' আমরা লাভ না করি, যেটা আমরা এমনিই পেয়ে যাই, যার জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করি না, তা' পেলেও তার মূল্য ও মর্য্যাদা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, আর সেটা আমরা ধ'রেও রাখতে পারি না। তাই তেমন পাওয়ায় লাভ কী? কিন্তু অনলস অনুশীলনায় চরিত্র যদি তৈরী হয়, তবে তা' কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আর, চরিত্র ও স্বাস্থ্য যদি ঠিক থাকে, তবে মানুষ out of nothing (কিছু-নার ভিতর-দিয়ে) সব create (সৃষ্টি) করতে পারে। এইজন্য Bible (বাইবেল)-এ আছে—Seek ye first the kingdom of heaven and all other things shall be added unto you. (প্রথমে স্বর্গরাজ্যের অন্বেষণ কর, তাহ'লে সব-কিছুর অধিকারী হবে।) স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ মানে সপরিবেশ ইষ্টনিষ্ঠ, সুসঙ্গত, প্রীতিদীপ্ত, যোগ্য জীবন ও চরিত্র লাভের চেষ্টা। অতন্দ্র প্রয়াসে এই পথে অগ্রসর হ'তে হবে। কারও প্রতি ভালবাসায় আমরা যদি কিছু করি, তবে কষ্ট বা পরিশ্রম গায়ে লাগবে না, ঐটেকেই উপাদেয় ও মধুর ব'লে মনে হবে, ঐটুকু বাদ দিলে বরং সুখের উপাদান ব'লে কিছু থাকবে না জীবনে। মোদ্দা কথা এই যে, effort (প্রচেষ্টা)-র ভিতর-দিয়ে ছাড়া আমরা কিছুই লাভ করতে পারি না, সে যে-কোন দিকেই হোক না কেন। শরীর বাড়াতে গেলে যথাবিধি exercise (ব্যায়াম) করতে হয়, শক্তি বাড়াতে গেলে বিহিত রকমে শক্তির ক্ষয় করলেই তা' সম্ভব। Rifle of becoming (বিবর্দ্ধনের রাইফেল) হাতে with an armoured move (সশস্ত্র চলনে), beyond (অনায়ত্ত)-কে হস্তগত করার পথে আমাদের অমৃত অভিযান। কষ্ট দেখে ঘাবড়ালে চলবে না, বিবেকানন্দ স্বামী যা' বলেছেন—Iron muscles and nerves of steel (লৌহের মত পেশী এবং ইস্পাতের মত স্নায়ু) নিয়ে চলতে হবে।

প্রশ্ন—অতো তাফালের কথা চিন্তা করলে মন যে দমে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি তো আছে—'ইষ্টটানটি নিভু-নিভু'।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) পুরো ছড়াটি আবৃত্তি ক'রে বললেন,

ইষ্টটানটি নিভু-নিভু
বাধায় নাজেহাল,
এমন হ'লে দেখিস খুঁজে
কোথায় কামের জাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন দমবে কেন ? মন তো মাতাল হ'য়ে থাকবে। বাধা-বিঘ্ন আসলে রুখে দাঁড়াবে। তা' যখন দাঁড়ায় না, তখন বুঝতে হবে, কামকামনার জালে জড়িয়ে পড়েছ। (সহাস্যে) হয়তো টগর সুন্দরীর চোখের টান মনকে টেনেছে তোমার, কাজে না হ'লেও হয়তো ভাবনা-চিন্তায় সেই রাজ্যে বিচরণ করছ। কল্পনার সৌধ গড়ছ। পাছে সেই সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তা কি তুমি সইতে পার ? (সকলের হাস্য)। তখন তো স্ফূর্ত্তির কসরৎ যেটা, তাকেও মনে হবে অনাহূত উৎপাত ব'লে। এইভাবে এক-একটা প্রবৃত্তি-অভিভূতিকে আশ্রয় ক'রে মানুষের জগৎ সংকীর্ণ হ'য়ে ওঠে, সে জড়ত্বের দিকে এগিয়ে চলে, উদার উদাত্ত কর্ম্মঠ ব্রাহ্মী-চলন অর্থাৎ বৃদ্ধিমুখী চলন, তখন তার আর পছন্দ হয় না। তাই সব সময় নিরখ-পরখ করতে হয়, যা'তে কোন প্রবৃত্তি আমাদের পেয়ে না বসে অর্থাৎ মূল থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত না করে। প্রবৃত্তি-চলনকে একবার যদি প্রশ্রয় দেওয়া যায়, সে যে ধাপে-ধাপে আমাদের কতদূর টেনে নামাতে পারে, তার ঠিক নেই। একটার পর একটা ফ্যাকড়া বেরুতে থাকে। শুনেছি, এক সাধু ছিল, তার কৌপীন রোজ ইন্দুরে কেটে দিত। তখন ইন্দুরের হাত থেকে কোপিন বাঁচাবার জন্য সে এক বিড়াল পুষলো। বিড়ালের এখন দুধ লাগে, করা যায় কি ? অগত্যা একটা গরু কিনতে হ'লো। গরু কিনে তাকে রাখে কোথায় ? গোয়ালঘর তুলতে হ'লো। গরু বিড়াল ইত্যাদির সেবা সে একলা করে কিভাবে ? তখন সে বিয়ে করল। বিয়ে ক'রে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করতে হবে, কাজ-কর্ম্ম রুজি-রোজগার তো কিছু চাই। সে তখন সেই ধান্ধায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। কোথায় গেল তার সাধন-ভজন, কোথায় গেল তার ভগবদারাধন, কোথায় গেল তার লোকসেবা। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, সে তখন হন্যে হ'য়ে ছুটছে পরিবারের জন্য। আর, যে জিজ্ঞাসা করে, তাকে বলে—বিয়ে করেছি, স্ত্রীর প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে তো ? কত কর্ত্তব্যে বিব্রত সে তখন, কিন্তু ইষ্টকে নিয়ে যে তার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, সে-কর্ত্তব্যের কথা তার একবারও মনে পড়ে না। এক কৌপীন কো ওয়াস্তে সে জীবনকে জলাঞ্জলি দিল। এইভাবে এক-এক কৌপীন নিয়ে আমরা এক-একজন আটকে যাই, আর

বৃহৎ চলা ব্যাহত হয়। তাছাড়া, শারীরিক অবস্থার উপর উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি অনেকটা নির্ভর করে। তাই বিহিত আহার-বিহার, শ্রম, নিদ্রা, স্ফূর্ত্তি, সদাচার ও মিত-চলনে শরীরটাকে সুস্থ, সহনপটু, কর্ম্মঠ ক'রে রাখতে হবে। এটা ধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ, তাই বলে 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'।

একটি দাদা তার ছেলে-বৌ অবাধ্য ও হৃদয়হীন ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা যদি তোমার প্রতি সশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে, তাহ'লেই এর প্রতিকার হয়। তা' যতক্ষণ না হ'চ্ছে, তুমি লাখ উপদেশ দিয়েও কিছু করতে পারবে না। অবশ্য, তাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসার পরোয়া না রেখে তুমি যদি তোমার ইষ্টকে নিয়ে সক্রিয়ভাবে মত্ত থাকতে পার এবং তারা যদি বোঝে যে, তুমি এমন একটা ভূমিতে দাঁড়িয়েছ, যেখানে তোমার অন্তর স্বতঃই ভরপুর, তাদের কাছে কোন প্রত্যাশা পর্য্যন্ত রাখ না তুমি—একমাত্র তাদের মঙ্গল ছাড়া, অথচ তাদের সম্বন্ধে তোমার যা' করণীয় তা'ও যদি হৃদ্য প্রসন্ন-চিত্তে ক'রে চল—কোন অনুযোগ বা অভিযোগ না ক'রে, তখন তারা ধীরে-ধীরে শায়েস্তা হ'য়ে যাবে। দুদণ্ড তোমার সঙ্গলাভ করবার জন্য, তোমার সেবা করবার জন্য তারা লালায়িত হ'য়ে উঠবে। এটা ঠিক জেনো—দুনিয়া তেলোমাথায় তেল দিতেই ভালবাসে। যখন তুমি ইষ্টকে নিয়ে মাতোয়ারা হ'য়ে আছ, কেউ তোমাকে শ্রদ্ধা, সম্মান বা তোয়াজ করলো বা না-করলো সে-দিকে চেয়ে দেখবার অবকাশ নেই, তখনই দেখবে তোমাকে শ্রদ্ধা ও মান্য দিতে সকলেই উঠে-পড়ে লেগেছে। যখন তুমি নিজের পেটের ধান্ধা ভুলে, সকলের পেটের ধান্ধায় ব্যস্ত হয়েছ, তখন তোমাকে কিছু খাওয়াতে পারলে, দিতে পারলে মানুষ যেন বর্ত্তে যা'চ্ছে। তাই বলে—'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'।

স্মরজিৎদা কলকাতা থেকে এলেন—কফি. কড়াইশুঁটি, আপেল, দ্বারিকের দোকানের নূতন গুড়ের সন্দেশ, ভাল দই ইত্যাদি নিয়ে। তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য ভাল shaving soap (দাড়ি-কামানর সাবান), মাথায় মাখার গন্ধতেল ইত্যাদিও নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্মরজিৎদাকে দেখে মহাখুশি। হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—কি মাল আনছিস্ রে?

স্মরজিৎদা এক-এক ক'রে উল্লেখ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লসিত হ'য়ে)—জবর কাম করিছিস্, যা, বড়বৌ-এর (শ্রীশ্রীবড়মা) কাছে দিয়ে আয় গিয়ে।

স্মরজিৎদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে জিনিসগুলি নিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

ওখানে জিনিস দিয়ে আবার এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাম্বুর পাশে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টিতে বার-বার স্মরজিৎদার দিকে তাকাচ্ছেন, মুখে তাঁর করুণাদীপ্ত ঈষৎ হাসি, সে হাসির ছোঁয়ায়, সকলেরই অন্তর যেন নির্ম্মল ও নিষ্কলুষ হ'য়ে উঠছে। শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তরঙ্গ স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলছেন—ও ঐ তালেই আছে। আর জিনিসপত্র কেনাকাটায় ওর আর জুড়ি নেই। হ্যাঁ! আর, আর আছে সুশীলদা। ওদের দু'জনের taste (রুচি)-ই আলাদা। যা' কেনে, তা' সহজ, সুন্দর, অথচ টেকসই, আবার ব্যয়বাহুল্যও করে না। 'সুন্দর' বলতে কী বোঝায়, অনেকের সে ধারণাই নেই, clumsily gorgeous (জাবড়াভাবে জাঁকজমকপূর্ণ) যা', অনেকে তাকেই সুন্দর মনে করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর খুটিয়ে-খুটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

—মাষ্টারমশায় (শ্রীশশিভূষণ মিত্র—শ্রীশ্রীঠাকুরের ডাক্তারী পড়ার সময়কার শিক্ষক, বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য, এবং কলিকাতা এলাকার ভারপ্রাপ্ত ঋত্বিক্) কেমন আছেন ?

স্মরজিৎদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রবি, যতীনদা, হীরালাল, ধীরেন—এরা ভাল আছে তো ?

স্মরজিৎদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কলকাতায় কাজকাম কেমন হ'চ্ছে ?

স্মরজিৎদা—মোটামুটি ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোটামুটি ভাল হ'লে চলবে না, খুব ভাল হওয়া চাই। আর, ১৩০ টাকার (শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণ ও পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য ছয় বৎসরে ১৩০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি) move (আন্দোলন) জোরসে চালাও। বইগুলি দোয়ারে ছাপায়ে ফেলাও, ইংরাজী ও হিন্দীতে translation (অনুবাদ)-এর ব্যবস্থা করা লাগবে। ইসলাম-প্রসঙ্গে উর্দ্দু'তে ছাপান ভাল। কেষ্টদারা এবার ঠিক করছে—যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ইত্যাদি জায়গায় যেখানে বেশী whole-time worker (নিয়তকর্ম্মী) আছে, সেখান থেকে কিছু টেনে এনে, এবং centre (কেন্দ্র)-থেকে যাকে-যাকে পারে দিয়ে, বাংলার সব জেলাতেই কাজ সুরু ক'রে দেবে। জেলায়-জেলায় দু'একজন ক'রে থাকবে, আর তাদের কাজে push (উচ্চেতনী প্রেরণা) দেবার জন্য, শরৎদা ও প্রফুল্ল—এই দু'জনের দুটো touring batch (ভ্রাম্যমাণ দল) হবে। আর, কেষ্টদা centre (কেন্দ্র) থেকে

সবাইকে চিঠিপত্র লিখে guide (পরিচালনা) করবে। প্রয়োজন মত কোন-কোন সময় কেষ্টদা ও খ্যাপাও বাইরে যাবে। এরা সব গেলে তো আমি কাণা হ'য়ে পড়ব। তাছাড়া, বাইরে ও এখানে আরো অনেক intelligent (বুদ্ধিমান), devoted (ভক্তিমান), selfless (নিঃস্বার্থ), painstaking (কষ্টসহিষ্ণু), efficient (যোগ্য) worker (কর্ম্মী) প্রয়োজন। তাই, তাড়াতাড়ি worker (কর্ম্মী) যোগাড় কর। তারা অবিবাহিত হ'লেই ভাল হয়। 'ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা, নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'—এই হবে তাদের motto (নীতি)। পিছটান যদি বড় হয়, তাহ'লে এ-কাজ পারবে না। রামকেষ্ট ঠাকুর বলেছেন—এ-কাজ ঈশ্বরকোটী পুরুষের কাজ। ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা যাদের জীবনে normally primary and prominent (স্বতঃই প্রথম ও প্রধান), তারাই ঈশ্বরকোটী পুরুষ। এমনতর যারা, তারা কোন selfish consideration-এই (স্বার্থচিন্তাতেই) deviated (ব্যতিক্রান্ত) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনতে-শুনতে সবাই উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলেন।

সৌরজগৎ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি বিষয়ক কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর atlas (ভূচিত্রাবলী) চাইলেন, কেষ্টদার বাড়ী থেকে এনে দেওয়া হ'লো। অমাবস্যায় চন্দ্র কেন দেখা যায় না, শ্রীশ্রীঠাকুর atlas (ভূচিত্রাবলী) দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। পরে বললেন—সৌরজগৎ ক'য়ে দেয়, 'মানুষ তুমি মূলকেন্দ্রের দিকে চেয়ে তাঁকে অনুসরণ ক'রে চল, কক্ষচ্যুত হবে না, dynamic energy (গতিশীল শক্তি) পাবে ; আর বৃত্তি-রঙ্গিল অহং নিয়ে চ'লো না, তাহ'লে কাউকে বা কিছুকে যথাযথভাবে দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না, তোমার বিকৃত ধারণাকেই দেখবে সর্ব্বত্র, কিন্তু সত্তারঙ্গিল অহং যদি থাকে, অস্তিত্ব, জ্ঞান ও বোধ তোমার অটুটই থাকবে।'

শরৎদা fine arts (চারুশিল্প)-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির exposition-ই (প্রকাশই) art (শিল্প), তা' হওয়া চাই সুন্দর, সরস, হৃদয়মনোগ্রাহী, জীবনের পক্ষে হিতকর। মানুষের ইন্দ্রিয়ের কাছে তার একটা pleasing appeal (প্রীতিকর আবেদন) থাকবে, কিন্তু তাই ব'লে তা' মানুষকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বা ইন্দ্রিয়-পরবশ ক'রে তুলতে প্রেরণা যোগাবে না। বরং তা' মানুষকে জোগাবে ইন্দ্রিয়াদি ও জগতের যা'-কিছুর অধীশ্বর হওয়ার প্রেরণা, তাকে দেবে আশা, ভরসা, উদ্দীপনা ; মানুষের জীবনকে, মানুষের সংসারকে, মানুষের সমাজকে নূতন ক'রে, সুন্দর ক'রে, উন্নততর ক'রে

গ'ড়ে তোলার সক্রিয় স্বপ্ন। এই জন্যই আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে tragedy (বিয়োগান্ত নাটক)-এর সমাদর ছিল না, tragedy (বিয়োগান্ত নাটক) হ'লো জীবনের বৈকল্যের exposition (প্রকাশ)। এমন অনেক শক্তিমান লেখক ও শিল্পী আছেন, যাঁরা tragic end (বিয়োগান্ত পরিণতি)-র উপর একটা আসক্তি জন্মিয়ে দিতে পারেন, তা' কিন্তু সর্ব্বনেশে, মানুষ তখন সেই ভাবের বোলচাল ধ'রে সেই পথে অগ্রসর হয়।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় যোগেনদা (সরকার) খবরের কাগজ নিয়ে আসলেন, তখন কাগজ পড়া হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-সহকারে যুদ্ধের খবর শুনতে লাগলেন।

৩০শে অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৪৮ (ইং ১৫।১২।৪১)

স্থান—বাঁধের ধারের তাসু (পাবনা আশ্রম)
কাল—প্রাতঃকাল

খণ্ডকালের খণ্ডচেতনায়, ক্ষুদ্রস্বার্থে, ক্ষুদ্রপ্রচেষ্টায় পরিব্যাপ্ত থেকে ভিতরটা আমাদের মাঝে-মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় কোথায় যেন কী তাল কেটে গেছে, বেসুরা লাগে, রসের অভাবে একটা শুষ্ক কঠোরতার বোধ মনকে নিরন্তর পীড়া দিতে থাকে, সার্থকতার পরিতৃপ্তি অন্তরের মাঝে ধরা দেয় না, সবই যেন ভূতের বেগার খাটার মত মনে হয়, স্বচ্ছন্দ বিচরণের একটা ভূমিই যেন মেলে না, নৌকো যেন চড়ায় ঠেকেছে, মাছ যেন জলছাড়া হ'য়ে পড়েছে, প্রাণ আইঢাই করতে থাকে। মানুষ অন্তর ভ'রে প্রার্থনা করে তখন 'কে আছ কোথায় ? আমার এ জীবন-মরুভূমিকে সরস ক'রে দাও, শীতল ক'রে দাও, সলীল ক'রে দাও, চিরস্রোতা ক'রে তোল, সুখে, সুধায়, সার্থকতায় ভ'রে দাও।' অনেকে এই ক্ষুদ্র, খণ্ড, ছিন্ন, খিন্ন জীবনের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পাবার আশায়, দুনিয়ার সংশ্রব ত্যাগ ক'রে ভূমার সন্ধানে ফেরে, কিন্তু বঞ্চিত হয় তারাও। তাহ'লে উপায় কী ? পথ কোথায় ? হ্যাঁ! পথ আছে, আছে উপায়। শুধু পথ নয়, উপায় নয়, গন্তব্য ও পথ, উদ্দেশ্য ও উপায় সংগ্রথিত হ'য়ে আছে একসত্তায়,—তাঁকেই বলে মূর্ত্ত নারায়ণ, শ্রীবিগ্রহ পুরুষোত্তম। ক্ষুদ্র ও খণ্ডকালের মধ্যে বিচরণ ক'রেও, মানুষের ক্ষুদ্রতম অগণিত প্রয়োজন-পূরণে পরিব্যাপ্ত থেকেও তিনি অখণ্ড ও ভূমায় চির-সমাসীন। ক্ষুদ্রকে বাদ দিয়ে বৃহৎ নেই, কিন্তু ক্ষুদ্রকে যখন আমরা বৃহৎ

থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখি, ক্ষুদ্রের জন্যই ক্ষুদ্রকে খুঁজি, তার প্রতি আসক্তি ও মোহে তার সেবায় উৎসর্গ করতে চাই নিজেদের বিরাট সত্তাকে, সেইখানেই হয় ছন্দপতন। মানুষের ভগবান তাই মানুষকে দেখিয়ে দেন—কেমন ক'রে অখণ্ড একের জন্য ক্ষুদ্র, খণ্ড, ছিন্ন বহুকে নিয়োজিত ক'রে একসূত্র-সঙ্গতিতে যা'-কিছুকে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলতে হয়। তখন মানুষের সরসতার অভাব হয় না, শক্তির অভাব হয় না, হয় না অভাব শান্তির, অমৃতময় হ'য়ে ওঠে জীবনটা, কাণায়-কাণায় ভ'রে যায় প্রত্যেকটি কোষ-অণুকোষ, দুঃখ-কষ্টের দাবানলের মধ্যেও তখন ভিতরটা আর শুষ্ক মনে হয় না। খুঁটিনাটি সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে ঠাকুর আমার সবার ভিতরে এই একায়নী অমৃতোৎসারণে নিত্য-নিরত—যা' কিনা প্রতিটি জীবের জীবন, বর্দ্ধন ও বিবর্ত্তনের আদিম সম্পদ। তাই চল! এ পুণ্য প্রভাতে বৃথা কালক্ষেপ না ক'রে ত্বরায় তাঁর কাছে যাই—উপাসনা করি তাঁর। সেখানে গিয়ে দেখবো, বুঝবো, জানবো—কেমন ক'রে সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন সার্থকজীবন যাপন করতে হয়।

তখন তাঁর কাছে প্রাণমাতানো আলাপ-আলোচনা চলছে। তিনি আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে অমৃত-পরিবেষণ করছেন।

একজন জিজ্ঞাসা করছেন—মানুষকে একবার কিছু দিলে সে যেন পেয়ে বসে, কেবলই চায়, তার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সে আর বলতে? আমারও খুব দেখা আছে। তাই যাকে দাও, অন্যের প্রয়োজনে তাকে দিয়ে যদি না দেওয়াতে পার, তার অভাব কিন্তু ঘুচবে না। পাওয়ার বুদ্ধি, নেওয়ার বুদ্ধিই তাকে পেয়ে বসবে। আবার, না ক'রে দুঃখের কাঁদুনি গেয়েই পেতে চাইবে, তা'তে তার বুদ্ধিবৃত্তি, কর্ম্মশক্তি কিছুই খুলবে না, সে পঙ্গু হয়েই থাকবে। এতে তারও লাভ নেই, তোমারও লাভ নেই, সমাজেরও লাভ নেই। তাই, দেওয়ার অভ্যাস গজিয়ে দিতে হবে, যেন তেন প্রকারেণ। দেওয়া-নেওয়ার সামঞ্জস্য থাকলেই, সত্তার সুস্থতা বজায় থাকে। কাউকে যদি কিছু দাও, অন্যের প্রয়োজনে আবার তার কাছ থেকে নেবে, তার activity (কর্ম্ম) বাড়িয়ে তাকে তোমার স্বার্থ ক'রে তুলতে হবে, ঐজন্যই আমি মানুষের কাছে চাই। তোমরা পাঁচজন আছ, যে সহজে দিতে পারে, তার কাছে হয়তো চাইলাম না, যার দিন চলে না, তার কাছেই হয়তো কারও জন্য কিছু চেয়ে বসলাম, আবার খামাকাও চাই। ঐ বুদ্ধি, মানুষের যা'তে যোগ্যতা বাড়ে। আমি দেখেছি, যে নিজের ধান্ধায় হয়তো হতভম্ব, দিশেহারা, পথ পাচ্ছে না, সে অন্যের অভাব-পূরণে বাস্তবতঃ যদি কিছু করে, কিছু সংগ্রহ ক'রে যদি দেয়, তার ভিতর-দিয়ে তার যে আত্মপ্রসাদ, আত্মপ্রত্যয় গজায়, তার ফলে

তার নিজেরও পথ খুলে যায়। মানুষের যদি ভাল করতে চাও, এ তোমার করাই লাগবে। তার অসামর্থ্যের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে, তুমি যদি তার উপর প্রীতিকর চাপ দিতে নারাজ হও, তাহ'লে তার অপারগতাকেই কায়েম ক'রে তুলবে তুমি। আবার, চাইতে জানা চাই—এমন সহজ, স্বাভাবিক প্রাণস্পর্শী ভঙ্গীতে চাইবে, যে-চাওয়ার ভঙ্গী দেওয়ার একটা উদগ্র আবেগ সৃষ্টি করে, সেই আবেগই তাকে শক্তি যোগাবে, বুদ্ধি যোগাবে। তখন যত অসুবিধাই থাক না কেন, ঐ প্রচেষ্টাই তার কাছে প্রীতিকর মনে হবে। কিন্তু তুমি যদি চাওয়ার সময় 'কিন্তু' 'কিন্তু' কর, তোমার মনে যদি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকে, দৈন্য ও সঙ্কোচ-পীড়িত চেহারা নিয়ে যদি তার সামনে দাঁড়াও, তোমার ঐ ভাবই তার মধ্যে চারিয়ে যাবে, তার প্রাণে তুমি কোন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারবে না, যার প্রেরণায় পারাটা তার কাছে সহজ হ'য়ে ওঠে। তাই ইষ্টার্থী ভিক্ষা ছিল আমাদের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। আচার্য্য-গৃহে গিয়ে বিদ্যার্থীকে নিত্য ভিক্ষা ক'রে আচার্য্যকে খাওয়াতে হ'তো। এতে পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে, তাদের অভাব, প্রয়োজন ও সমস্যার সঙ্গে একটা বাস্তব পরিচিতি ঘটতো। লোক-ব্যবহার কী, কেমন ক'রে কোন্ মানুষটির সঙ্গে চলতে হয়, বলতে হয়, হৃদ্য ব্যবহারে কেমন ক'রে তার হৃদয় জয় করতে হয়, সে-সম্বন্ধে তাদের একটা অভিজ্ঞতা জন্মাতো। আবার, মানুষের বাস্তব নানা সমস্যার সমাধান কেমন ক'রে করতে হয়, মানুষকে কেমন ক'রে সেবায় সম্বর্দ্ধিত করতে হয়, সে-সম্বন্ধেও তারা আচার্য্যের কাছ থেকে নির্দ্দেশলাভ ক'রে, হাতে-কলমে তা' ক'রে জ্ঞানের অধিকারী হ'তো। তাই, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে তাদের আর বেকার থাকা লাগতো না, যে-পরিস্থিতির মধ্যেই তারা পড়ুক, সেখানে থেকেই বৈশিষ্ট্যসঙ্গত সেবায় পারিপার্শ্বিকের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে নিজের সত্তা ও স্বার্থকে অক্ষুন্ন রাখতো তারা। তারা বুঝতো, মানুষই তাদের পরম স্বার্থ। তাই, যে-শিক্ষা মানুষকে লোকস্বার্থী না ক'রে অর্থস্বার্থী ও ভোগস্বার্থী ক'রে তোলে, তা' কিন্তু ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। আবার, ঐ ইষ্টার্থী ভিক্ষা আত্মনিয়ন্ত্রণেরও পরম সহায়ক। অমনতর ভিক্ষায় অষ্টপাশ শিথিল হ'য়ে যায়। অষ্টপাশ হ'লো ঘৃণা, লজ্জা, মান, অপমান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ, পৈশুন্য। এইগুলি মানুষের সহজ ও সলীল গতিকে নিরুদ্ধ ক'রে রাখে, তার উন্নতিকে খর্ব্ব ক'রে তোলে। তোমাদের অনেকের যে ভিক্ষা ক'রতে বাধো-বাধো ঠেকে, তার কারণ ঐ অষ্টপাশ। আবার, ভরণ-দীপনায় অন্যকে যে উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত ও উচ্ছল ক'রে তুলতে পারে না, সেও মানুষের কাছে প্রাণখুলে চাইতে পারে না। মানুষের মঙ্গল যে চায়, তার ইষ্টার্থী ভিক্ষায়

সঙ্কোচ-বোধের কোন কারণ থাকতে পারে না। কেউ অমনতর ভিক্ষা করতে পারে না, তার মানে, অষ্টপাশ তাকে ঘিরে আছে কিংবা ভিক্ষা দিতেও সে কৃপণ। সে-কথা তো সে বলবে না, অজুহাত দেখাবে মানুষের অভাব, অসুবিধার কথা ব'লে, যেন সে কতই দরদী তাদের। আরে, মানুষের কী অবস্থা তা' কি আমি জানি না ?—জানি ব'লেই তো আরো বেশী ক'রে বলি, ও-ছাড়া যে তাদের যোগ্য ক'রে তোলার পথ নেই। ফলকথা, এই অষ্টপাশকে যদি না কাটাই, কার্পণ্যকে যদি অপসারিত না করি, আমরা তেলাপোকার মতই ছোট্টটুকু হ'য়ে থাকবো, এবং সেটা জীবনের সবক্ষেত্রে। আবার, সংগ্রহের বেলায় এটাও লক্ষ্য রাখবে, যা'তে, যার কাছে যতটুকু নিচ্ছ, তার হাজার গুণ তাকে আপূরিত ক'রে তুলতে পার। তাকে বুদ্ধি দেবে, বল দেবে, ভরসা দেবে, এমনতর যোগাযোগ সৃষ্টি ক'রে দেবে—যা'তে সে ক্রম-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে। তাহ'লে তোমার পাওয়ার উৎস শুকিয়ে উঠবে না, অফুরন্তভাবে পাবে তার কাছ থেকে, অবশ্য পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে কিছু করতে যেও না। এখানেও ঐ দেওয়া-নেওয়ার সঙ্গীত চাই, বরং মানুষকে দেওয়া, তার জন্য করা—এইটেই যেন ডাইনের দিক থাকে। নিজেরা এই বুদ্ধি নিয়ে চল, সবার মধ্যে এই বুদ্ধি ঢুকিয়ে দাও, তখন দেখবে pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি)-র কাম ফর্সা, তখন দেখবে কেউ proletariat (সর্ব্বহারা) থাকবে না, আর তাদের জন্য দাবী-দাওয়ার আন্দোলনও করা লাগবে না।

ইন্দুদা (বসু)—আমাদের আয় ও প্রয়োজন এ-দুইয়ের মধ্যে তো সামঞ্জস্য নেই, তাই যতই হিসেব ক'রে চলি না কেন, কিছুতেই তো পেরে উঠি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উপার্জ্জনই তোমার demonstrated ability ও activity (প্রদর্শিত যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তি)-র মাপকাঠি, এতে বোঝা যায়, তুমি কতখানি করেছ, কতখানি যোগ্যতা দেখিয়েছ। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনানুরূপ উপার্জ্জনের জন্য, আরো কতখানি করতে হবে, হ'তে হবে, তাও বুঝতে পার। অফুরন্ত সম্ভাব্যতা তোমাদের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে, তাকে যদি জাগ্রত ক'রে না তোল, তাহ'লে হবে কেন ? একটা পরিবার কেন, ১০।২০টা পরিবার প্রতিপালন করার মত ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে আছে, তা' যদি কাজে না খাটাও, তাহ'লে টের পাবে কি ক'রে ? শুধু নিজের পরিবারের কথাই ভাব, তাই ঐ ছোট্ট পরিবারটা চালাতেই হিমসিম খেয়ে যাও। তোমার যদি মাথায় থাকে যে, নিজের সংসারটা তো ভালভাবে চালাবই, সেই সঙ্গে-সঙ্গে আরো ৫।১০টা সংসার টেনে নেব, বহু মানুষকে প্রতিপালন করব, ঠাকুরের ভার লাঘব করব,

আর নিজের সংসারের জন্য যেমন বুকভরা দরদ ও দায়িত্ব বোধ কর, তাদের জন্যও যদি তেমনি কর, নিজেকে যদি সেইভাবে ভাবিত ক'রে তোল, তাহ'লে দেখবে, ঐ urge (আকূতি)-ই তোমার activity (কর্ম্মশক্তি) ও efficiency (দক্ষতা) বাড়িয়ে তুলবে। নিজের সংসার চালাতে কষ্ট তো হবেই না, আরো পাঁচজনকে সম্ভব মত সাহায্য করতে পারবে। এটা ঠিক জেনো—নিজের বৃহত্তর পরিবেশকে যদি সুস্থ, স্বস্থ রাখার দায়িত্ব গ্রহণ না কর, লাখ চেষ্টা ক'রেও তুমি তোমার পরিবারকে ভালভাবে রাখতে পারবে না। নিজেকে ছোট ক'রে ভেবেই তো ঠ'কে যাও। মনে রেখো তুমি তোমার ইষ্টের, তাই তুমি সবার, কারণ সকলের জন্যই তিনি, আবার তুমি যদি সকলের হও, সবাই তোমার। তোমার কি কোন ইতি আছে ? ইয়ত্তা আছে—যে তুমি থেমে যাবে ? ঘরে-ঘরে তোমার পরমাত্মীয়, দেশে-দেশে তোমার ভাই-বন্ধু, মানুষের হৃদয়ে-হৃদয়ে তোমার বাড়ীঘর, সকলের ক্ষেতখামার-গোলায় তোমার খাবার অন্ন, তোমার আবার পরোয়া কিসের ? তাই বলি, অভাব কিছুরই নেই, অভাব আছে শুধু ভাবের, ভাব মানে 'চিন্তা' নয়, 'হওয়া'। ইষ্টে তোমার ভাব হো'ক, অর্থাৎ তুমি সক্রিয়ভাবে ইষ্টসর্ব্বস্ব হ'য়ে ওঠ, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টের যারা, তারা তোমার আপন হ'য়ে উঠুক—বাস্তবে, দেখবে মা-লক্ষ্মী তোমার সুসার করতে নিজ হ'তেই এগিয়ে আসবেন।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ আবেগে স্ফীত, বিস্ফারিত ও আরক্তিম হ'য়ে উঠেছে—প্রত্যেকটি কথার মধ্যে তীব্র প্রেরণার তড়িৎস্পর্শ। এক বিশাল অনুভূতি সবার অন্তর পরিপ্লাবিত ক'রে তুলেছে—নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে সবাই চেয়ে আছেন তাঁর পানে, সে-চোখের ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে, আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, অনুরাগ, আনুগত্য।

হরিপদ-দা (সাহা) তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যমনস্কভাবে তামাক খাচ্ছেন, হঠাৎ লক্ষ্য পড়লো যে ডান হাতের একটা আঙ্গুলের একটা নখের কোনা একটু উঠে আছে, দুটো পাশ সমান নেই, তখনই প্যারীদাকে নরুন আনতে বললেন। প্যারীদা নরুন এনে দুটো পাশ সমান ক'রে দিলেন। চাঁপার কলির মত চারুগঠন তাঁর আঙ্গুলগুলির, সুঠাম সুন্দর তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সেবকগণ যাঁরা ঐ নয়নলোভন, নিখিল-পুণ্যালয়, ত্রিলোকপাবন, দিব্য বরবপু স্পর্শ করার অধিকার পেয়েছেন তাঁরা কতই না ভাগ্যবান্ !

রোদ উঠে গেছে, ধীরে-ধীরে আরো লোকজন এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে যার-যার মত ব'সে যেতে লাগলেন। একটি মা তাঁর নিজের আনীত একখানি আসন একপাশে পেতে বসলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

আসনখানা অমন ছ্যারা-ভ্যারা ক'রে পাতলি কেন, সুন্দর ক'রে পাততে হয়। প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ, শৃঙ্খলাবোধ দরকার, সামান্যতম ব্যাপারেও যদি এলোমেলো রকম থাকে, তাহ'লে ঐ অভ্যাস অন্য ব্যাপারেও চারিয়ে যায়, তাই ওটা ভাল না। তারপর তোরা মা, তোদের দেখেই তো ছাওয়াল-পাওয়াল শিখবে। তোদের খুব হুঁশিয়ার হওয়া লাগে, (সহাস্যে)—আবার যেখানে বসেছ, ওখানেও কিন্তু তোমার অসুবিধা হবে, এরা বার-বার ওখানে তামাক সাজতে যাবে, আর তোমার বার-বার ওঠা লাগবে। হাঁটা, চলা, বসা, শোয়া, কথাবার্ত্তা, কাজ-কর্ম্ম সব-কিছুর মধ্যে লক্ষ্য রাখা লাগে—সেটা যেন শোভন হয়, সুন্দর হয়, সুষ্ঠু হয়, সমীচীন হয়, হৃদ্য হয়, কারউ অসুবিধার কারণ না হয়, কারউ স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত না ঘটায়। কয়েকটা দিন একটু হিসেব ক'রে চল, তখন দেখবে তোমার স্বভাবই ঐরকম হ'য়ে গেছে। তখন যেখানে যাবে, মানুষ তোমাকে পেলে বর্ত্তে যাবে। (হাত নেড়ে গানের সুরে বললেন) বলবে, 'এসো মা লক্ষ্মী, ব'সো মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুলকিত ভঙ্গী দেখে, সবাই মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলেন।

নগেনদা (বসু)—আপনি মানুষকে তার কর্ম্মশক্তির উপর দাঁড়াতে বলছেন, কিন্তু মানুষ তো বরাবর সমানভাবে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের government (শাসনতন্ত্র)-এর মত ভগবানের government-এও (শাসনতন্ত্রেও) pension-এর (ভাতার) ব্যবস্থা আছে। কর্ম্মফল reserved (জমা) থাকে, আগের করার ফল তখন পাওয়া যায়। সেবার ভিতর-দিয়ে কতকগুলি মানুষের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে উঠেছে যে, তার আবার ভাবনা কিসের? তার এতটুকু দুঃখ দেখলে তারা তা' দূর করার জন্য অস্থির হ'য়ে পড়ে, এবং নিজেদের দায়েই তারা তা' করে—নিজেদের জীবনের জন্য, সুখ-সুবিধার জন্যই যে তাকে সুস্থ, স্বস্থ রাখা দরকার, কারণ, সেবা দিয়ে সে তাদের এতখানি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাকে বাদ দিয়ে তাদের চলে না। অনেক সময় এমন হয়, যাদের জন্য করেছে, তারা হয়তো অকৃতজ্ঞতার দরুন কিছু করলো না, কিন্তু অন্য কতলোকে করলো। এ বাবা প্রকৃতির বিধান। তবে ইষ্টপ্রাণ সেবা না হ'লে অর্থাৎ সেবার ভিতরে ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি না থাকলে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের বৃত্তিতে তেল মালিশ ক'রে সেবা ক'রে বেড়ালে, সে-সেবার ফল দানা বেঁধে ওঠে না, কারণ, মানুষকে সে নিজের প্রতি যতই আকৃষ্ট ও অনুগত ক'রে তুলতে চায়, মানুষ ততই ছিটকে যায় তার থেকে, তার ঐ আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিই তার প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। এই সব মানুষ

সাধারণতঃ এতই আত্মপ্রশংসা করে, নিজ কৃতিত্বের কথা, পরোপকারের কথা নিজ মুখেই এত বলে যে তাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা স্বতঃই বিরূপ হ'য়ে ওঠে। আবার, কেউ-কেউ মানুষকে তাদের খেয়াল, দম্ভ ও ইতর অহমিকার ইন্ধন-রূপে পেতে চায়, আর তা'তে তার দ্বারা উপকৃত কারও কাছ থেকে এতটুকু বাধা পেলেই 'নেমকহারাম', 'অকৃতজ্ঞ' ব'লে জাহির ক'রে দেয় তাকে, কিন্তু সেই হয়তো তার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ; এইভাবে আত্মীয়কে দূরে ঠেলে দেয় তারা। আবার, যে হয়তো দুষ্ট মতলব নিয়ে তাদের প্রবৃত্তির পোষকতা করছে—আত্মস্বার্থ বাগাবার জন্য এবং সেজন্য প্রয়োজন হ'লে তাদের সর্ব্বনাশ সাধন করতেও কুণ্ঠিত নয়, তাকেই তারা হয়তো পেয়ারের লোক মনে ক'রে খুব সাহায্য করবে। ফলকথা, তাদের সেবার মূলে আন্তরিকতা নেই, তাই কারও মধ্যে আন্তরিকতা আছে না-আছে, তা' বুঝবার ক্ষমতাও তাদের নেই। এমনতর খেয়ালী সেবাপ্রাণ যারা, তারা বিধ্বস্ত হবে না তো আর কে বিধ্বস্ত হবে বল ? অমনতর সেবাকে অনেকে সৎকর্ম্ম মনে করে, কিন্তু সেবার সঙ্গে ধর্ম্মদান যদি না থাকে, ইষ্টের স্বার্থ, ইষ্টের প্রীতি, ইষ্টের প্রতিষ্ঠা যদি না থাকে, মানুষকে যোগ্য ও মহৎ ক'রে তোলার প্রচেষ্টা যদি না থাকে, এক কথায় সেবা যদি সুকেন্দ্রিক না হয়, তবে সে-সেবার কোন দাম নেই, তা' অসৎ কর্ম্মেরই সামিল। অসৎ মানে—যা' জীবন-বৃদ্ধির পরিপন্থী। ও-সেবায় নিজের বা পরের কারউ ভাল হয় না।

সদাচার-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার স্বপাক খাওয়ার কথা উল্লেখ ক'রে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

সুশীলদা (বসু)—স্বপাক খাওয়ার খানিকটা কষ্ট আছে, কিন্তু খুব তৃপ্তি লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট হ'লেই নষ্ট পায় না। কষ্ট না ক'রেই বরং নষ্ট পায়। কোথার থেকে কি infection (সংক্রমণ) যে ঢোকে, তার কি ঠিক আছে ? তাই অন্ততঃ বাইরে গিয়ে নিজের হাতে রান্না ক'রে খাওয়াই ভাল, একটা কুকার থাকলে তো কোন হাঙ্গামাই থাকে না। চাপিয়ে দিয়ে কাজে বেরিয়ে গেলাম, এসে নামিয়ে গরম-গরম খেলাম। সময়ও নষ্ট হয় না, কোন অসুবিধাও নেই। অনেকে এই কুকার চাপানটাকে কঠিন কাজ মনে করে, সে শুধু অনভ্যাসের ফল। ফলকথা, যা'কিছু করণীয়, সবই অতি সহজ। পূর্ব্বের করাগুলি, অভ্যাসগুলি barrier (অন্তরায়) সৃষ্টি ক'রে রেখেছে, তাই কঠিন মনে হয়। চেষ্টা ক'রে নূতন অভ্যাস তৈরী ক'রে সেগুলিকে অতিক্রম করতে হবে, নিরসন করতে হবে। আর, হাতেকলমে কিছু-কিছু কাজ করার অভ্যাস থাকা ভাল, ওতে nerve

(স্নায়ু), muscle (পেশী) ইত্যাদি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হ'য়ে চলার অভ্যাসটা ধীরে-ধীরে গজিয়ে ওঠে, আবার অসময়ে অন্যের সাহায্য-সেবাও করা যায়। অনেকে এমন আছে যে, প্রয়োজন মত একটা ষ্টোভ ধরিয়ে একটা রোগীকে একটু বার্লি জ্বাল দিয়েও দিতে পারে না। অথচ তারা হয়তো খুব শিক্ষিত। কিন্তু শিক্ষিত লোক বলতে আমি তো বুঝি, কাজের লোক। যে নানা পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে প'ড়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে উপযোগীভাবে, সম্বর্দ্ধনী রকমে, আবার যেখানে প্রয়োজন পরিস্থিতি ও পরিবেশকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—অমনতর রকমে। তাই আমি বলি নিত্য বেদাভ্যাসের কথা। বেদাভ্যাস মানে শুধু পড়া নয়, জানার অভ্যাস, চলতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি অভ্যাসে আয়ত্ত করাও ঐ বেদাভ্যাসের অন্তর্গত।

কথায়-কথায় নগেনদা বললেন—সুশীলদা তার ব্যবহার দিয়ে আমায় conquer (জয়) করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—Conquered (বিজিত) কি আপনি হয়েছেন ? আমি আপনাদের যেমন conquer (জয়) করেছি,—সুশীলদাও তেমনি conquer (জয়) করেছে—আপনারা খুশি হয়েছেন এই পর্য্যন্ত। Conquer (জয়) করলে habits (অভ্যাসগুলি), behaviour (ব্যবহার), urge (আকূতি) বদলে যায়। আগুন যা'তেই লাগুক, তাই আগুন হ'য়ে ওঠে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় গেলেন। পরে এসে মাতৃমন্দিরে বসেছেন। দোখল প্রামাণিককে (গ্রামের একজন বৃদ্ধ মুসলমান) দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—ও পরামাণিক, কেমন আছ ? আ'সো আ'সো, তোমারে যে দেখবের পাই না।

দোখল—আর, ঠাকুর ! কাজকামে ব্যস্ত থাকি, সময়ই পাইয়ে উঠি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি বুড়ো হইছো, তোমার অতো কাজকাম দিয়ে কি হবি ? এখানে আসবা, গপ্প-সপ্প করবা, আড্ডা মারবা। বোঝ না তুমি। তুমি আসলি ভাল লাগে, সুখ-দুঃখির কথা-টথা কওয়া যায়।

দোখলের গায় একটা গেঞ্জি, কাপড়ের খোট গায়, বুড়ো-মানুষ শীতে একটু-একটু কাঁপছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার চাদর নেই ?

দোখল—চাদর পাব কো'নে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারে কও না ক্যান্। হরেনকে (ভদ্র) ডাক।

হরেনদাকে ডাকা হ'লো।

হরেনদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরামাণিকের জন্য ভাল একখানা চাদর নিয়ে আসো গে। দেখে-শুনে আনবা।

হরেনদা পাবনা-বাজারে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে কারখানার দিকে বেড়াতে বেরুলেন, সঙ্গে ২।৪ জন রইলেন। ইন্দুমিস্ত্রী একখানা চেয়ার বানাচ্ছিলেন। চেয়ারটা দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হাতলটা উঁচু হয়েছে। আর, পেছন দিকটা যদি একটু slanting (হেলান) ক'রে দিস্ তাহ'লে হেলান দিতে আরাম হবে। সুন্দর ক'রে করবি, ভাল ক'রে শিরিষ দিবি, বার্ণিশ করবি। যে তোর চেয়ার দেখবে, সেই যেন তারিফ না ক'রে পারে না।

ইন্দুমিস্ত্রীদা খুশি হ'য়ে জোরসে কাজে লেগে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে থেকে ফিরলেন—রাস্তার পাশে একটি মায়ের ঘর। শ্রীশ্রীঠাকুর তার ঘরের কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন—কিরে! ছাইগুলি ওখানে ফেলেছিস্? ওখান থেকে তো পায়-পায় তোর ঘরে গিয়ে ঢুকবে, আর ওখানে থাকলে রাত্রিবেলায় যারা অন্ধকারে পথ চলে, তাদের অসুবিধা হবে। সরিয়ে ফেল্।

মা'টি লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ছাই সরাতে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে খেপুদার বারান্দায় বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কানুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—পড়াশুনা কেমন হ'চ্ছে রে?

কানু—ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভালো ক'রে পড়ো, ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করা চাই।

ডাক আসার পর ভবানীদা কতকগুলি চিঠি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কতকগুলি চিঠি সম্বন্ধে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ দিয়ে দিলেন, ভবানীদা সেগুলি পাশে টুকে নিলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নানে গেলেন।

১লা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৮ (ইং ১৬।১২।৪১)

আজ ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাম্বুর ভিতর গিয়ে দেখা গেল, তিনি যেন কেমন বিমর্ষভাবে বিছানায় ব'সে আছেন, চোখ-মুখে কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ, মন ভারাক্রান্ত। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে, সবাই চুপচাপ রইলেন। হঠাৎ প্যারীদা (নন্দী) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠা-জড়িত ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করলেন—খ্যাপা এখন কেমন আছে?

প্যারীদা—এই ভোরে একটু ঘুম্ এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘুম এসেছে তো ?

প্যারীদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়াস্‌নি তো ?

প্যারীদা—না, এমনিই ঘুম এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘুমোলে অনেকটা সুস্থ বোধ করবে।………এইবার তামাক সাজ দেখি।………ওখানে কাছে কাউকে রেখে এসেছিস্ তো ?

প্যারীদা—হ্যাঁ! শরবিন্দু আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুইও নজর রাখিস্। এদিকে বেশী সময় থাকিস্ না।

প্যারীদা—আমি তামাক সেজে দিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (তামাক খেতে-খেতে)—আমার যে কী উৎকণ্ঠা, কী উদ্বেগ, কেউ বুঝবে না। সকলের জন্য সব সময় যেন আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে থাকি। আর, অমঙ্গলটাই যেন আমার মনে বেশী ক'রে ডাকে। সবসময় ভাবি—সবাই সুস্থ থাক, স্বস্থ থাক, সুদীর্ঘ জীবন উপভোগ করুক। কিন্তু রোগ-শোকের খবর লেগেই আছে—তাই আমি নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি না, মনে হয়, কোন্ সময় আবার কার কী খারাপ খবর শুনব। পরমপিতা আমাকে মমতা দিয়েছেন অসীম, সেই সঙ্গে-সঙ্গে উদ্বেগেরও আমার শেষ নেই। তবে আপনাদের জন্য আমার এত দুর্ভাবনা হ'তো না, যদি আপনারা যেমন-যেমন বলি, কাঁটায়-কাঁটায় সেইভাবে চলতেন। পরমপিতার দয়ায় আপনারা যা' চলার রাস্তা পেয়েছেন, সেই রাস্তায় চললে অনেক বাঁচোয়া। কিন্তু তা' কি আপনারা কথা শোনেন ? আপনাদের প্রত্যেকের যে নিজের খেয়াল আছে। তবু আপনারা যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির সূত্র ধ'রে আছেন ব'লে যে কতদিক দিয়ে কতভাবে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন তার ইয়ত্তা নেই। 'যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, করলে কাটে মহাভীতি।' এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বসেন কেষ্টদা।

কেষ্টদা—তবুমার কাছে শুনলাম, কাল রাতে আপনার ভাল ঘুম হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খ্যাপা অসুখের যন্ত্রণায় ঘুমোতে পাচ্ছে না শুনে, আমারও আর ঘুম আসলো না। প্যারী একটু আগে ব'লে গেল 'ও ঘুমিয়েছে', শুনে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

কেষ্টদা—খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মে পেট খারাপ থেকে এই অবস্থাটা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমি যেমন অনেক সময় লোভ সামলাতে পারি না, ওরও তেমনি আছে। আর বড় বৌয়ের বুদ্ধি হ'লো—আমাকে খুশে-খুশে খাওয়াবে। পাতের সামনে এনে এমন ক'রে বলে, 'আর একটু খাও', 'আর একটু খাও'। আমি তখন কেমন কাৎ হ'য়ে পড়ি, বলি—'দাও একটু।' পরে অনেক সময় বেসামাল হ'য়ে পড়ি। সেইদিন পাঁচখানা গোকুল পিঠে বসান দিয়ে অম্বলের ঠেলায় অস্থির।

উপস্থিত সবাই নীরবে হাসতে লাগলেন।

কেষ্টদা—এর মধ্যে Medical Digest-এ acidity (অম্বল)-এর কি একটা ভাল ওষুধ বের হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুঁজে বের করেন তো। আর, ভাল বুঝলে আজকেই কলকাতায় কয়েক ফাইল আনতে দেন।

কেষ্টদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকের ডাকেই চিঠি লিখে দেবেন! প্রফুল্ল! কেষ্টদাকে মনে ক'রে দিস্।

কেষ্টদা—আমার মনে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার তো মনে থাকবেই, তবু ওর এদিকে খেয়াল থাকা ভাল, চার-চোখো দৃষ্টি যদি না থাকে তবে আপনাকে assist (সাহায্য) করবে কিভাবে?

কেষ্টদা—প্রফুল্লও তো ক'দিন পরে বাইরে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো কতদিন থেকে আপনাদের—মাহুতদের বলছি—প্রত্যেকের জনকয়েক ক'রে ভাল assistant (সহকারী) তৈরী করতে, বেশ কয়েকজন থাকলে, তার মধ্য-থেকে ২।১ জন বাইরে গেলে অসুবিধা হয় না। তবে আপনার চুনি, বীরেন আছে, আর কিরণও অল্পদিনে অনেকখানি তৈরী হ'য়ে উঠেছে।

কেষ্টদা—ওদেরও হয়তো বাইরে পাঠান লাগবে। বাংলার সব জেলায় কর্ম্মী পাঠাতে গেলে কাউকে বড় এখানে রাখা সম্ভব হবে না। থাকবার মধ্যে বোধহয় দেবী (চক্রবর্ত্তী) থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ভাল। তবে প্রফুল্ল, বীরেন, চুনি—এদের মত আরো জোগাড়ের তালে থাকুন, এরা আপনার কাছে থেকে কিন্তু কম equipped (যোগ্য) হয়নি। আর. এইভাবে হাতে-কলমে সাগরেতি না করলে কিন্তু এতখানি মাথায় ঢুকতো না। আচার, অভ্যাস, ব্যবহার, চলন, চরিত্র—এগুলি যদি দুরস্ত না হয়, যে-সব কথা বলবে, তার কিছু-কিছু যদি আচরণে না আসে, তবে মানুষের মনে

তা' প্রভাব বিস্তার করে না ; আর, অতন্দ্র অনুশীলন ছাড়া তা' হবার নয়। আগ্‌লে আমলে আপনাদের নিয়ে কম ডলাই-মলাই করিনি। এক-এক তাল তুলেই রাখতাম। সব সময়ে তালের উপর থাকতেন। এমনিভাবে আজ কতখানি ধাতস্থ হ'য়ে গেছেন। নূতন যারা আসবে, তাদের পিছনে আপনাদের অমনি খাটা লাগবে। কিভাবে কী করা লাগে, আপনার বোধের মধ্যে আছে। তাইতো নূতন যারা আসে, তাদের আপনার সঙ্গে যুতে দেই।

কেষ্টদা—যার যা' হয়, আপনার contact (সাহচর্য্যে)-ই হয়, আমি আর কী করি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু আপনার মনে রং ধরেছে ব'লে আপনি অন্যের মনে রং ধরাতে পারেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য গাত্রোত্থান করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন উঠে দাঁড়ালেন, দেখা গেল তাঁর কাছাটা খুলে গেছে। কেষ্টদা তাড়াতাড়ি কাছাটা গুঁজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আবার খেপুদার খবর নিলেন।

পরে বাবলা-তলায় এসে রোদে পিঠ ক'রে একটা বেঞ্চে বসলেন। অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে প্রণাম করতে লাগলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরও স্বাভাবিকভাবে সঙ্গে-সঙ্গে পরমপিতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে লাগলেন।

পাড়ার মুসলমান রমজান এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি রে রমজান, কেমন আছিস্ ?

রমজান—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার কলাই কেমন হ'লো ?

রমজান—মন্দ না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা, বেশীর ভাগ জমিতে তো আউশ ধান ও কলাই এই দুটো ফসল করিস্। কলাই-এর পর আউশ ধানের মাঝে যে ফাঁকটা থাকে, তার মধ্যে আর-একটা ফসল করা যায় না ?

রমজান—কী ফসল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু উঁচু জমি যে-গুলি আছে, সে-গুলিতে ধর একটু আগে-আগে যদি কলাই উঠে যায়. তারপর ভাল ক'রে চাষ ক'রে, সার দিয়ে আলু কি ঐ জাতীয় জিনিস যদি বুনিস্‌ তো হয় না ?

রমজান—কি জানি, করিনি তো কোন দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা ক'রে দেখিস্ তো। একটা ফসল বেশী ফলাতে পারলে তোদের আয় অনেক বেড়ে যাবে, ছাওয়াল-পাওয়াল নিয়ে খেয়ে বাঁচবি।

রমজান—আচ্ছা দেখব।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ ব্যস্তভাবে বললেন—দ্যাখ্ তো। দ্যাখ্ তো।

কী দেখতে হবে বুঝতে না পেরে সবাই ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-যে কলতলার ওদিকে কে কাঁদছে দ্যাখ্ তো। বোধ হয় কেউ প'ড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে।

তখন ছুটে গিয়ে দেখা গেল একটি ছেলে আছাড় খেয়ে প'ড়ে গিয়ে কাঁদছে।

তাকে উঠিয়ে শান্ত ক'রে পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে বলা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোদের চোখ-কান কেন যেন সজাগ থাকে না? চারিদিকে নজর না থাকলে কি হয়? সন্ধানী চোখ, সন্ধানী কান, সন্ধানী মন না থাকলে অনুসন্ধিৎসু সেবা হয় না, তা' না হ'লে ব্যক্তিত্বও বাড়ে না। কে কতখানি চেতন, কে কতখানি সজাগ, কে কতখানি সক্রিয় তাই দেখে বোঝা যায়, সে নাম-ধ্যান কতখানি করে। চৈতন্যের রাজ্যে যে যতখানি অগ্রসর হয়, তার জড়ত্ব ততখানি চ'লে যায়। নিজেদের নিরাপত্তার দিক দিয়েও এই হুঁশিয়ার চলন একান্ত প্রয়োজন। বিপদ-আপদ ঘাড়ের উপর এসে পড়লে তখন যে আমরা টের পাই, আগে যে তার সঙ্কেত পাই না, নিরাকরণী প্রস্তুতিও যে আমাদের থাকে না, নানাভাবে যে আমরা বিধ্বস্ত হই, তার কারণও ঐ চেতন-চলনের অভাব।

উমাদা (বাগচী)—আত্মরক্ষার বুদ্ধি তো সবারই আছে, তবু চেতন-চলনের অভাব হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি-অভিভূতি আমাদিগকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, তাই আমরা অসাড় হ'য়ে থাকি। নেহাৎ যখন সত্তা বিপন্ন হয়, তখন হুঁশ হয়, তার আগে খেয়াল থাকে না। বার-বার ঠেকি, তবু শিখি না। ফল কথা, শুধু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই মানুষের সত্তাসংরক্ষণে বড় বেশী একটা সহায়তা করতে পারে না, যদি ইষ্ট ও পারিপার্শ্বিককে রক্ষার প্রবৃত্তি তার প্রবল হ'য়ে না ওঠে। সব অবস্থায় ইষ্টের সত্তা, স্বার্থ ও ঈপ্‌সাকে যদি আমরা প্রাধান্য দিয়ে চলতে অভ্যস্ত হই, এবং তাঁরই প্রীতি ও প্রতিষ্ঠা-কামনায় পারিপার্শ্বিকের সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনায় যত্নবান হই, তখনই আমরা আত্মসংরক্ষণ আত্মসম্বর্দ্ধনায় যা'-যা' করণীয় তা' ঠিকভাবে করতে পারি। তার আগ পর্য্যন্ত প্রবৃত্তিই আমাদের ঘিরে থাকে, আমাদের চলার পথ আমাদের চোখের সামনে ঠিক-ঠিক ফুটে ওঠে না। আবার, ইষ্ট ও পরিবেশ সম্বন্ধে যার কোন কর্ম্মঠ দরদ ও দায়িত্ববোধ নেই, নিজের

সত্তা-পোষণী দরদ ও দায়িত্ববোধও তার তেমনি শিথিল হ'য়ে ওঠে। তার দরদ ও দায়িত্ববোধ যতটুকু থাকে, তার বেশীর ভাগ প্রযুক্ত হয় প্রবৃত্তি-পোষণে, প্রবৃত্তি-সংরক্ষণে। তাই তথাকথিত স্বার্থপর মানুষ যারা, তারা প্রতিনিয়তই নিজের স্বার্থকে বিঘ্নিত ক'রে চলে—স্বার্থপরিপূরিত হবে যা'তে তার মূলে কুঠারাঘাত ক'রে।

এ-কথা কখনই ভুলে যেও না যে ইষ্ট ও পরিবেশরক্ষণী প্রচেষ্টায় উদ্দাম হ'য়ে ওঠাই আত্মরক্ষণী অনুশীলন, ও বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য যা-ই করতে যাও তাই হবে অন্ধ, বধির। তোমার আত্মরক্ষণী বা সত্তাসংরক্ষণী বোধ, কৌশল ও প্রতিভার স্ফুরণই হবে না, যদি তা' যথাস্থানে নিয়োজিত না হয়।

প্রফুল্ল—আমাদের আয়-উপার্জ্জন সম্বন্ধেও কি ঐ কথা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর মুখ থেকে গড়গড়ার নলটি নামিয়ে প্রসন্ন বদনে বললেন—তা' বৈকি ? মানুষের আমিত্ববোধ যদি ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে পরিবেশে প্রসার লাভ না করে, তাহ'লে তার মগজ খোলে না, প্রচেষ্টাও স্তিমিত হ'য়ে থাকে। যার আমিত্ববোধ যতখানি ব্যাপ্তিলাভ করে—সুকেন্দ্রিক হ'য়ে,—তার বুদ্ধি ও প্রয়াসও হয় তত গভীর ও সুদূরপ্রসারী, কারণ, আমি বলতে সে যতকে বোঝে, ততর সুখ-সুবিধা বিধানে সে বাস্তবে উঠে-প'ড়ে লাগে। ঐ ধান্ধা তার পারগতা ও উপার্জ্জনকে বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু গোড়ায় যদি শ্রেয়-প্রীতি না থাকে, ঐ জীবন্ত-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিপূরণ-আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে তার ব্যক্তিত্ব সংহত ও সুগঠিত হ'য়ে ওঠে না। সে-অবস্থায় সে পরিবেশকে আপন করতে গিয়ে বা তাদের সেবা করতে গিয়ে তাদের প্রবৃত্তির খোরাক হ'য়ে ওঠে, স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে তাদিগকে বা নিজেকে বাড়িয়ে তুলতে পারে না, তার বুদ্ধি ও কর্ম্ম হয় এলো-মেলো, কাটা-কাটা, আবোল-তাবোল, তাই সে জমিয়ে তুলতে পারে না। আবার, নেহাৎ নিজের স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে শ্রেয়কে আশ্রয় করলেই যে হয়, তাও নয়, শ্রেয়ের প্রতি আসক্তি চাই। তখনই ঐ শ্রেয়ের প্রতিষ্ঠা ও পূরণের আগ্রহেই সে পরিবেশের প্রতি সেবা-মুখর হ'য়ে ওঠে। এমনি ক'রেই তার আমিত্ববোধ বিস্তার লাভ করতে থাকে। তখন সে আর অলস থাকে না। অকর্ম্মণ্য থাকে না। ভিতরের তাগিদেই সে উপচয়ী, কর্ম্মঠ হ'য়ে ওঠে। আর, এই করার মধ্য-দিয়ে পাওয়াও তার অঢেল হ'য়ে ওঠে। গোড়ায় সম্বেগ যদি না থাকতো, তাহ'লে কিন্তু তার মাথা অতোখানি খেলতো না, কর্ম্ম অতোখানি খুলতো না। ধর না, এই ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নীর মধ্য-দিয়েই যে কত লোকের কত কর্ম্মপ্রয়াস খুলে গেছে, তার কি লেখাজোখা আছে ? আমার কাছে কতজনে যে এসে গল্প করে ! তাদের

সে আত্মপ্রসাদমাখা কাহিনী শুনতে বড় ভাল লাগে। নিছক নিজের দিকে যে মুখ ক'রে আছে, তার দৃষ্টিটা সেখান থেকে ফেরাও।

নিজের পেটের চিন্তা বা অভাবের চিন্তা কাউকে কোনদিন বড়-মানুষ করে না। তা' তাকে কোনদিন খেতে-পরতেও দেয় না। তাকে শ্রেয়ের কথা, অপর দশজনের কথা ভাবতে দাও, তাদের জন্য কিছু করতে দাও, তাদিগকে দেওয়াও তাকে দিয়ে, আর তার বৈশিষ্ট্যমাফিক মানুষের উপযোগী যোগ্যতা-অনুশীলনী কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় যে কি মজা, কি আনন্দ, তা' তাকে বুঝতে দাও। উপচয়ী কর্ম্ম-মাতাল ক'রে তোল তাকে, সেই মত্ততায় পেটের কথা, পয়সার কথা ভুলে যাক সে, তখন দেখবে, বানের জলের মত খাওয়া আসবে, পয়সা আসবে তার ঘরে। যোগ্যতা যদি থাকে মানুষের, সুকেন্দ্রিক কর্ম্মঠ যদি হয় সে—তাকে রুখবে কে দুনিয়ায়? মানুষ উল্টোপথে চলে—পয়সার কথা, পেটের কথাই অযথা এত ক'রে ভাবে যে তা'তে তাদের সহজ কর্ম্মোৎসাহই নিভে যেতে থাকে, কাজই ঠিকমত করতে পারে না, স্ফূর্ত্তিও পায় না তা'তে। তাই তাদের দ্বারা কেউ লাভবান হয় না। অন্যে যদি তোমাকে দিয়ে লাভবান না হয়, তাহ'লে তুমি তার দ্বারা লাভবান হবে কি ক'রে?

প্রশ্ন—অন্যের দিকে যে নজর যেতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (জোরের সঙ্গে)—তার মানে তুমি বাঁচতে চাও মরার পথে চ'লে। তোমার আহরণের ক্ষেত্রই হ'লো তোমার পরিবেশ, তাকে শুকিয়ে রেখে তার রসে পুষ্ট হ'তে চাও সে কেমন কথা? এ কি ফাজলামি? পাওয়া-না-পাওয়ার প্রশ্ন-নিরপেক্ষ হ'য়ে তোমার স্বভাবই যদি না হয় তোমার শক্তি ও সামর্থ্য মতন মানুষের ভাল করা, তাহ'লে দিন-দিন তুমি নিজের ভাল করার ব্যাপারেও অসাড় হ'য়ে পড়বে, সে শক্তিও তোমার থাকবে না।

প্রশ্ন—সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেত থেকে গরুতে ধান খেয়ে যাচ্ছে, তুমি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছ, দেখলে তা', কিন্তু দেখেও গরুটা তাড়ালে না, ভাবলে, তাড়িয়ে আমার লাভ কি?—এই ভেবে নির্ব্বিবাদে ঐ পথ দিয়ে চ'লে গেলে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, বার-বারই হয়তো ঐ রকম দেখ, কিন্তু পরের ক্ষেত ব'লে ও-দিকে নজরই দাও না। এমনি করতে-করতে অমনতর শৈথিল্য হয়তো তোমার চরিত্রে এমন গেঁথে যাবে যে, পরে নিজের ক্ষেত থেকে যখন গরুতে ধান খেয়ে যাবে, তখন পাশ দিয়ে গেলেও তোমার চোখ এড়িয়ে যাবে তা'। তোমার সামনে একজন হয়তো একজনের উপর অন্যায় অত্যাচার করছে, জুলুম করছে।

তা' দেখেও তুমি কোন প্রতিবাদ করলে না, মঙ্গলপ্রসূ বাধার সৃষ্টি করলে না, ভাবলে, এতে আমার কী? এমনতর বহু ক্ষেত্রেই হয়তো নীরব থেকে গেলে। পরে তোমার নিজের উপরও যদি অমনতর অন্যায় জুলুম বা অত্যাচার হয়, তখন হয়তো তুমি দেখতে পাবে—অন্যায়কে নিরোধ করার ক্ষমতাই তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তাই, অন্যের ভাল করার সুযোগ যেখানে যখনই যতটুকু পাও, তোমার সাধ্য-মতন তার সদ্ব্যবহার করো—অবাঞ্ছিত অনধিকার-চর্চ্চা না ক'রে বা নিজের সত্তাকে অযথা বিপন্ন না ক'রে। এতে তোমার নিজের ভাল করার সামর্থ্যই অটুট থাকবে। একটা কথা আছে, ব'সে থাকার থেকে বেগার খাটা ভাল—কথাটা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। আলস্যে অভ্যাস নষ্ট হয়, যোগ্যতা নষ্ট হয়, সেইটেই মস্ত ক্ষতি, তাই বেগার খাটার মধ্য-দিয়েও যদি সদভ্যাস ও যোগ্যতা বজায় থাকে সে-ও যথেষ্ট লাভ। আবার, বেগার খাটায় স্বার্থনিবদ্ধ দৃষ্টি বাস্তবভাবে একটু প্রসারিত হয়, সেও কম কথা নয়। দৃষ্টির ঐ প্রসারণার ফলেই বোধ-বিবেচনা ও কর্ম্মশক্তি অনেকখানি সুস্থ থাকে, তাই পারার পথে, পাওয়ার পথে কপাট প'ড়ে যায় না। ঐ কথা মাথায় রেখেই বলেছি, 'অভাব যখন মারবে ছোঁ, যা' জোটে দিস্—পাবিই জো'। অভাবে মানুষ কেবল নিজের পাওয়ার কথাই ভাবে, ও যেন একটা দহ বিশেষ, ওই পাঁকের থেকে না উঠতে পারলে অভাব মোচন হয় না। অভাবের মধ্যেও নিজের সাধ্য-মতন কিছু দেওয়ার বুদ্ধি বা করার বুদ্ধি যদি সজাগ থাকে, তা'তে মানুষ সহজেই ঝেড়ে দাঁড়াতে পারে, নিজের অভাবের চিন্তায় নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফলভাবে আবর্ত্তন করতে হয় না তাকে বেশী দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগুনঢালা আবেগ নিয়ে কথাগুলি ব'লে চললেন—তীক্ষ্ণভাবে প্রত্যেকের অন্তরকে বিদ্ধ ক'রে। শীতে অসুবিধা হচ্ছে বুঝে বঙ্কিমদা (রায়) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের পা-দুখানি ঘসে দিতে লাগলেন। কলকাতার একটি দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে বললেন—বাবা, আমার তো ফিরে যাবার গাড়ী ভাড়া নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্ তো ভূষণ! একটা ব্যবস্থা করতে পারিস্ নাকি।

ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী) যেতে উদ্যত হয়েছেন।

এমন সময় আসামের একটি দাদা বললেন—আমার কাছে আছে, আমি দিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর আবার কম পড়বে না তো?

উক্ত দাদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে দে।.........ক'টাকা লাগবে বল।

কলকাতার দাদা—গোটা পাঁচেক টাকা হ'লে চলে।

আসামের দাদাটি পাঁচটি টাকা দিলেন।

টাকার ব্যবস্থা হ'চ্ছে দেখে ভূষণদা আর গেলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভূষণদার দিকে চেয়ে বললেন—ওর কাজ মিটে গেল ব'লে তুই নিশ্চিন্ত থাকিস্ না। সংগ্রহ করার যে-সম্বেগ নিয়ে তুই বেরুচ্ছিলি তেমনিভাবে বেরিয়ে প'ড়ে যোগাড় ক'রে নিয়ে আয়, কারও ঠেকা হ'লে দিবি, নিজে খরচ করিস্ না। যখন সংগ্রহ করবি ব'লে মনস্থ করেছিস্, তখন তা' করাই ভাল।—ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর ভূষণদার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মিত মুখখানি দেখে ভূষণদা উৎফুল্ল অন্তরে বেরিয়ে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর উঠে পিছন দিককার দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। দরজা দিয়ে ঢুকতে-ঢুকতেই শ্রীশ্রীঠাকুর মধুমাখা স্নেহল কণ্ঠে ডাকলেন—'বড়বৌ। ও বড়বৌ!'

শ্রীশ্রীবড়মা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন—'এই যে'। হাতে তাঁর একখানি আসন, শ্রীশ্রীবড়মা আসনখানি দাওয়ায় পেতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই আসনের উপর বসলেন।

সানুদি এসে দাঁড়ালেন কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সোহাগজড়িত কণ্ঠে বললেন—লক্ষ্মী সোনা! মাণিক সনু! ......তুমি এত সকালে নেয়ে ফেলিছ?

সানুদি—মা'র সঙ্গে চান করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়বৌ! আজ তোমার কী বরাদ্দ?

শ্রীশ্রীবড়মা—ডাল, চচ্চড়ি, ছানা দিয়ে কফি দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল, ভাজা আর ভাল দই ও মিষ্টি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাপার তো গুরুতর।......আচ্ছা, বড় খোকা কেমন আছে? ওকে আজ ক'দিন দেখি না।

শ্রীশ্রীবড়মা—ওর তো শরীর ভাল না, ইন্‌জেক্‌সন চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মণি কেমন আছে?

শ্রীশ্রীবড়মা—মণিরও তো মাঝে-মাঝে পেট খারাপ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ম্লানমুখে)—আমার সকলটির এক দশা। ওদিকে খেপুও অসুস্থ। আমি যেন সোয়াস্তি পাই না।

শ্রীশ্রীবড়মা—পাঁচটা থাকলে অসুখ-বিসুখ হয়ই। অসুখ-বিসুখ হ'লে চিকিৎসা ক'রে সুস্থ হয়ে ওঠে, ওর জন্য অতো ভাববার কী আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যখন বলো, মনে যেন খানিকটা বল হয়। কিন্তু দুশ্চিন্তা যখন পেয়ে বসে, কিছুতেই যেন ছাড়তে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাস্‌তে কাত হ'য়ে উত্তর দিকে মুখ ক'রে শুয়ে আছেন—শীতে কন্‌কনে হাওয়া দিচ্ছে—শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে একখানি মাত্র পাতলা কাঁথা, কাঁথাখানি নিয়ে নাকের নীচে পর্য্যন্ত হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য) ও কেষ্টদা পাশে ব'সে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—মানুষের চাল-চলন, বেশ-ভূষা, স্নানাহার, চলা-ফেরার রকম দেখে তার rhythm of life (জীবনের ছন্দ) অর্থাৎ mental flow-র (অন্তঃস্রোতের) rhyme (ছন্দ) বোঝা যায়।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ রইলেন।

কেষ্টদা মুখে-মুখে যুদ্ধের খবর বলতে লাগলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহ-সহকারে সেগুলি শুনলেন।

২রা পৌষ, বুধবার, ১৩৪৮ (ইং ১৭।১২।৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি, এখন রাত চারটে, প্রকৃতির মধ্যে একটা রহস্যময় স্তব্ধতা বিরাজ করছে, চারিদিকে আঁধার। সামনের বিরাট চরটা যেন কালোয় মুছে গেছে। কোনদিকে কোন সাড়া-শব্দ নেই, তাম্বুর টিন থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে ফোঁটা-ফোঁটা শিশির পড়ছে, তারও শব্দ টের পাওয়া যাচ্ছে। এত রাতেই উঠে এসেছেন বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), ঈষদাদা (বিশ্বাস), নরেনদা (চক্রবর্ত্তী), বিমলদা (মুখোপাধ্যায়) ও প্রফুল্ল। তারা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন—কখন শ্রীশ্রীঠাকুর উঠবেন। টান-টান হ'য়ে শুয়ে আছেন তিনি বিরাট তক্তপোষ-জোড়া বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে, প্যারীদা শরীরটা মৃদু-মৃদু ঝাঁকিয়ে দিচ্ছেন, যাতে তিনি আরামে ঘুমুতে পারেন। নিদ্রামগ্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ টের পাওয়া যাচ্ছে—তাঁর প্রতিটি নিঃশ্বাস যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে একটা গভীর প্রশান্তি। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা, তবু এখান থেকে দূরে স'রে গিয়ে কোন ঘরের মধ্যে বসতে ইচ্ছা করছে না কারও। এখানকার বাতাসে যে তাঁর অঙ্গের সুবাস, আবহাওয়ায় তাঁর মধুর স্পর্শ। খানিকটা বাদে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘুম ভাঙ্গলো। তখন সবাই প্রণাম করলেন তাঁকে। ঘুম থেকে উঠে কয়েকজনকে

বাইরে দাঁড়ান অবস্থায় দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—বীরেনদা! আপনারা কত সময় আইছেন?

বীরেনদা—একটু আগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে)—এই শীতে বাইরে দাঁড়ায়ে আছেন, ভিতরে আ'সে বসেননি ক্যান্। আর, প্রফুল্লটার যেমন সর্দ্দি'র ধাত, আর একটু পরে ফত-ফত সুরু ক'রে দেবেনে। ভিতরে আ'সে আরাম ক'রে বসেন। এইরকম হিম লাগান ভাল না।

বীরেনদা—আপনি ঘুমুচ্ছিলেন, তাই ভিতরে আসিনি। আর, তেমন ঠাণ্ডাও না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ঘুমুচ্ছিলাম, তা'তে কি হইছে? আর, ঠাণ্ডা না, বলেন কি? আমি তো একেবারে বেহাল হ'য়ে গিছি। এই শীত পাড়ি দেব কি ক'রে—তাই ভাবছি।

চলো প্যারীচরণ! পেচ্ছাপ ক'রে আসি—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর চটি পায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বীরেনদা চটিজোড়া পায়ের কাছে এগিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বের হবার সঙ্গে-সঙ্গে প্যারীদা গাড়ু-গামছা নিয়ে বের হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রস্রাব ক'রে জলের জন্য কোষ ক'রে হাত পাতলেন, প্যারীদা হাতে জল ঢেলে দিতে লাগলেন—এইভাবে সাতবার জল নিলেন। তারপর উঠে চোখমুখ ধুলেন, চোখমুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে হাতমুখ মুছলেন। গামছাটি যেমন ভাঁজ করা অবস্থায় ছিল, তেমনি ভাঁজ ক'রে প্যারীদার হাতে দিলেন। তারপর ঠিক যে পথ বেয়ে যেমন ক'রে প্রস্রাবের জায়গা থেকে রোজ তাম্বুতে আসেন, ঠিক সেই পথ বেয়ে তেমনি ক'রে ফিরে আসলেন।

এসে বিছানায় ব'সে কাঁথাখানি গায়ে জড়িয়ে গলাটা কাঁপিয়ে বলছেন—কি শীত! কি শীত! ও কালীষষ্ঠী, এই শীতে করি কি?

কালীষষ্ঠীমা (হাসতে-হাসতে)—কী আর করবেন। কাঁথা গায়ে দিয়ে ব'সে বাবাগো সঙ্গে গপ্প করেন। কথা ক'তি-ক'তি গা গরম হ'য় যাবিনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্ফূর্ত্তি সহকারে)—ঠিক কইছিস্। কালীষষ্ঠীর বুদ্ধি আছে।

যাক, এইবার একটু তামাক সাজ্ তো দেখি—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিপদদার (সাহা) দিকে চাইলেন। চেয়ে দেখেন—হরিপদদার তামাক সাজা হ'য়ে গেছে। তিনি কলকে নিয়ে আসছেন। তাই দেখে ফিক ক'রে হেসে বললেন—না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে সেই সে সেবক নাম। হরিপদকে ও-সব কওয়া লাগে না, ও নিজেই অনেকটা ঠিক পায় কখন কী দরকার। আর, এই শরীর

নিয়ে ও যা' করে সে একটা miracle (সিদ্ধাই), ঘণ্টার পর ঘন্টা হয়তো জলই তুলছে। নেশা আছে ব'লে পারে, নয়তো শরীরের কথা ভাবতে গেলে ওর flat (চিৎ) হ'য়ে প'ড়ে থাকা লাগে।

হরিপদদার মুখখানি আনন্দে উজ্জল হ'য়ে উঠলো। বিনীতভাবে বললেন—মন যা' চায় তা' তো পারি না।

রোখের সঙ্গে বললেন ঠাকুর—পারিস্ না কি শালা ? যা' পারতিছিস্ তা' কয়জনে পারে দেখা তো দেখি।—এই ব'লে ললিত ভঙ্গীতে মধুর কন্ঠে টেনে-টেনে বললেন—মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।

দেখতে-দেখতে আবহাওয়াটা যেন রসঘন আনন্দ-মধুর হ'য়ে উঠল। ওদিকে রাণীমা তখন তাঁর কলের পাড়ের ছোট্ট ঘরখানিতে ব'সে ভক্তিনম্রচিত্তে বিনতি পাঠ করছেন—প্রেমধারা বরখা কর খোল অমৃতখানা। ইতিমধ্যে শরৎদা (হালদার), সতীশদা (দাস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেনদা (হালদার), অমরদা (রায়), মানদামা (প্রফুল্লর মা), কালিদাসীমা, সরোজিনীমা প্রভৃতি এসেছেন। সবাই চুপচাপ ব'সে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও একটু আনমনা।

হঠাৎ অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে ডান হাতখানির মাঝখানের তিনটি আঙ্গুল উঁচু ক'রে বলছেন—দ্যাখ, তোমাদের আমি একটা ছোট্ট কথা বলি—আমার কাছ থেকে যখন যে-নির্দ্দেশ পাও, যে-অভিজ্ঞতার কথা শোন, তখনই যদি তা' সাধ্যমত অনুশীলন করতে লেগে যাও, অনায়াসে তোমাদের বহু সাধনা সহজ হ'য়ে যাবে। বেমালুমভাবে কালে-কালে যে এক-একজন কী হ'য়ে দাঁড়াবে, তা' তোমরা নিজেরা ঠিক পাবে না, কিন্তু ঠিক পাবে দুনিয়া। কিন্তু করার পথে যদি না চল, শুধু শুনলে কিছু হবে না। ওতে না-জেনেও জানার অহঙ্কার হ'তে পারে, যা চরিত্রকে আরো দুর্ব্বল ক'রে দেবে। ফলকথা, করার মধ্য-দিয়ে ছাড়া বোধও পরিপক্ক হয় না। শুনে-মিলে মামুলি বোধ যা', অসময়ে তা' কাজে লাগে না। তখন অভ্যস্ত বোধ, অভ্যস্ত বুলি, অভ্যস্ত চলনই আত্মপ্রকাশ করে। তোমরা কতকগুলি মানুষ যদি দাঁড়িয়ে যাও, তাহ'লে আমি সারা দেশ, এমন-কি দুনিয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। (স্ফূর্ত্তিযুক্তভাবে) যাবার আগে আমাকে একটু সুখ ক'রে যেতে দাও তোমরা, আমি দেখে যাই যে ভারতের ঘরে-ঘরে আবার নারায়ণ জন্মাচ্ছে, ভারতের তেত্রিশ কোটি লোক আবার দেবতা হ'য়ে উঠছে, আর সারা দুনিয়া তাদের দেখে শিক্ষা লাভ করছে, তাদের শ্রদ্ধা ক'রে বর্ত্তে যাচ্ছে।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় কিরণমা (ভুবনের মা) তাদের গাছের একটি কচি তকতকে লাউ নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দূর থেকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর লাউটি দেখে বালকের মত উল্লসিত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—বাঃ, বড় বাহারের মাল আনিছিস্ তো। যা যা, বড়বৌ'র কাছে দিয়ে আয় গিয়ে। বলবি আজকেই যেন বড়ি দিয়ে ঘণ্ট করে।

মা-টি হাসিখুশি হ'য়ে লাউ নিয়ে গেলেন বড়মার কাছে।

কিরণমা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে লাউ দিয়ে আবার ফিরে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকেই বড়ি দিয়ে ঘণ্ট করার কথা কইছিস্ তো ?

কিরণমা—হ্যাঁ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করা হ'লো—আপনি বলেছেন, পারিবারিক চাহিদার সমাবেশ ও সমাধান ক'রে ইষ্টার্থ-করণে প্রবৃত্ত হ'তে গেলে কোনটাই হয় না, কিন্তু সব-কিছু উপেক্ষা ক'রে ইষ্টার্থ-করণে নিযুক্ত হ'লে ধীরে-ধীরে সমাধান আসে। আগে পারিবারিক সমস্যার সমাধান ক'রে তারপর ইষ্টকাজ করা কি সম্ভব নয় ? যদি সম্ভব না হয় তবে আমরা যারা আগে পারিবারিক সমস্যার সমাধান ক'রে ইষ্টকাজ করতে চাচ্ছি—তাদের অবস্থা দাঁড়াবে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থকরণে জীবনের সবগুলি দিক with a meaning (একটা অর্থ নিয়ে) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, প্রয়োজনগুলিও সার্থকতা-মুখর হ'য়ে ওঠে, প্রবৃত্তিজনিত অবান্তর প্রয়োজন কমে যায়। আর, হাতে-কলমে ক'রে কৃতী হ'য়ে কৃতার্থতার উপঢৌকনে তাঁকে নন্দিত করার একটা আবেগ সৃষ্টি হয়, তার থেকে আসে inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা)। কাজের অন্ধি-সন্ধি, ফন্দিফিকির, পারম্পর্য্যক্রমে কোথায় কখন কী করতে হবে, কাকে কী বলতে হবে, কার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, অন্তরায়গুলিকে কেমন ক'রে বিন্যস্ত ক'রে profitable (লাভজনক) ক'রে তুলতে হবে, সাহায্য কোন্ ভাবে কোন্ source-এ (মাধ্যমে) পাওয়া যাবে, নিজের অভ্যাস-ব্যবহার, চাল-চলন কতখানি ঠিক করতে হবে—ইত্যাদি সব সম্বন্ধে তখন একটা সুসমন্বিত ধ্যানশীল কর্ম্মতৎপরতা গজিয়ে ওঠে, এর ভিতর-দিয়ে সবটার সমাধান নিয়ে একটা consolidated universe of experience (দানাবাঁধা অভিজ্ঞতার দুনিয়া) ফুটে ওঠে। তাতে থাকে একটা বিরাট wiseness (প্রজ্ঞা) সংহত হ'য়ে—মানুষ সুনিয়ন্ত্রিত হয়, সুন্দর হয়, দক্ষ হয়, সাশ্রয়ী হয়, অর্জ্জনপটু হয়, সর্ব্বকাজে সফলতা তাকে দাসীর মত অনুসরণ করে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' যারা সাংসারিক উন্নতি বা টাকা উপায়ের কথা বড় ক'রে

ভাবে, সেই দিক ঠিক ক'রে পরে ইষ্টের কাজ করতে চায়—there lies their folly (সেখানেই তাদের নির্বুদ্ধিতা)। যা' কখনও হবার নয়, তাই-ই হওয়াতে চায় তারা—তা' কি কখনও হয় ? ঠেকে-ঠেকে, ঠকে-ঠকে, ঠোক্কর খেয়ে-খেয়ে পথে আসা ছাড়া আর কোন উপায় নেই তাদের। ঐ ঠেকা, ঠকা ও ঠোকাই তাদের মস্ত শিক্ষক। ফলকথা, বৌ-ছেলেপেলের জন্য তাদের গুরু ধরা, অর্থাৎ তারাই তার গুরু, আর যাকে গুরু ব'লে ধরেছে, তিনি তাদের সেবার একটা উপকরণমাত্র, তবু মন্দের ভাল। বোকারা এইটুকু বোঝে না যে, নারায়ণকে খুশি করতে পারলে লক্ষ্মী আপনি এসে ধরা দেন, আর নারায়ণকে যে তোয়াক্কা করে না, সতী-স্ত্রী লক্ষ্মী কি তার কাছে এগোন ? তিনি তাকে এড়িয়েই চলেন, সে তাঁকে যতই তোয়াজ করুক না কেন। নারায়ণ মানে বৃদ্ধির পথ, মূর্ত্ত নারায়ণে যুক্ত হ'য়ে তাঁকেই মুখ্য ক'রে বাস্তবভাবে বৃদ্ধির পথে, বিস্তারের পথে চলতে হবে। তবেই নারায়ণপূজা সার্থক হবে, লক্ষ্মীও বরণডালা সাজিয়ে নিয়ে এসে ধরা দেবেন। এ বাদ দিয়ে উন্নতি যে হয় না, তার কারণ, মানুষ প্রবৃত্তিপন্থী হ'য়ে পড়লে তার কাছে টাকা হয় বড়, মানুষ হ'য়ে যায় ছোট, সে মানুষের সংশ্রব হারায়, মানুষকে করে ignore (উপেক্ষা), বৃদ্ধির পথে, বিস্তারের পথে না চ'লে ক্ষয় ও সঙ্কোচের পথেই চলে সে, এইভাবে whith a blind conflict (অন্ধ সংঘাতের পথে) ব্যর্থতার দিকেই এগিয়ে যায়। যেখানে পারিবারিক জীবনে সার্থকতা আসে—তারও মূলে হয়তো দেখবে—মা, বাবা বা গুরুর জন্য বৌ, ছেলে, টাকা-পয়সা সব। সেইজন্য জীবনের গোড়ায় আছে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, তারপর গার্হস্থ্য। ঈর্ষ্যা, আক্রোশ বা হীনত্ব বুদ্ধির থেকেও যে মানুষ কোথাও-কোথাও বড় না হয়, কৃতী না হয়, সেবাপ্রাণ না হয়, তাও নয়, কিন্তু ঐ করাটা বা হওয়াটা তার চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে না, আর কোন সার্থকতার কেন্দ্র না থাকায় তার জীবনও সার্থক হ'য়ে ওঠে না, আবার যে-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সে বড় হয়, তারই মধ্যে নিহিত থাকে তার বিনষ্টির বীজ। সে হয়তো তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে, মানুষকে আর মানুষ ব'লে মনে করে না, অত্যাচার, অবিচার বা অপমান করতে তার গায়ে বাধে না, এইভাবে হয়তো পারিপার্শ্বিককে উৎক্ষিপ্ত ক'রে তোলে, তারই প্রতিক্রিয়ায় আপনার জালে আপনি জড়িয়ে মরে। রাবণের কথাটাই একবার ভেবে দেখ না কেন ? তার মত শক্তিমান ও সম্পন্ন ক'জন ছিল ? শেষটা তার দশা কী হ'লো ? আর, ডাইনে-বাঁয়ে চেয়েও এমনতর দৃষ্টান্ত অনেক দেখতে পাবে। তাই বলি—সুখী হওয়ার, সার্থক হওয়ার এক ছাড়া দুই পথ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে মসগুল হ'য়ে কথা বলছেন। চকিতে তিনি গড়গড়ার নলটি ছেড়ে, চৌকী থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়ালেন। কী বৃত্তান্ত বুঝতে না পেরে সবাই এদিক-ওদিক চাইতে লাগলেন। মাতৃমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে চেয়ে তখন দেখা গেল যে শ্রীযুক্ত হেম চৌধুরী মহাশয় ঐ দিক দিয়ে এগিয়ে আসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনীতভাবে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, কী দাদা! এত সকালে কী মনে ক'রে? (অমর-ভাইয়ের (ঘোষ) দিকে চেয়ে বললেন) দাদার জন্য দৌড়ে গিয়ে একখানা চেয়ার নিয়ে আয়।

অমর ভাই চেয়ার আনতে ছুটলেন।

শ্রীযুক্ত হেম চৌধুরী মহাশয় বললেন—না, চেয়ারের দরকার নেই। তুমি ব'সো। আমি বড় ঠেকায় প'ড়ে আইছি। আমাকে ভাই তিরিশটে টাকা না দিলে তো নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁড়িয়ে রইলেন।

অমর ভাই চৌধুরীমহাশয়কে চেয়ার এনে দিলেন। চৌধুরীমহাশয় চেয়ারে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় বসলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুধাকে ডাক দেখি।

একজন তাড়াতাড়ি গিয়ে সুধামাকে ডেকে আনলেন। সুধামা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আবদারের সুরে বললেন—সুধা! লক্ষ্মী! তিরিশটে টাকা দিবি?

সুধামা হেসে বললেন—হ্যাঁ দেব, ক'টাকা বললেন, তিন টাকা?

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—তিন টাকা হ'লে কি আর তোকে ডাকি? তিরিশ টাকা। তুই যে আমার বড় ব্যাঙ্ক! বড় ব্যাঙ্কে কি মানুষ দুই-এক টাকার চেক কাটে?

সবাই হাসতে লাগলেন।

সুধামা—আমি জোগাড় ক'রে আনছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাও, তাড়াতাড়ি কাম সেরে ফেলগে।

চৌধুরীমহাশয়—তাহ'লে আমি বাড়ীর দিক যাই। তুমি জোগাড় হ'লে পাঠায়ে দিওনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্মিতমুখে)—তাহ'লে আসেন গিয়ে।

চৌধুরীমহাশয় চেয়ার ছেড়ে উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আবার উঠে দাঁড়ালেন। উনি যাবার পর বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্নেহসিক্ত কণ্ঠে)—দ্যাখ, জমিদারী বল, তেজারতি বল,

ব্যবসা-বাণিজ্যই বল, বামুনের ব্যবসায়ের মত ব্যবসা নেই—বামুন হ'লো লোক-ব্যবসায়ী। মানুষই তার মূলধন, মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই তার মুনাফা। মানুষকে যে সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারে, মানুষকে যে আপন ক'রে তুলতে পারে, মানুষকে যে যোগ্য ক'রে তুলতে পারে, তার কিন্তু কিছুরই অভাব থাকে না। ঋত্বিকের কাজ কিন্তু বামুনের কাজ। আদর্শনিষ্ঠ উপযুক্ত-সংখ্যক ঋত্বিক্ যদি থাকে, আর দেশের রক্তে যদি গোল না ঢুকে থাকে, তাহ'লে সে-দেশের কোন ভাবনা নেই। তাদের চরিত্র দিয়ে, চলন দিয়ে, জীবনচর্য্যা দিয়ে মানুষের মধ্যে আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠা ক'রে, তারা সব-কিছুই গজিয়ে তুলতে পারে।

প্রশ্ন—ঋত্বিক্‌রা যদি অনিয়ন্ত্রিত চলনে চলেন, এবং সঙ্গে-সঙ্গে যাজনও করেন, তা'তে কি অনেকখানি বিকৃতি সঞ্চারিত হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও অন্তর্নিহিত ক্লেদের স্পর্শ লাগলেও, যে-science (বিজ্ঞান), যে-বেদ তারা পরিবেষণ করছে, তা' কিন্তু অক্লেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য—তাই এটা মন্দের ভাল। তবে initiation (দীক্ষা) হয়, ঠাকুর বস্তুটা তা'তে থাকে, সেই সূত্র, সেই দড়ি বেয়ে মানুষ আদত জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারে। আর, মানুষ একদিনেই তো পুরোপুরি পরিশুদ্ধ হ'য়ে যায় না, আরোর ইতি নেই, ইচ্ছা থাকলেই মানুষ এগুতে পারে, ক'রে-ক'রেই এগোয়। তবে, ইষ্টের প্রতি আনুগত্য যদি না থাকে, ইষ্টকে বাদ দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার বুদ্ধিই যদি প্রবল হয়, আত্মসংশোধনের স্পৃহা বা প্রয়াস কিছুই যদি না থাকে, সে-যাজন একটু ভয়েরই কথা। তবে, তোমাদের এখানে অমনতর মানুষ টিকতে পারে না। কারও কিছু করা লাগে না, Nature (প্রকৃতি)-ই তাকে purge (বহিষ্কার) ক'রে দেয়। সেই গোড়ার আমল থেকেই তো দেখ্‌ছি। কী বলেন সুশীল-দা ?

সুশীল-দা (বসু)—হ্যাঁ! এ একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। আপনি তো কাউকে ফেলেন না, তাড়ান না, সকলকেই কাছে টেনে রাখতে চান। কিন্তু তারা নিজে থেকেই কেমন ছিট্‌কে পড়ে।

শৈলেন-দা—যুদ্ধের ফলে যে দারুণ দুর্দ্দিন আসবে, তা'তে মানুষ স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়ে একমুষ্টি ভাতের জন্য হয়তো পথে-পথে ঘুরে বেড়াবে, সেই অবস্থায়ও কি ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে ? কিংবা কেউ যদি কোথাও অবরুদ্ধ হয় সে কী করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন দেখিস্ ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ভাল ক'রে set করবে (মাথায়

ঢুকবে)। ঐ অবস্থায় ভোজ্য, ফল, ফুল, জল কিছু যদি না জোটে, একমুষ্টি বালুও তো নিবেদন করতে পারবে। ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী করার দরুন যার ভেতর যে energy (শক্তি) মজুত হয়েছে, বিপদের সময় তাই-ই তাদের ত্রাণ আনবে। (প্রফুল্লর দিকে তাকিয়ে)—James কি তো কইছে ?

প্রফুল্ল—He will stand like a tower when everything rocks around him and when his softer fellow-mortals are winnowed like chaff in the blast. (যখন সবকিছুর অস্তিত্ব টলায়মান হ'য়ে উঠবে, এবং শক্তিহীন নির্জ্জীব লোকগুলি ঝড়ের আগে তুষের মত উড়ে যাবে, তখন সে একটা স্তম্ভের মত নিজের শক্তিতে অটল হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ ! সত্যিই তাই। আর তা' তোমরা বাস্তবে দেখতে পাবে। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' এতটুকুও করেছে যারা, করে যারা, তারা মহাভয় থেকে ত্রাণ পাবে। কিছু-না'র মধ্য-দিয়ে তারা employment (কর্ম্মনিযুক্তি), activity (কাজ) create (সৃষ্টি) ক'রে নেবে, সবাই তখন বুক নিঙ্‌ড়িয়ে ইষ্টার্ঘ্য দেবে, সেই নিঙ্‌ড়ান বুক অমৃত সৃষ্টি করবে। সারাদিন পরে বুভুক্ষু পরিবার হয়তো চার আনা পয়সা পেল, তার থেকেই কিছু নিয়ে সবাই মিলে হাঁটু গেড়ে ব'সে যদি কয়—'ঠাকুর ! এই নাও তুমি, আজ যে আমাদের এই-ই সম্বল'। তখন সে tragedy (বিয়োগবিধুর দৃশ্য) এমন comedy (মিলনান্ত নাটক) সৃষ্টি করবে যে পারিপার্শ্বিক আপামর সাধারণের কাছে সেই স্থান একটা পুণ্য-তীর্থ হয়ে দাঁড়াবে, আর ঐ অকিঞ্চন তারাই সেই পুণ্য-তীর্থের জীবন্ত বিগ্রহ ব'লে পরিসেবিত হবে। বুদ্ধি তখন ফুড়ে বেরুবে, তারা পারবে অবস্থার উপর জয়ী হ'তে। তাই গীতায় আছে—'যোগক্ষেমং বহাম্যহং'।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ আবেগে জ্বলছে। উপস্থিত সবাই বিস্ফারিত নেত্রে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঐ দিব্য-বাণী শ্রবণ করছেন।

তার মধ্যে একজন প্রশ্ন করলেন—সমস্ত দেশের হাতে কামান, গোলা-বারুদ, বোমা, কত অস্ত্র ! আমাদের হাতে ঠাকুর কী অস্ত্র আছে ? আমরা আত্মরক্ষা করব কিভাবে ? আমাদের যে এখন তাদের চাইতে উন্নততর অস্ত্র দরকার। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী করলে তো বোমা শুনবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের মহা-অস্ত্র হ'লো ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠা, ঐ যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী। তোমরা যাজন-জৈত্র হ'য়ে উঠলে কী ক'রে ফেলতে পার তার কি ঠিক আছে ? (হঠাৎ বুক টান ক'রে ব'সে, দুটি বাহু বাড়িয়ে

আলিঙ্গনের ভঙ্গীতে)—জড়িয়ে ধ'রেই কত মানুষের মন কেড়ে নিতে পার, convince (কৃতপ্রত্যয়) ক'রে ফেলতে পার। যে মনের দরুন যুদ্ধ করছে, সে মন বদলিয়ে যুদ্ধ নিবারণ ক'রে জগতে শান্তি এনে দিতে পার। চণ্ডাশোক কিভাবে ধর্ম্মাশোকে পরিণত হ'ল জান তো? উপগুপ্তের এক গানের তানই তাকে উদ্ধার ক'রে দিল। আর যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী হ'ল মূল—এর থেকেই সব evolve করবে (গজিয়ে উঠবে)। বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ, ইষ্ট-নিবদ্ধ ব্যষ্টিব্যক্তিত্ব যদি সমষ্টি-ব্যক্তিত্বে এগিয়ে চলে—with untottering active mood (অনড় সক্রিয় চলনে), দেশ আপসে-আপ power (শক্তি), position (মর্য্যাদা) ও successful crown-এ (কৃতী রাজমুকুটে) সুশোভিত হ'য়ে উঠবে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নীর urge (আকূতি) ও habit (অভ্যাস) নিয়ে যদি চল—integrated with all your environment (সমগ্র পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে), তাহ'লে material equipment-এর (বস্তুতান্ত্রিক প্রস্তুতির) দিক দিয়েও সবাইকে supersede (অতিক্রম) করা তোমাদের কাছে একটা problem-ই (সমস্যাই) নয়। এখন যাজনে আগে গেঁথে তোল সব।

প্রচণ্ড প্রেরণার প্রবাহে সবার অন্তর যেন ফেটে পড়তে চাইছে। চুপচাপ ব'সে আছেন সবাই, কারও কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'চ্ছে না। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ শৈলমার দিকে চেয়ে ফিক ক'রে হেসে চপল ভঙ্গীতে বললেন—কিরে, তুই এখানে! আমি তো দেখতেই পাইনি। আজ কিন্তু নিস্তারিণীকে হারিয়ে দেওয়া চাই।

শৈলমা (বীরের ভঙ্গীতে)—ও আমার সঙ্গে পারে? আমি তো ইচ্ছে ক'রেই ওকে জিতিয়ে দিই।

সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলছে, প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ উঠছে—আর শ্রীশ্রীঠাকুর বিভোর হ'য়ে আলাপ-আলোচনা ক'রে চলেছেন। কথা বলছেন, আর কথার মধ্য-দিয়ে প্রতি প্রাণে যেন প্রাণ ঢেলে দিয়ে যাচ্ছেন। চোখের দৃষ্টি, মুখের ভঙ্গী, কণ্ঠের মাধুর্য্য, অঙ্গের হিল্লোল, অঙ্গুলি-সঞ্চালন—সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে এক আনন্দঘন রসলোকের অমৃতস্পর্শ প্রকট হ'য়ে উঠছে। পূব আকাশে সূর্য্য জেগে উঠেছে, তার সোনালী কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে মায়ের কুটিরের পাশে ছাতিম-গাছের মাথায়। ছাতিমগাছের তলায় একজন গাই দুইছেন—মৃদুমধুর কলকল ধ্বনি আসছে তার। গরুর বাট যখন টনটন করে, তখন তাকে দুইলেই তার

সুখ। নিখিল-প্রজ্ঞানময় পুরুষ যিনি, তিনিও দুনিয়াকে তেমনি তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দিতে পারলেই সুখী। জিজ্ঞাসু প্রেমী ভক্তের আগ্রহ এই উন্মোচনাকে তরঙ্গায়িত ক'রে তোলে, তাইতো তখন তাঁর কথা লহরের পর লহর তুলে বাঁধহারা হ'য়ে প্লাবনের মত ভেঙ্গে পড়ে, যে শোনে সেই মজে, যে আসে সেই মাতে—অবশ্য যদি তার একটুকু উন্মুখতা থাকে। সেই অপরূপ অমৃত প্লাবনের গোমুখী-উৎসের মুখোমুখী হ'য়ে ব'সে আছেন সবাই, প্রবল ঝরণাধারায় বেরিয়ে আসছে সুধালহরী—তাই অন্তর-বাহির মগ্ন-মসগুল সবার।

কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—ইষ্টের কাজের জন্য বেঁচে থাকতে হবে, এটা খুবই স্বীকার্য্য, কিন্তু মরণ যদি কোথাও ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে সহায়ক এবং অনিবার্য্য প্রয়োজন হয়, এবং তখনও যদি কেউ 'বাঁচতে হবেই' এই ধুয়ো ধ'রে প্রাণ না দেয়, সেটা কি কাপুরুষতা নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মরণটা যদি জীবনবৃদ্ধি বা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয়—তখন অন্য কথা। তাই গীতায় আছে, 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্'। নচেৎ, অযথা জীবন দেওয়ায় তো কোন লাভ নেই। অবশ্য ইষ্টের কাজ করতে হবে তোমাকে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে, ঝুঁকি নিয়ে। প্রতিমুহূর্ত্তে নিজের গা বাঁচাবার দিকে লক্ষ্য প্রবল হ'লে তখন আর কোন কাজ করতে পারবে না। তাই ব'লে খামাকা বিপদ ডেকে আনবে যে তাও নয়। বেপরোয়া ইষ্টীচলনের সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে আবার একটা সুব্যবস্থ সুসঙ্গত গতি। অমনতর চলন যার, তার বুদ্ধি থাকে ইষ্টের কাজ হাসিল করা, তার সেই পথে অন্তরায় যেগুলি সেগুলিকে সে কৌশলেই এড়িয়ে বা নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলতে পারে।

(একটু মোড় কেটে ব'সে মিষ্টি হেসে ডান হাতটি নেড়ে)—হনুমানের মত অমন ধুরন্ধর আর দেখা যায় না। হনুমান তো গেছে লঙ্কায়। ওকে তো বেঁধে ফেলেছে। ওকে চড়ায়, কিলোয়, মারে ; ও তো ঘাপটী মেরে প'ড়ে আছে। মার খাচ্ছে, তার জন্য দুঃখু নেই, দুঃখু এই—আমি যে বাঁধা প'লাম, মা জানকীর উদ্ধারের কী হবে ? ঐ কথা ভাবে আর মাথায় ফন্দী আঁটে—কী করা যায় ? শেষটা একটা বুদ্ধি বার করলো। বললো—আমি তো গিছি, আমাকে তো মেরেই ফেলতে চাও তোমরা, আর আমার মরাই উচিত। আমাকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলার বুদ্ধি কই তোমাদের। আমার লেজে খুব ক'রে কাপড় জড়াও, যত বেশী কাপড় জড়াতে পার, সেই-ই ভাল। কাপড় জড়িয়ে সেই কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দাও। আগুনে পুড়ে মরাই আমার উপযুক্ত শাস্তি। তখন তো রাক্ষসরা কাপড় এনে স্তূপাকার ক'রে ফেললো। লেজের সঙ্গে পর-

পর জড়িয়ে ফেললো কাপড়গুলি. পরে ওর কথামত আগুন ধরিয়ে দিল। ও তখন মরার মত পড়ে আছে, যেন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। আগুন যেই দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো, ওরা স'রে দাঁড়াল, সেই ফাঁকে সে ধম্ ক'রে উঠে পড়লো। উঠে এই লাফ তো সেই লাফ। একবার এই ঘরে গিয়ে পড়ে, পরমুহূর্ত্তে ওই ঘরে গিয়ে পড়ে, এইভাবে সারা লঙ্কা দগ্ধ ক'রে দিয়ে ছাড়লো। এদিকে বেকুবরা তখন হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে রইলো। তখন আর করবে কী? তাদের হাতে তো করবার কিছু নেই, ব'সে ব'সে আপসোস করে।

হনুমান লঙ্কা দগ্ধ ক'রে সমুদ্রে পড়ে লেজের আগুন নিভিয়ে মা জানকীর কাছে গিয়ে হাজির হ'লো। তখন সে মহাখুশি, মা'র কাছে দাঁড়িয়ে আনন্দে লেজ নাড়ছে। মা বললেন, তোমার মুখে কী হ'লো? তার যে মুখ পুড়ে গেছে, সেদিক তার খেয়ালই নেই। বিনীতভাবে বললো, 'ও কিছু না'। এমনই হয়। ইষ্টের প্রতি ভালবাসা যার থাকে, সে ইষ্টকাজ করতে গিয়ে বিপদে পড়লেও, বিপদকে কেমন ক'রে সম্পদে পরিণত করতে হয়, তা' সে জানে। সে ফেঁসে যায় না সহজে। আবার, ঐ কাজের পথে কষ্ট বা বিপদ-আপদ যতই থাক্ না কেন, তা' তাকে দমিয়ে দিতে পারে না। কষ্টের দিকে তার ভ্রূক্ষেপই থাকে না, বা ঐ কথা কারও কাছে ব'লে বাহাদুরী নেবার আকাঙ্ক্ষাও বড় একটা দেখা যায় না। প্রিয়তমের খুশিতেই তার খুশি, আর তাঁকে খুশি করবার কর্ম্মমাতাল নেশাতেই তার শরীর-মন-মাথা চাঙ্গা হ'য়ে থাকে।

প্রফুল্ল—হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করলো, আবার শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধে কত লোককে হত্যা করলেন। কিন্তু অহিংসা তো পরম ধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহিংসা পরম ধর্ম্ম, হিংসা তো পরম ধর্ম্ম নয়। হিংসাকে অটুট অক্ষত রাখলে তো অহিংসার প্রতিষ্ঠা হয় না। অহিংসার প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসাকে সরাসরিভাবে হিংসা করতে হবে, সুস্থতা আনতে গেলে অসুস্থতাকে বধ করতে হবে, সক্রিয়তা জাগাতে গেলে নিষ্ক্রিয়তাকে মারতে হবে। আমি তো এইরকম বুঝি। তবে এটা করতে হবে মঙ্গলবুদ্ধি-প্রণোদিত হ'য়ে। তাই পাপীকে ঘৃণা বা হিংসা না ক'রে, পাপকে ঘৃণা বা হিংসা ক'রে, পাপীকে পাপমুক্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। তাই বলছিলাম, হিংসকের হিংসার প্রতি যদি আমরা অহিংস হই, তবে সেইটেই হবে অহিংসাবিরোধী, অর্থাৎ হিংসাপোষণী আচরণ।

সুশীলদা—তাহ'লে Resist no evil (অসৎকে প্রতিরোধ করো না)—মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, sentence (বাক্য)-টার মধ্যে punctuation (বিরামচিহ্নপ্রকরণ)-এ ভুল আছে। জেম্‌স্‌ যেমন বলেছেন—Resist, no evil. সেই কথাটাই ঠিক, অর্থাৎ নিরোধ কর, অসতের অস্তিত্ব থাকবে না। অসৎকে যদি নিরোধ না করি, তাহ'লে অস্তিত্বধর্ম্মী আমরা যে অনস্তিত্বে বিলীন হ'য়ে যাব। যীশুখ্রীষ্ট, যিনি কিনা মানব-সত্তার উদ্ধাতা, তিনি অমনতর বলতে চেয়েছেন ব'লে আমার কিন্তু মনে হয় না। আর, তাঁর নিজের জীবনের আচরণ দেখেও তা' বোঝা যায় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি তো বরাবরই তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেই যে মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, মন্দিরের প্রাঙ্গণে ব্যবসাদাররা দোকান-পাট মেলে মেলা বসিয়ে ফেলেছে, সেখানে তিনি কেমন রুখে দাঁড়িয়ে সবাইকে ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দিলেন ? এইটে কি resist (নিরোধ) না করার দৃষ্টান্ত ? তবে মহাপুরুষদের জীবনে একটা ব্যাপার এই দেখা যায় যে, তাঁরা পোকাটি-মাকড়টি পর্য্যন্ত বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু নিজেদের কথা তাঁরা মোটেই ভাবেন না। অমনভাবে ভাবতে অভ্যস্ত নন্‌ তাঁরা, সকলের জন্য ভেবে সকলের জন্য ব্যবস্থা ক'রেই তাঁরা সুখ পান, তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুখ-স্বস্তি-বিধানের দায়িত্ব তাই তাঁদের ভালবাসে যারা, তাদের উপর। তারা যদি তাঁদের আগলে না রাখে তবে তাঁদের অস্তিত্ব যে-কোন মুহূর্ত্তেই বিপন্ন হ'তে পারে। সবার রক্ষায় অমোঘবীর্য্য তাঁরা, কিন্তু আত্মরক্ষায় নিষ্ক্রিয়। তাঁরা ভালবাসার কাঙ্গাল, ভালবেসে কেউ তাঁদের জন্য কিছু করেছে দেখলেই মহাখুশি। নিজের সম্বন্ধে এতই উদাসীন তাঁরা যে কোন-কিছুকে নিজের পক্ষে ক্ষতিকর জেনেও তাঁরা হয়তো অবাধে বলবেন—হ্যাঁ ! এইটেই হ'তে দাও, বাধা দিও না, কারণ, সেইটি হ'তে দিলে হয়তো ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ ইচ্ছাপূরণ বা বিশেষ স্বার্থ-সিদ্ধির সুবিধা হবে। তাঁদের কাছে তো সর্ব্বদা—"Thy necessity is greater than mine." (তোমার প্রয়োজন আমার থেকে বড়), তাই আর চাই কি ? তোমার প্রয়োজন পূরণ হ'লেই হ'লো, সে আমার জীবনের বিনিময়েও যদি হয়, তাও ক্ষতি কী ? মানুষের জন্য, শুধু মানুষের জন্য কেন, সামান্যতম প্রাণীর জন্য পর্য্যন্তও তাঁরা ততখানি করতে পারেন—এমনই বেহিসেবী, বেপরোয়া, আত্মভোলা তাঁরা। কিন্তু তাঁদের সেই 'হ'তে দাও, বাধা দিও না' কথায় সায় দিয়ে আমরা যদি হাত গুটিয়ে ব'সে থাকি, তাঁদের আদেশ-পালনের দোহাই দিয়ে তাঁদের জীবনরক্ষায় যত্নবান না হই, তবে সেইটেই হবে গুরু-আনুগত্যের নামে পরম ভণ্ডামী। অমনতর ক্ষেত্রে তাঁদের আদেশ অমান্য ক'রেও তাঁদের যদি বাঁচাই—সেই হবে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা। তাঁরা ক্রোধ দেখালেও শেষ পর্য্যন্ত খুশিই হবেন

তা'তে। তাই বাইবেলের "Resist no evil" (অসৎকে নিরোধ করো না)—একথা যীশুখ্রীষ্ট, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর উপর যে অন্যায়-উৎপাত আসছিল, সেই প্রসঙ্গে বলেছেন কিনা, সেটাও আমার মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়। তাঁর নিজের উপর অন্যায় হ'লে, সেই অন্যায়ের সম্পর্কে তাঁর মুখ দিয়ে এ-কথাটা বেরোন কিছু বিচিত্র নয়। ল্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে সেইটেই হয়তো অন্যভাবে চালিয়ে দিয়েছে।

তা'ছাড়া সব evil (অন্যায়)-কে সব সময়ে সরাসরি resist (প্রতিরোধ) করাও যায় না, অসতের শক্তি যেখানে প্রবল, বিপুল ও পরাক্রমশালী, সুকৌশলে শক্তিসংহত না ক'রে যদি সেখানে বেকুবের মত বিনা প্রস্তুতিতে হঠাৎ ঘা দিতে যাও, তবে তুমি তো নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবেই, তা'ছাড়া তোমার উদ্দেশ্যও সফল হবে না।

অবাঞ্ছিত, প্রতিকূল কিছু ঘটলে মানুষ তাকেও অনেক সময় evil (দুর্দ্দৈব) বলে, সেখানে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে হাত-পা ছুঁড়ে তো লাভ নেই। যেটা এসে পড়েছে, তাকে শুভে সুনিয়ন্ত্রিত করা লাগবে এবং যে-কারণে তার আবির্ভাব হয়েছে, তার নিরসনে সচেষ্ট হ'তে হবে, যা'তে অমনটি ভবিষ্যতে আর না ঘটে। অবস্থার তলে পড়ে দিশেহারা হ'য়ে আবোল-তাবোল পায়তারা ভাজলে হবে না, আস্ফালনেও কাম দেবে না, স্থিরমস্তিষ্কে সেটাকে আয়ত্তে এনে কল্যাণপ্রসূ ক'রে তুলতে হবে। তাই আমিও বলেছি, Manage the evil for good (খারাপ অবস্থাকে শুভপ্রসূ ক'রে পরিচালিত ক'রো)। আমার ঐ কথা দেখে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে যদি কেউ বলে—ঠাকুর অসৎকে নিরোধ করতে বলেননি, তাহ'লে সেটা কি ঠিক হবে? তাই প্রথমে নির্ণয় করতে হবে—যীশুখ্রীষ্ট কখন, কোন্ অবস্থায়, কী উদ্দেশ্যে, কোন্ কথা বলেছেন। বাস্তবতা-ভ্রষ্ট হ'য়ে তথাকথিত দার্শনিকতা হিসাবে যীশুখ্রীষ্ট কিছুই বলেননি, সে-ভাবে বুঝতে গেলে আমরাও ঠকে যাব!

একদল নামকা-ওয়াস্তে ভক্ত আছে, যাদের কাছে কর্ম্মহীনতার কথা বড়ই প্রিয়। তার সমর্থনে কোন কথা পেলে তারা ফলাও ক'রে ধরে। আমাদের কালীষষ্ঠী কয় (হাসতে-হাসতে)—

'শুধুই মুখের হাই
তোমার জন্য পরাণ কাঁদে,
দেবার কিছুই নাই।'

ঐ ধরণের ভক্ত যারা তাদের কাছেই 'Resist no evil'—'অসৎকে নিরোধ ক'রো না'—এই অর্থে ভাল লাগে। ভাবে—কাম কি অতো তাফাল দিয়ে!

সরোজিনীমা বললেন—এইবার উঠবেন না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিমুখে)—তুই এক বেরসিক। নেশা ক'রে খোয়াড়ি না ভেঙ্গে উঠলিই হ'লো ? তুই বরং তামাক খাওয়া।

সরোজিনীমা তামাক সাজতে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললেন—দেখেন, ও যে আমাকে ওঠার জন্য তাগাদা দিচ্ছে, সে কিন্তু ওর নিজের গরজে। হাগায়ে-মোতায়ে থুয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী যাবে। কিন্তু বাইরে হয়তো বলবে—সময়মত না হাগলে ঠাকুরের শরীর খারাপ করবে, তাই বলছি।

তাঁর প্রীতি-মধুর কটাক্ষ শুনে সবাই মৃদু-মৃদু হাসছেন। সরোজিনীমা-ও কোলকেয় ফুঁ দিতে-দিতে মুখ টিপে-টিপে হাসছেন। আবদারের সুরে বললেন—সবসময় তাই বুঝি, আজ আমি একটু ব্যস্ত থাকলেও অনেক সময়ে আপনার স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই বলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মাথাটা ঝাঁকিয়ে)—ব্যস্ততায়ই বল বেশী।

সরোজিনীমা হার মেনে বললেন—আচ্ছা তাই। আপনি এখন তামাকটা খেয়ে দয়া ক'রে ওঠেন।

তপোবনের কাজ-কর্ম্ম সম্পর্কে মাঝে-মাঝে বিমলদা ও ক্ষিতীশদার (সান্যাল) মধ্যে বচসা হয়—সেই কথা উঠলো। বিমলদা ও ক্ষিতীশদা উভয়েই উপস্থিত। কথাটার অবতারণা করা হ'লো বেশ একটু মেঘলা মন নিয়ে অনুযোগের সুরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মুখে হাসি টেনে বিক্ষোভের আবহাওয়াটাকে হাল্কা ক'রে দিয়ে, উভয়ের দিকে চেয়ে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগলেন,—দ্যাখেন, সমুদ্র-মন্থনের মত প্রণয়-মন্থনেও সুধা ও বিষ দুই-ই ওঠে। বিষটাকে হজম করতে না পারলে সুধাটাকে উপভোগ করা যায় না। কথায় আছে—'এক ঘরে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি হয় না, দুটো কথাও কি তোমার প্রাণে সয় না ?'—তাই বন্ধুত্ব যেখানে আছে সেখানে মানিয়ে নেয়। ঝগড়া-ঝাটি ক'রে চুপচাপ ক'রে থাকলে—না মিশলে gulf of difference (বিচ্ছেদের ব্যবধান) ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, কিন্তু একজন যদি হেসে কথা কয়, সহজেই মেঘ কেটে যায়, নচেৎ ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে হয়তো জনমের মত বিচ্ছেদ এসে যায়। অবশ্য আপনাদের এখানে অন্য কথা। আপনাদের উভয়ের একই স্বার্থ। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তো আপনারা ঝগড়া করেন না। আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য হ'লো—তপোবনটাকে কেমন ক'রে গ'ড়ে তোলা যায়। এর মধ্যে নিজেদের যে টেক না আছে তা'ও

নয়। বিমলদা ভাবে, 'আমি তপোবনের একজন পুরাণ মাষ্টার, ঠাকুরের কাছে শুনিছি, মিলিয়ে হাতে-কলমে করিছি, আমি জানি না?' ক্ষিতীশদা ভাবে—'আমি চুল পাকিয়ে ফেললাম, আমি কি বুঝি না কোন্‌টা কিভাবে করতে হবে? আর বিমলদা ঠাকুরের দোহাই দেয়, আমিও কি ঠাকুরের কথা জানি না?' অহং-এ অহং লেগে গেছে। ও কিছু না। আপনাদের উভয়েরই যদি আমার কাজ করবার সত্যিকার আগ্রহ ও ইচ্ছা থাকে, তাহ'লে দেখবেন, লাঠালঠি করতে-করতে কোন্ সময় নিজেদের অজ্ঞাতে মিলে গেছেন, তখন হয়তো বিমলদা বাড়ীতে খেয়ে এসে আঁচাবে ক্ষিতীশদার বাড়ীতে, আর ক্ষিতীশদা দাঁতন করতে-করতে যেয়ে মুখ ধোবে বিমলদার বাড়ীতে। ফলকথা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য যেখানে এক, সেখানে মতান্তরে মনান্তর হয় না, হ'লেও সাময়িক ও উপরসা, তা' আবার মিলনাগ্রহকেই নিবিড় ক'রে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার উঠে নিভৃত-নিবাসে পায়খানায় গেলেন।

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় এসে বসলেন।

প্যারীদা একটা ওষুধ দিয়ে গেলেন। ওষুধটা খেলেন।

একে-একে অনেকেই এসে প্রণাম ক'রে যেতে লাগলেন। সস্মিতা (৪ বৎসরের মেয়ে) সেজেগুজে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছে সুষমা-মার সঙ্গে। শ্রীশ্রীঠাকুর মহাখুশি। বলছেন—বা! বা! কী সুন্দর! কী সুন্দর!

সস্মিতার মুখখানি আনন্দে ডগমগ হ'য়ে উঠলো।

ফিলানথ্রপী অফিস-সংক্রান্ত কয়েকটা ব্যাপার-সম্বন্ধে কী করণীয় বঙ্কিমদা (রায়), শরৎদা (সেন), ভবানীদা (সাহা) এসে জেনে গেলেন।

অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন, তাঁর সঙ্গে কিছু সময় জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা চললো। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গ্রহগুলি আমাদের complex (বৃত্তি)-কেই represent (সূচিত) করে। বিশেষ কোন মানুষ বিশেষ কোন complex-এর (বৃত্তির) আওতায় প'ড়ে কিভাবে চলবে, তার বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা ও কর্ম্ম তখন কেমন ধাঁজ নেবে, তা' predict করা (আগে থাকতে বলা) যায়। কিন্তু মানুষ যদি সর্ব্বতোভাবে ইষ্টকেন্দ্রিক হয়, তখন কিন্তু সে আর প্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হয় না, বরং সব প্রবৃত্তিকেই সে পরিচালনা করে ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠার উপযোগী ক'রে। এমনি ক'রেই মানুষের গ্রহদোষ খণ্ডন হয়। এ-ছাড়া অন্য পথ নেই। তাই বলে, 'কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ'। বৃহস্পতি মানে সদ্‌গুরু, জীবনের কেন্দ্রদেশে বসান চাই তাঁকে, তাঁর ভজনায় তাঁকেই নিজের ভাগ্যবিধাতা ক'রে তোলা চাই, নইলে কিন্তু

শুধুই দীক্ষা নিলে হবে না। তবে দীক্ষা নিয়ে যারা যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ঠিকমত করে, তারাও কিন্তু অনেকখানি বেঁচে যায়। সর্ব্ব-ব্যাপারে ইষ্টকে যারা মুখ্য ক'রে চলে, তাদের তো কথাই নেই। খারাপ কিছু আসলেও তারা তাকে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার মহড়ায় ফেলে ভালর দিকে বাগিয়ে নেয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর কয়েকটা ছড়া বললেন। প্রফুল্ল সেগুলি টুকে নিল্লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদা (রায়), বীরেনদা (মিত্র), চুনিদা (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), হরিদা (গোস্বামী) প্রভৃতিকে ডেকে বললেন—শোন্ তো দেখি ঠিক হইছে নাকি।

প্রফুল্ল পড়লেন—ওরা শুনে একবাক্যে বললেন, অতি চমৎকার হয়েছে। এত কঠিন জিনিস যে এত সহজ ও সুন্দর ক'রে এত অল্প কথাতে এমনভাবে দেওয়া যায়, তা' না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা দিলে হয়, আমি বুদ্ধি ক'রে বা চেষ্টা ক'রে কিছু বলতে পারি না। মানুষ যে বলে, 'তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র', সেটা আমার মত ক'রে কেউ বোধ হয় বোঝে না। তোদের বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, আমি আকাট মুখ্যু, আমার নেই বলতে কিছুই নেই। তাঁর হাত-ধরা হ'য়ে থাকি। তিনি যখন যা' যোগান, তেমনি বলি, তেমনি চলি। এ ছাড়া আমার উপায়ও নেই।

তাঁর কথা শুনে সবার চোখ ছল-ছল করতে লাগলো, মুখে কেউ কোন কথা বললেন না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে একবার পূজনীয় খেপুদার বাড়ীর ভিতর গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কালিদাসীমা, লীলামা (মিলনের মা), প্রভৃতি গেলেন গাড়ু-গামছা, সুপারির কৌটা, তামাক, জল, দাঁতখোটা ইত্যাদি নিয়ে।

খেপুদার বাড়ীর মধ্যে রাজমিস্ত্রীরা কাজ করছে, ঘুরে-ঘুরে সেই কাজ দেখতে লাগলেন। চেয়ার দেওয়া হ'লো, তা'তে প্রথমটা বসলেন না। ড্রেনের একটা জায়গা দেখে বললেন, 'ও নবাব! এখানটা আর-একটু ঢালু ক'রে না দিলি তো জল দাঁড়াবে, মশা-মাছি হবে। এখানটা ঠিক ক'রে দিও'।

নবাব (বিনীতভাবে)—'জে! ঠিক কইছেন ঠাকুর! আমার আগে নজর পড়েনি। ঠাকুর! একটা জিনিস আমি তাজ্জব বুনে যাই, আমরা তো এই ক'রেই খাই, বরাবর দেখি—আমাদের কারউ চোখি যে-খুঁত ধরা পড়ে না, তা' কিন্তু আপনার চোখ এড়ায় না।'

শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহ দিয়ে বললেন—তুইও চোখেল আমার থেকে কম না। তোর মত মিস্ত্রী গাঁওঘরে কমই আছে।

নবাব বললো—সে আল্লার দয়া আর আপনার আশীর্ব্বাদ।

তোতা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে, জ্যাঠামশায়কে বাড়ীর মধ্যে দেখে খুব আনন্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সোহাগ ক'রে বললেন—বুতবু! বুতবু! তুতুন! তুতুন!

তোতা কী খুশি!

৩রা পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৮ (ইং ১৮।১২।৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাসুতে ব'সে আছেন। আজ সবার আসতে একটু দেরী হয়েছে। তবে শীতের দিন ব'লে আশ্রম-প্রাঙ্গণে এত সকালে এখনও লোকজন তেমন দেখা যাচ্ছে না। কয়েকটা গরু, কুকুর ও ছাগল নিশ্চিন্ত মনে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়রাগুলি মাতৃমন্দিরের শীর্ষদেশে 'বক্-বকম্ বক্-বকম্' করছে। সোনাল গাছটার পাতাগুলি বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হ'চ্ছে। পূর্ব্বদিকের বাঁশবনে কিছু গ্রাম্য পাখী কিচির-মিচির করছে। চরে এক-আধজন লোক দেখা যাচ্ছে যারা শৌচাদির জন্য গেছে। কেউ-কেউ ঘরে ব'সে বিনতি-প্রার্থনাদি করছেন। তাদের সেই ভক্তি-বিগলিত বিনতির সুর ভেসে আসছে—শীতল প্রভাত-সমীরকে আশ্রয় ক'রে। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশান্ত বয়ানে ব'সে আছেন পদ্মাপারের ছোট্ট টিনের তাসুতে, দেখে মনে হয়, ব'সে আছেন ভক্তগণের প্রতীক্ষায়! 'তোরা খোঁজ করিস ব'লে আমি খোঁজ করি, আমি খোঁজ করি ব'লে তোরা খোঁজ করিস্।'

ক্ষিতীশদা (সান্যাল) ও তপোবনের শিক্ষকবৃন্দ আসলেন। তাঁরা প্রণাম ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকীর সামনে মাটিতে ব'সে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে পেয়ে খুব খুশি। হাসিখুশি হ'য়ে কথা বলছেন। হঠাৎ বললেন—আচ্ছা ক্ষিতীশদা! এই শীতের রাতে আউস চাল ও কলায়ের ডালের খিচুড়ী আপনার কেমন লাগে?

ক্ষিতীশদা—বেশ লাগে।······আপনার কেমন লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আর কবেন না। শালা মনে হলিই জিবে জল আসে। পালিই দোয়ারে বসান দিয়ে দিই।

শুনে সবাই হাসতে লাগলেন।

কালিদাসীমা—খান তো কতটুকু তা' তো দেখেছি, পাখীর আহার বললেও চলে। মুখে বলেন বটে, কিন্তু খেতে তো পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—মায়েদের রকমই ঐ। এদিকে পেট চিরে খাওয়াবে আর বলবে, খেলে কই? আমাকে খাওয়াবার বেলায় বড়বৌও অমনি করে। বড়বৌ কাছে ব'সে যখন খাওয়ায়, তখন টেরই পাই না কতটা খেলাম, খাওয়ার পরে টের পাই। তাই খাবার সময় বড়বৌ কাছে না থাকলে আমার খাওয়াই হয় না। বড় বৌয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে না হলি আমি গিছিলাম আর কি! আমার হাতে প'ড়ে ওকে আজীবন তাফাল কম সইতে হয়নি, কিন্তু ও বরাবর সমানে খুশি, আমার চলার পথে কোন অন্তরায় তো সৃষ্টি করেইনি, বরং হাসিমুখে আমার সহায়করূপে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর, গিন্নীও বড় পাকা গিন্নী, বড়বৌ যেমন সুশৃঙ্খলভাবে অল্পের মধ্যে সংসার চালায়, অমন আজকাল খুব কম দেখা যায়। কর্ত্তামার গালাগালই ওকে মানুষ ক'রে দিয়ে গেছে। কর্ত্তামার কড়া শাসন ছিল, আবার ভালও বাসতেন খুব। বাবাও বড়বৌকে খুব ভালবাসতেন। বাবার ধারণা ছিল, আমার ও মার কোন সাংসারিক বুদ্ধি নেই। বুদ্ধিমতী ব'লে বড়বৌয়ের উপর তাঁর আস্থা ছিল খুব। বড়বৌয়ের সঙ্গে সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে পরামর্শ-টরামর্শ করতেন। বড়বৌয়ের সংরক্ষণ-বুদ্ধি তিনি খুব পছন্দ করতেন, আবার বলতেন, 'তোমার কাছে যদি কিছু থাকে, তা' কিন্তু অনুকূলকে বা তোমার শাশুড়ীকে ক'য়ো না, একবার টের পেলে আর রক্ষে নেই।'—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, সঙ্গে-সঙ্গে সবাই উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগলেন, হাসতে-হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ডান চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। শেষের দিকে হাসির মধ্যে যেন আনন্দ ও বেদনার একটা মিশ্রসুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। মনে হ'লো—পিতা-মাতার কথা বলতে-বলতে তাঁর মনের এক সুগভীর কোমল পর্দ্দা যেন আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছে।

এরপর সরোজিনীমা তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খাচ্ছেন। এমন সময় কিশোরীদা এসে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললেন—ও ডাক্তার! বোঝো-টোঝো কেমন?

কিশোরীদা (হাত জোড় ক'রে)—দয়াল! বুঝবের চাইনে কিছু, আপনি যা' কন, তাই যেন কাঁটায়-কাঁটায় পালন ক'রে যেতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আড়চোখে কিশোরীদার দিকে চেয়ে)—শালার দুনিয়াডাই

পাগল। তবে এই পাগলামোই ভাল। কি কও ডাক্তার? (ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন)।

কিশোরীদা—আমি অতোশতো বুঝি না। এইটুকু জানি যে, আপনি যা' কন তাই ঠিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর (খুশির হাসি হেসে)—তোমরা সকলেই শেয়ানা হ'য়ে গেছ। আমি কিন্তু বেকুবই রয়ে গেলাম, আমার আর জ্ঞানটান হ'লো না। আমি কিছু জানি ব'লে বুঝতে পারি না, তবে কেষ্টদারা যখন চা'পে ধরে, নানারকম প্রশ্ন উত্থাপন করে, তখন নিজের যা' মনে আসে ক'য়ে দিই। কী কই নিজেই ঠাওর পাই না। সকলে তো খুব ভাল-ভাল করে, আমাকে খুশি করবার জন্য কয় কিনা তা'ও তো বুঝি না। কেষ্টদা যখন ইংরেজীতে কিছু বলবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, প্রথমটা আমি তো কিছুতেই ঘাড় পাতি না, পরে যখন দেখলাম কেষ্টদা নাছোড়বান্দা, তখন ভাবলাম—আবোলতাবোল যা' মনে আসে, দুই-একদিন কই, তখন কেষ্টদা নিজেই বুঝবে যে আমাকে দিয়ে ওকাজ হবে না, তখন আর ওভাবে অনুরোধ করবে না। পরে যখন কইতে সুরু করলাম, তখন দেখি আর ওরা ছাড়ে না। পরমপিতা যা' জোয়াতেন, আমি সেইগুলি শুধু ফেলে-ফেলে যেতাম। কী বলেছি, পরে জিজ্ঞাসা করলে আর বলতে পারতাম না। এখনও কেউ ওগুলির মানে করতে দিলে, মানে করতে পারি না। তারপর, ছড়া যে আমি কোনদিন বলতে পারব, তা'ও কোনদিন ভাবিনি। কেষ্টদার আগ্রহাতিশয্যে বলতে সুরু করলাম। বলেছি, কেমন ক'রে যে কী বলি, কী করি, কিছুই টের পাই না। শুধু এইটুকু বুঝি—পরমপিতার মর্জ্জি হ'লে সব হয়।

তপোবনের নিয়মকানুন, আইন-শৃঙ্খলা কেমন হবে, সেই সম্বন্ধে ক্ষিতীশদা প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আইন-কানুন যা' করবেন, তা' করবেন to fulfil the wishes of the Guru and not to fulfil the advent of complexes (গুরুর ইচ্ছাকে পূরণ করতে; কিন্তু প্রবৃত্তির আবির্ভাবকে পূরণ করতে নয়কো)। আইন-কানুন প্রয়োজনবশে normally evolve করে (সহজভাবে বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে)—সেই-ই ভাল। জোর ক'রে কতকগুলি উপর থেকে চাপাতে গেলে, মানুষ পীড়িত বোধ করে, তা'তে প্রাণের উল্লাস ক'মে যায়। আর, এটা ঠিক জানবেন, আপনারা যদি true disciple (খাঁটি শিষ্য) হন, discipline (নিয়মানুবর্ত্তিতা) আপনাদের মধ্যে spontaneously

(স্বতঃই) গজিয়ে উঠবে, আর সেটা হবে normal discipline (সহজ নিয়মানুবর্ত্তিতা), formal discipline (বাহ্যিক নিয়মানুবর্ত্তিতা)-এর উপর বেশী ঝোঁক দিলে অনেক সময় normal discipline (সহজ নিয়মানুবর্ত্তিতা)-কে হারাতে হয়। Formal disciplinc (বাহ্যিক নিয়মানুবর্ত্তিতা) যদি enforce (কার্য্যকরী) করতে হয়, তবে তা' এমনভাবেই করতে হবে, যা'তে তা' normal discipline (সহজ নিয়মানুবর্ত্তিতা)-কে উস্কে তুলতে সাহায্য করে। প্রধানরা যত disciplined (নিয়মানুবর্ত্তী) হয়, অন্য সকলেও সেটা তেমনি imbibe (নিজেদের মধ্যে গ্রহণ) করে। আপনি যতখানি ordination-এর (ক্রম বা ধারার) মধ্যে আসবেন, আপনার সহকারী যারা ততখানি আপনার sub-ordination-এর (অধীনতার) মধ্যে আসবে, এর ভিতর-দিয়েই আসবে co.ordination (সঙ্গতি)। নিয়মকানুন যা'ই করুন, চোখটা নেবেন আমার। আমি সব সময় ভাবি, কাউকে যদি উপযুক্ত ক'রে তুলতে না পারি, সুশৃঙ্খল ক'রে তুলতে না পারি, তার মধ্যে আমার ত্রুটি কতখানি ও কোথায়। তার জন্য আমার যতখানি করার ছিল, তা' আমি করতে পেরেছি কিনা, করেছি কিনা। এই যখন ভাবি, তখন সে কী করেনি, তার জন্য মন খারাপ হয় না, মন খারাপ হয় এই ভেবে যে হয়তো আমার করায় কোথাও কোন খাঁকতি আছে। অনেক ক্ষেত্রে মনে হয়, আমার সাধ্যে যা' কুলায়, তার ত্রুটি করিনি, তবু মনে আপসোস হয়, আরো বেশী কেন করতে পারিনি। আর, আমি যে এমন-করি, এ আমার নিজের interest-এই (স্বার্থেই) করি। তার কারণ, আমি জানি, আপনাদের প্রত্যেককে নিয়েই আমি, এমন-কি কুকুরটা-বিড়ালটাকেও পর্য্যন্ত এ-থেকে বাদ দিতে পারি না। মনে হয়—কেউ যদি down (অবনত) হ'য়ে থাকে, আমিই down (অবনত) হ'য়ে রইলাম। এই interest (স্বার্থবোধ) ও sympathy (সহানুভূতি) নিয়ে করেন, চলেন ; দেখেন পরমপিতা আপনাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করেন।

এক-এক ক'রে পর-পর অনেকেই আসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের নানাজনের কাছে নানা বিষয়ের খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন।

বহিরাগত একটি মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়ে প্রণাম ক'রে বললেন—বাবা, মাঝে আমি খুব অসুখে পড়েছিলাম, ডাক্তার-কবিরাজ প্রায় ফেল পড়ার মত অবস্থা, আমি তখন বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কেবল কাঁদতাম আর আপনাকে ডাকতাম। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখি যে আপনি আমার কাছে পাঁচটি টাকা চাচ্ছেন। তার পরদিনই সকালে উঠে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আপনার নাম ক'রে

পাঁচটি টাকা উঠিয়ে রেখে দিই, মনে-মনে সঙ্কল্প করি—আমি সুস্থ হ'য়ে আপনার কাছে এসেই এই টাকা দিয়ে আপনাকে প্রণাম করব। সেইদিন থেকে সর্ব্বদাই আমি ভাবতাম, কবে আপনার কাছে এসে টাকাটা দিতে পারব। চিঠিতেও আমি এ-কথা লিখে জানিয়েছি। কিন্তু আপনার দয়ায় তখন থেকেই আমি তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে লাগলাম। আপনার কাছে যে এত শীঘ্র এসে হাজির হ'তে পারব, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। নেহাৎ আপনার দয়া, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ মায়ের দিকে চেয়ে বলছেন—আচ্ছা, এ কেমন! তুই রোগে ভুগছিস—সেখানে গিয়েও তোর ঠাকুর ভিক্ষের জন্য হাত পাতছে?

উক্ত মা—আমাদের বাঁচাবার জন্যই তো চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জানি তোরা কী কোস্! তবে ভিক্ষা আর আমাকে ছাড়ল না। আর-একটা মজা দেখি—যারা দেয়, তারা কিন্তু সব দিক দিয়ে বেড়েই ওঠে। দেবার আগ্রহই তাদের কর্ম্ম-কৌশল খুলে দেয়। আবার, ইষ্টকে দেবার ধান্ধায় যারা কর্ম্ম-ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠে, ঐ বুদ্ধি ফন্দী-ফিকির নিয়ে ঘোরে, ঐ আকুল প্রচেষ্টাই তাদের গ্রহবৈগুণ্য অর্থাৎ প্রবৃত্তি-অভিভূতিকেও অনেকটা কাবু ক'রে দেয়। তাই শ্রেয়কে দেওয়ার বুদ্ধি যত বাড়ে ততই ভাল। মা-বাবাকে দেওয়ার বুদ্ধি যাদের থাকে, তাদেরও ভাল হয়।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—হাগা পেয়ে গেছে। (সকলের দিকে চেয়ে)—এইবার তাহ'লে উঠি।

সবাই বললেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে হরিপদদাকে বললেন—দ্যাখ্ তো হরিপদ! কাপড়ে হেগে ফেললাম নাকি! বিছানা নষ্ট হল নাকি!

হরিপদদা কাছাটা সরিয়ে দেখে বললেন—না, কিছু না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিছানাটা দেখলি না?

হরিপদদা—তেমন কিছু হলে তো কাপড়েই দাগ থাকত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা চল।—এই ব'লে নিভৃত-নিবাসে পায়খানায় গেলেন।

নিভৃত-নিবাসের ভিতরে পূব-দক্ষিণ কোণে ছোট একটি ঘরে কমোড-পাতা পায়খানা, শ্রীশ্রীঠাকুর শৌচাদি সারলেন। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে বড় একখানি জলচৌকীর উপর ব'সে পাউডার দিয়ে ভাল ক'রে দাঁত মাজলেন। দাঁত মেজে মুখ ধুলেন, তারপর হাত-পা ভাল ক'রে ধুলেন, সরোজিনীমা গাড়ু

থেকে জল ঢেলে দিলেন, হরিপদদাও সঙ্গে-সঙ্গে থেকে সাহায্য করতে লাগলেন। পরে মুখ-হাত-পা মুছে শ্রীশ্রীঠাকুর কাপড় বদলালেন। এমনভাবে কাপড় বদলালেন যা'তে পায়খানার কাপড়টির সঙ্গে নূতন কাপড়টির ছোঁয়া না লাগে। কোঁচান সাদা ধবধবে কালপেড়ে শান্তিপুরে ধ্নুতিটি প'রে, সামনের ঝুলে-পড়া কোঁচাটি আবার উঠিয়ে বামদিকের মাজার কাছাকাছি গুঁজে দিলেন। কাপড়টি নাভির বেশ একটু উপরেই পরলেন। ধ্নুতিটি ৫০ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ১১ হাত লম্বা, কোঁচাটি কাছাটির সুষম বিন্যাসে বেশ মানানসইভাবেই পরলেন ধ্নুতিটি, পরার ধরণে একটা আটপৌরে সরল সৌন্দর্য্য,—অভ্যস্ত অভিজাত রুচিবোধের পরিচয়। এরপর একটি আদ্দির ফতুয়া গায়ে দিলেন, ফতুয়াটির তৈরীর ধরণ বেশ সুন্দর, হাতাটি কনুই পর্য্যন্ত, নীচের ঝুল বেশীও নয়, কমও নয়, শরীরের সঙ্গে বেশ সহজভাবে খাপ খেয়ে গেছে। কাপড় ও ফতুয়া প'রে চটিটি পায় দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর থপ-থপ ক'রে বেরিয়ে এলেন অস্তিকায়ন (নিভৃত-নিবাস) থেকে। সিধে হ'য়ে হাঁটেন তিনি, হাঁটার সময় দীর্ঘ নাতিস্থূল দেহটি একটু সুঠামভাবে দুলে-দুলে ওঠে। নজর তাঁর খুব তীক্ষ্ণ, যে-পথ দিয়ে যান, তার সামনে আশে-পাশে কী আছে, কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় না। অস্তিকায়ন থেকে বেরিয়ে উত্তরাস্য হ'য়ে মাতৃমন্দিরের দিকে চলেছেন—অস্তিকায়নের উত্তর-পশ্চিম কোণে নজর পড়তেই দেখতে পেলেন সেখানে শেয়ালে বাহ্যি ক'রে রেখে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মণিদাকে (ঘোষ) সামনে দেখতে পেয়ে বললেন—হেমগোবিন্দকে ডাক তো! শেয়ালের গু-টা ফেলে দিক।

মণিদা ডাকতে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে দাঁড়িয়েই রইলেন,—হেমগোবিন্দদা আসার পর তাকে ব'লে, ওখান থেকে নড়লেন। যাবার আগে একবার হেমগোবিন্দদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, আমি যাব তো? হেমগোবিন্দদা বিনীতভাবে বললেন—আপনি যান ঠাকুর, আমি এখনই ফেলে দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় গিয়ে চৌকিতে বসলেন দক্ষিণাস্য হ'য়ে। প্যারীদা এসে ব্লাড-প্রেসারটা দেখলেন, তারপর একটা ওষুধ দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ওষুধটা খেয়ে, ওষুধের গ্লাসে ক'রে একটু জলও খেলেন। এরপর একে-একে এসে অনেকে প্রণাম ক'রে যেতে লাগলেন, কেউ-কেউ কাছে বসে রইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদৃষ্টে আকাশের দিকে কিছু সময় চেয়ে রইলেন, যেন বিশেষ কিছু দেখছেন—পরে বললেন, দেখ, ঐযে আকাশে পাতলা মেঘের স্রোত ভেসে যাচ্ছে, ওটা দেখতে কিসের মত বল তো?

প্রফুল্ল সামনে এগিয়ে এসে ভাল ক'রে দেখে বলল—বিশেষ কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্য তো মনে হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখ, ভাল ক'রে দেখে বলাই চাই ছাওয়াল। ও-কথা আমি শুনব নানে।

প্রফুল্ল যেন ফাঁপরে প'ড়ে গেল, আরও কিছুসময় নিবিষ্ট মনে দেখে বলল—দেখতে কতকটা যেন একটা বিরাট হাতীর মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লসিত কণ্ঠে)—যা, পেরে গিছিস্, এই ব'লে কিছুর সঙ্গে মিল পাচ্ছিলি না। সেইজন্য ধিইয়ে-ধিইয়ে দেখার অভ্যাস করতে হয়। সংশ্লেষণী দৃষ্টি, বিশ্লেষণী দৃষ্টি দুই-ই চাই। সংশ্লেষণী দৃষ্টি হ'চ্ছে বহুকে জোড়াতাড়া লাগিয়ে, সম্পর্কান্বিত ক'রে এক ক'রে দেখা, আর বিশ্লেষণী দৃষ্টি হ'ছে একের অন্তর্নিহিত বহুত্বকে দেখা, নানাজাতীয় বিশিষ্ট উপাদান-সামগ্রী, যার সংহত সমবায়ে জিনিসটি গ'ড়ে উঠেছে, তাকে বিশ্লিষ্ট ক'রে অর্থাৎ আলাদা ক'রে দেখা। সংশ্লেষণী, বিশ্লেষণী দুইরকম দৃষ্টি যদি না খোলে, তাহ'লে কোন জিনিসকেই পুরোপুরি দেখা হয় না। এই সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের আবার নানা পর্য্যায় আছে, এর পরিধি যার যত ব্যাপক, গভীর ও সূক্ষ্ম, সে হয় তত বুদ্ধিমান। কাব্য বল, বিজ্ঞান বল, সাহিত্য বল, ব্যবসা-বাণিজ্য বল, রাজনীতি বল, ঘর-সংসার বল—জীবনের সবক্ষেত্রেই এই দুমুখো দৃষ্টির প্রয়োজন আছে। সমান তালে এ দুটোর অনুশীলন যারা করে, তাদের প্রবীণ চক্ষু খুলে যায়।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনিদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), পণ্ডিত (ভট্টাচার্য্য), দেবী (চক্রবর্ত্তী) প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। কেষ্টদা আসার পর হিটলার, মুসোলিনীর আত্মজীবনী-সম্বন্ধে গল্প করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি একটা জিনিস দেখি, যে যেখানে বড় হয়, শ্রেয় কারও না কারও প্রতি তার বিশেষ শ্রদ্ধা থাকেই। এর একটাও exception (ব্যতিক্রম) দেখি না। এই glowing point (দীপনদ্যোতনা)-টা যদি পরিস্ফুট ক'রে তোলা না যায়, তবে সে-ইতিহাস বা জীবনীর কোন দাম নেই। এই শ্রেয় আবার যতখানি শ্রেয়নিষ্ঠ, বৈশিষ্ট্যপূরণী ও সমষ্টি-উৎসারণী হন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা যত গভীর ও সক্রিয় হয়, ততই মানুষের উন্নতির সম্ভাবনা বেশী থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেবীকে ধমক দিয়ে বললেন—চাদর গায় দিয়ে আসিস্‌নি কেন? ওদিকে তো খক্-খক্ ক'রে কাশছিস্। যাঃ! এখুনি যা! দৌড়ে গিয়ে চাদর নিয়ে আয়! ছাওয়াল-পাওয়াল এত অসাবধান!

দেবী (চক্রবর্ত্তী) তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন চাদর আনতে।

মণিদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যম পুত্র) তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লক্ষ্য পড়তেই সস্নেহে বললেন—তোর পেট এখন কেমন ?

মণিদা—আগের থেকে ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিষ্টিটিষ্টি বেশী খাবি না কিন্তু।

মণিদা—আজকাল তো তেমন খাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে চেয়ে বিমল হাসিতে সকলের মনে আনন্দের ছোঁয়া লাগিয়ে বললেন—মিষ্টি খাওয়ার নেশা ওর কতকটা আমার মত। আমার থেকেই পাইছে।

পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করলেন—থিয়েটারের মক্‌স করছিস্ না আজকাল ?

মণিদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে লাগা। (কেষ্টদার দিকে চেয়ে) করেও কিন্তু বড় সুন্দর !

কেষ্টদা—অপূর্ব্ব !

৪ঠা পৌষ, শুক্রবার, ১৩৪৮ (ইং ১৯।১২।৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর অতি প্রত্যূষে বিছানা থেকে উঠে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বাঁধের উপর একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসতেই তিনি নিজে থেকে হেসে কথা কন, কিংবা তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে যেন তেমন ভয়সঙ্কোচ হয় না। কিন্তু আজ এমন মৌন-গম্ভীর বিরাটমূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দিগন্তবিসারী প্রান্তরের শেষ প্রান্তে দিগ্বলয়ের দূর বিন্দুতে উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে যে তাঁর কাছে এগুতেই যেন সাহস হ'চ্ছে না। তিনি কাছে থেকেও যেন কতদূরে, সীমার মাঝে থেকেও যেন অসীমে আত্মহারা—আমাদের ধরা-ছোঁয়া-নাগালের বাইরে। তিনি এমনতরভাবে আপন মনে আপনি বিচরণ করেন যখন, তখন সেই বিরাট পুরুষকে দূর থেকে ভয়মিশ্রিত ভক্তি নিয়ে প্রণাম করা যায়, কিন্তু কাছে এগুনো যায় না। 'অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।' সকলে প্রণাম করলেন, প্রণাম ক'রে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। স্বচ্ছন্দমনে জোরে নিঃশ্বাস নিতেও কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। স্তব্ধ, থমথমে, গুরুগম্ভীর আবহাওয়া। এমন সময় বোঝা যায় যে, তিনি দয়া ক'রে আমল দেন তাই সেই দুরবগাহ, দুর্ব্বার ব্যক্তিত্বের কাছে এগোন যায়, নিশ্চিন্ত হ'য়ে তাঁর সঙ্গে মেশা যায়,

নতুবা কার সাধ্য আছে, তিনি ইচ্ছা না করলেও, তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে ?

এইভাবে কিছু সময় কাটল, পরে উত্তর দিকে মুখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর সহজ-ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কখন আসলে ?

উত্তর দেওয়া হ'ল—এই এখন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন—চল, ভিতরে যেয়ে বসিগে।—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর অগ্রসর হলেন, আর সকলেও পিছু-পিছু গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাম্বুর ভিতর ঢুকে বিছানায় উপবেশন করলেন। আর সবাই চৌকির চারিপাশ ঘিরে মাটিতে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—(কথার মধ্যে কেমন যেন একটা অন্তরঙ্গ রহস্য-গভীর সুর) দ্যাখ, দুনিয়ায় সবই কিন্তু চেতন, অচেতন কোথাও নেই কিছু। সবার সঙ্গেই তাই আদান-প্রদান চলে, ভাববিনিময় চলে। আবার, মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় সবই যেন মানুষ—গুরু-মানুষ, গাছ-মানুষ, ঘাস-মানুষ, চাঁদ-মানুষ, সূর্য্য-মানুষ এমনি কত কী ! কখনও আবার দেখি—সবই যেন আমি—গাছ-আমি, পোকা-আমি, রাম-আমি, শ্যাম-আমি, এক আমি এত হ'য়ে আছি, আমিই আমার সঙ্গে এত কাণ্ড করছি—এ বড় বিচিত্র ব্যাপার। তাই কেউ যখন কারও ক্ষতি করতে চায়, আমার বড় হাসি পায়। ভাবি—পরমপিতা ! এ তোমার কী খেলা ? মানুষ নিজেরই ক্ষতি করতে চায় নিজে। কারও ক্ষতি করা মানে যে নিজেরই ক্ষতি করা—এইটুকুই বোঝে না। তত্ত্বদৃষ্টি বাদ দিলেও একথা খাটে। তোমার পরিবেশকে তুমি যদি ক্ষুণ্ণ কর, প্রতিক্রিয়ায় তারাও তোমাকে ক্ষুণ্ণ করতে চেষ্টা করবে, আর তা' যদি না-ও করে, তারা ক্ষুণ্ণ হ'লে আগের মত জীবনীয় পোষণ যোগাতে পারবে না তোমাকে ও অন্যান্যকে। ফলে, তোমারই তো ক্ষতি সব থেকে বেশী। তাই ব'লে দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে চলছে যারা—তাদের যে নিরস্ত করবে না, তা' কিন্তু নয়। সেখানে প্রতিরোধ না করাই দুর্ব্বলতা, ঐ দুর্ব্বলতা অধর্ম্মেরই নামান্তর। ধর্ম্মের নামে কত যে অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাচ্ছে দুনিয়ায়, তার কি ঠিক আছে !

শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়ার নল টানতে-টানতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ধূর্জ্জটিকে দেখি না দু'-একদিন। ও ভাল আছে তো ?

ইন্দুদা—শুনেছি খুব সর্দ্দি হয়েছে। তাই আসেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমরভাইয়ের দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করতেই অমরভাই গেলেন খবর নিতে।

অমরভাই (ঘোষ) খবর নিয়ে একটু পরে এসে বললেন—সর্দ্দি আগের থেকে কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেট ভাল আছে তো ? বাহ্যে পরিষ্কার হয় তো ? ওষুধ কী খাচ্ছে ? আগের তুলনায় ক' আনা কমিছে ?

অমরভাই—আমি তো অতো খবর নিইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ভাল ক'রে শুনে আয় গিয়ে। যে-কোন কাজে যাস্—মাথা খাটিয়ে সব দিকের খোঁজ-খবর নিবি। একেই বলে অনুসন্ধিৎসা। এই অনুসন্ধিৎসা যদি থাকে, তাহ'লে দেখবি—এক-একটা দিন পেরিয়ে যাবে আর তোর জ্ঞানের পরিধি কত বেড়ে যাবে। আমি এটা শুধু ওকে বলছি না—আপনারা প্রত্যেকেই এদিকে খেয়াল রাখবেন। আর, ছেলেপেলেরাও যা'তে অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে ওঠে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। মানুষ যদি চৌকস না হয়, অনুসন্ধিৎসু না হয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন না হয়, তবে তাদের দিয়ে গতানুগতিক কাজ চলতে পারে, কিন্তু বড় কাজ হওয়া মুশকিল। আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য দেশে আন্দোলন চলছে, দেশকে স্বাধীন ক'রে তুলতে যেমন হিম্মতের প্রয়োজন, একটা স্বাধীন রাষ্ট্রকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলেও ততোধিক যোগ্যতার প্রয়োজন। সে-শিক্ষা আমাদের কোথায়—যে-শিক্ষা এই উপযুক্ততা এনে দেয়! তাই ব্যক্তিত্ব বেড়ে ওঠে যা'তে, নেতৃত্বের ক্ষমতা গজিয়ে ওঠে যা'তে, সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে উপচয়ী ক'রে তোলা যায় যা'তে, তেমনতর শিক্ষার আমদানি করতে হবে। ধর, তুমি শিক্ষক, তোমার একটি ছাত্র আজ বাদে কাল হয়তো স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রদূত হ'য়ে যাবে আমেরিকায়। সে-কাজ কিন্তু সোজা কাজ নয়, শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যায় কুলাবে না। অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝে তখন তাকে আমেরিকাকে ভারতের interest-এ (স্বার্থে) mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে হবে। এই যে করতে হবে, এতে শুধু নিজের কোলে ঝোল টানলেই চলবে না, তাদের বোঝাতে হবে যে এর ভিতর-দিয়ে তাদের স্বার্থ কতখানি পরিপূরিত হ'চ্ছে। আবার, শুধু আশুলাভ দেখলে হবে না, দীর্ঘদৃষ্টি থাকা চাই। আকার-ইঙ্গিতে মানুষের মনের কথা টের পাওয়া চাই। কূটনীতি যদি তার চরিত্রগত না হয়, তবে বেকুব ভালমানুষেমিতে কিন্তু চলবে না। আবার, সকলেই সব কাজ পারে না। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বুঝে প্রত্যেককে এমনভাবে nurture (পোষণ) দিতে হয়, যা'তে প্রত্যেকে তার মত ক'রে এক-একটা দিকপাল হ'য়ে ওঠে। তোমার তাহ'লে কতখানি নজর থাকা চাই ভেবে দেখ। তোমার ছাত্রদের কেউ হয়তো হবে ঋত্বিক্, ঋত্বিকের প্রধান কাজ যাজন,

যে যাই নিয়েই থাক, তাকে তার ভিতর-দিয়েই Ideal-এ (আদর্শে) interested (অন্তরাসী) ক'রে তুলে জীবনের পথে, যোগ্যতার পথে, আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে বাড়িয়ে তুলতে হবে। দেশের অবস্থা এমনতর, এ অবস্থায় 'হয় না', 'হবে না' ইত্যাদি রকম থাকলে তার চলবে না। সে নিজেই যদি অন্যের অন্ধকারে কালো হ'য়ে যায়, তবে কাজ করবে কী? তার appearance (চেহারা), activity (কর্ম্ম), every footstep (প্রতিটি পদক্ষেপ) এমন ধরণের হবে, যা' দেখে প্রত্যেকে elated (সন্দীপ্ত) হ'য়ে ওঠে, তার দীপ্তির প্রভা সবার চোখ ফুটিয়ে দেবে—তবেই তো সে ঋত্বিক্—তবেই তো সে পুরুষোত্তম-পতাকাবাহী দেবকোটি সোনার মানুষ। তার conviction (প্রত্যয়)-এর স্পর্শে সমস্ত darkness (অন্ধকার), depression (অবসাদ), moroseness (বিষাদ) যেন ঊষার আলোয় পা ফেলবে, দেখতে-দেখতে বিলীন হ'য়ে যাবে। একটা ছেলেকে যদি এতখানি ক'রে তোলা লাগে, তাহ'লে তোমার কোথায় ওঠা লাগবে—ভেবে দেখছ? ফলকথা, তোমার সহজ চরিত্র যদি প্রতিটি মুহূর্ত্তে আলোর চমক দিতে-দিতে চলে—ইষ্টানুগ উদ্দীপনা সঞ্চার ক'রে—তবে তোমার প্রত্যেকটি ছাত্রই তোমার কাছ-থেকে তার বৈশিষ্ট্যমাফিক অনুপ্রেরণা আহরণ করবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেখ না? War-field-এ (যুদ্ধক্ষেত্রে) একটা general (অধিনায়ক)-এর appearance (চেহারা), এক-একটা কথা কেমন push (উচ্চেতনী প্রেরণা) দিয়ে যায়—সবাই যেন জ্বলে ওঠে। 'কয়লা কি ময়লা ছোড়ে যব আগ করে পরবেশ।' আগুন কালো কয়লাকে, লোহার গোলাকে পর্য্যন্ত লাল ডগডগে ক'রে ছেড়ে দেয়। মানুষের বেলায় conviction (প্রত্যয়) ও urge (আকূতিই) হ'লো সেই আগ্ বা আগুন, যার ছোঁয়ায় সব-কিছু glowing (উজ্জ্বল) হ'য়ে ওঠে।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ আবেগোদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো। বলার পর তিনি তামাক খেলেন। তামাক খেতে-খেতে মৃদু-মৃদু এর-ওর দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। এর মধ্যে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য) প্রভৃতি আসলেন।

নিবারণদা (বাগচী) কথাপ্রসঙ্গে খুব করুণভাবে তাঁর অভাব-অভিযোগের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দীর্ঘ সময় ধ'রে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ ধ'রে নীরবে ঐ কথা শুনবার পর ও-কথায় বিশেষ আমল না দিয়ে স্নেহ-মধুর দৃপ্তকণ্ঠে ঝাঁকি দিয়ে ব'লে উঠলেন—ধ্বজভঙ্গের মত কথা ক'সনে তো। তুই একটা বামুনের ছেলে, তার পর ঋত্বিক্। সৎসঙ্গের

বাজারে পাছা ঘসটাচ্ছ কম বছর না। জান-বোঝাও নিতান্ত কম না। তোমার একটু খ্যাতি-খাতিরও আছে। একখানে দাঁড় করিয়ে দিলি মুখ দিয়ে খই ফোটে, মানুষ মনে করে, মা সরস্বতী যেন কণ্ঠে বসেছেন। চেহারাটাও আছে খুবসুরৎ। কোনদিক্ দিয়েই কম যাও না। কেবল নিজের পরিবার চালাবার বেলায় হিমসিম খেয়ে যাও—তার মানে চরিত্রের অভাব, কথায় আর করায় মিল নেই। ওইটুকু শুধরে ফেল বাছা! নিজেকে ফাঁকি আর কতকাল দেবে?

নিবারণ-দা যুগপৎ লজ্জিত ও উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই এ-পর্যন্ত দীক্ষা দিয়েছিস্ কত?

নিবারণ-দা—হাজারের উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে-হাসতে)—শোন কথা, হাজারের উপর যার যজমান, সে নাকি খেতে পায় না। আরে বাপু, এদের পিছনে তুই যদি একটু খাটিস্—এদের মধ্যে শতকরা পঁচিশ জনও যদি ইষ্টভৃতি করে এবং নিজেরা দাঁড়িয়ে যায়, অর্থাৎ যোগ্যতার অধিকারী হয়, দক্ষনিপুণ হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে তো তোর আর ভাবনা থাকে না। আর দ্যাখ্! নিতান্ত প্রয়োজন হ'লে বরং সহজভাবে তোর প্রয়োজনের কথা ব'লে ভিক্ষা করবি, কিন্তু ধার-কর্জ্জ ক'রে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) করতে যাবি না। অবশ্য, নিজের জন্য মানুষের কাছে যত কম চেয়ে পারিস্ সেই ভাল। যজমানদের অভাব-অভিযোগে, তারা তোর কাছে কিছু না চাইতেও পাঁচজনের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে যাকে যতটুকু পারিস্ সাহায্য করবি, আর যেভাবে প্রত্যেকে দাঁড়াতে পারে, তার উপায় ক'রে দিবি। এতে দেখবি—স্বেচ্ছায় স্বতঃ-প্রণোদিত হ'য়ে তোকে দেবার প্রবৃত্তি আসবে তাদের। এই প্রীতি-অবদান বামুনের বড় আদরের জিনিস। এমনতরভাবে একটি পয়সাও যদি তুমি পাও, সেই এক পয়সার মাল তোমাকে যে পুষ্টি দেবে, ছ্যাঁচড়ামি ক'রে পাওয়া হাজার টাকার জিনিসেও তা' তুমি পাবে না! আর, ঋত্বিকের কাজ ভালভাবে করতে গেলে আরো সহ-প্রতিঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু ও যাজক ক'রে ফেল। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সরদার—তা' কি হয়? Assistant (সহকারী)-দের আবার properly (যথাযথ) equip (প্রস্তুত) করা চাই। এখানে নিয়ে আসবি, আমি যতটা পারি কথাবার্ত্তা কব। আর, কেষ্টদার কাছে নিয়ে যাবি। আবার, যজমানদের একটা Register (তালিকা) রাখবি, দূরে যখন থাকিস্ তখন তাদের কাছে চিঠিপত্র দিবি। একজনের হয়তো মেয়েটা বড় হয়েছে—তার গোত্র, বংশ, বয়স ইত্যাদি তোর কাছে লেখা আছে। ঘুরতে-ঘুরতে কোথাও গিয়ে হয়তো দেখলি, তার উপযোগী একটি পাত্র আছে, তখন

হয়তো যোগাযোগ ক'রে দিলি। তোমার একজন যজমান হয়তো Tube-well contractor (নলকূপ-ঠিকাদার), আর একজন হয়তো District Board (জিলাবোর্ড)-এর মেম্বার (সভ্য) ; একজনকে দিয়ে আর একজনকে কিছু contract (ঠিকাকাজ) জুটিয়ে দিলে। Contract (ঠিকাদারী) যে পেল, তাকে হয়তো ব'লে দিলে—'দ্যাখো, বেশী লাভ খেতে যেও না। বরং এমনভাবে কাজ করা চাই, যা'তে লোকের খুব সুবিধা হয়। আর-একবার contract (ঠিকাদারী) দিতে গিয়ে তোমাকে না ডেকে যেন পারে না।' তেমনি কেউ হয়তো আছে রোগী, কেউ হয়তো আছে ডাক্তার, কেউ হয়তো আছে মক্কেল, কেউ হয়তো আছে উকিল—পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ক'রে দিয়ে প্রত্যেকের সেবা দিতে হয়। তুমি জান, কারোও হয়তো পুরানো তেঁতুল খাওয়া দরকার, তুমি ঘুরতে-ঘুরতে একজায়গায় এক-বাড়ীতে গিয়ে খবর পেলে যে সেখানে পুরানো তেঁতুল আছে, সেখান থেকেই হয়তো কাউকে দিয়ে খানিকটা পুরানো তেঁতুল ওর কাছে পাঠিয়ে দিলে। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ এমন পেলে মানুষের কেমন মিষ্টি লাগে বল তো? আর, শুধু যজমান ব'লে কথা নয়, সৎসঙ্গীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এটা চারিয়ে দেওয়া চাই। তোমরা নিজেদের মধ্যে যতখানি পার তা' তো করবেই, এমন-কি তোমাদের আওতার বাইরে যারা, তাদেরও সাধ্য মতন সেবা দিতে ত্রুটি করবে না। তবে যাকে যে সেবাই দাও, সব সময় স্মরণ রাখবে, ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠদান।

ইতিমধ্যে কালিদাসীমা কাজলকে কোলে ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কাজল শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে ঝাঁপিয়ে বিছানার উপর আসতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (টেনে-টেনে)—বাপাই সোনা! বাপাই সোনা!—ব'লে দূর থেকে আদর করলেন।

কালিদাসীমা—দেব বিছানায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন গোল করিস্ না। বিছানায় মুতে-টুতে দেবে। এরা সবাই আছে—এদের সঙ্গে ব'সে একটু খোয়াড়ি ভাঙ্গি। নেশা তো করিস্নি কোন দিন।

সবাই হেসে ফেললেন। কালিদাসীমা-ও হাসতে-হাসতে কাজলকে কোলে ক'রে অন্য দিকে গেলেন। জ্ঞান চৌধুরী-মহাশয়ের বাড়ীতে রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল, সেখান-থেকে একটা মিষ্টি মনোহর গন্ধ আসছিল ভুর-ভুর ক'রে, সে-গন্ধ কেবলই শুঁকতে ইচ্ছা করে। সেই গন্ধেরই মত মনোলোভা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ। তাঁর সঙ্গ-সুখ একবার পেলে নিরন্তর তা' আস্বাদন করতে ইচ্ছা করে।

একটা লোলুপ তৃপণা উদগ্র হ'য়ে ওঠে। সবাই তাই জমে গেছেন। কারও আর উঠবার ইচ্ছাটি নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ভাব-তন্ময়তা লক্ষ্য ক'রে আপন মনে গিরিনির্ঝরের কলধারার মত মত্ত-আনন্দে ব'লে চলেছেন—

complex-সমন্বিত (প্রবৃত্তি-সমন্বিত) being (সত্তা) থাকে, আর থাকে objective world (বস্তুগত দুনিয়া)। Being-এর (সত্তার) ভিতর থাকে will to live (বাঁচার ইচ্ছা), will to enjoyment (উপভোগের ইচ্ছা), will to activity (কর্ম্মের ইচ্ছা)। মানুষ দুনিয়াকে enjoy (উপভোগ) করে complex-এর (প্রবৃত্তির) সাহায্যে। কিন্তু একবার যদি প্রবৃত্তির কবলে প'ড়ে যায় তাহ'লে কিন্তু আর তার কোন enjoyment (উপভোগ) থাকে না। Enjoyment (উপভোগ)-এর জন্য দরকার হয় আধিপত্য, আমরা ঈশ্বরের বাচ্চা, তিনি আধিপত্যময় ভিতরে-বাইরে সর্ব্বত্র, তাই তিনি আনন্দময়, আমরাও তেমনি সর্ব্বতোমুখী আধিপত্যের পথে যতখানি এগিয়ে যাব, ততখানি উপভোগ-সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হব। এর জন্যই দরকার হয় আদর্শ গ্রহণ ও তা'তে অনুরাগ। যাঁর মধ্যে পরতে-পরতে সব সাজান রয়েছে, যাঁকে দেখে সব-পাওয়ার পথে চলতে পারি, তিনিই হলেন আদর্শ। এই আদর্শ না থাকলে মানুষের অভিজ্ঞতা হয় না। Complex (প্রবৃত্তি)-ই তাকে guide (পরিচালনা) করে, complex (প্রবৃত্তি) থেকে আলাদা ক'রে সে নিজেকে ভাবতে পারে না। পোষা কুত্তা যদি রসগোল্লা দেখে, তবে তার খাওয়ার ইচ্ছা হ'লেও প্রভুর দিকে চেয়ে থাকে। যার প্রভু নেই, সে রসগোল্লা দেখা মাত্রই তা'তে মুখ দেয়—পরে ডাণ্ডা খায়, তখনকার মত বোঝে, আবার ভোলে, আবার খায় আবার আঘাত পায়, সারা জীবন এমনি চলে। Ideal (আদর্শ) থাকা সত্ত্বেও complex (প্রবৃত্তি) অনেক সময় screen-এর (পর্দ্দার) মত মাঝখানে এসে দাঁড়ায় ; Ideal (আদর্শ) চোখের সামনে তখন থাকেন না। মানুষ এমনভাবে treacherous (বিশ্বাসঘাতক) হ'য়ে দাঁড়ায়, তাই সব ছাপান টান না থাকলে হবে না। তাই ব'লে আমি এ বলছি না যে complex (প্রবৃত্তি) থাকবে না, তাদের full healthy vigour (পূর্ণ সুস্থ তেজ) থাকা চাই যমন-দীপ্ত হ'য়ে, নচেৎ মানুষ তো subman (অমানুষ) হ'য়ে যাবে। আর-একটা জিনিস হয়—মানুষ অনেক সময় ভুল ক'রে হঠাৎ হয়তো একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে, inferiority (হীনম্মন্যতা)-র দরুন তা' আর কিছুতেই ছাড়তে পারে না, ফলে জীবন-বৃদ্ধিকেও আলিঙ্গন করতে পারে না। এটা কিন্তু ভাল নয়। প্রতিশ্রুতি হবে আদর্শ বা আদর্শপ্রতীকের প্রতি—তাঁরই পরিপূরণের

জন্য, নচেৎ সে প্রতিশ্রুতির মূল্য কী ? শাস্ত্রী দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত পৈতে গলায় দেবে না ব'লে গলার পৈতে খুলে হাতে পরলো। আমার শুনে মনে হলো, যার সাহায্যে তুই চলবি, কাজ করবি, সেই কৃষ্টিচিহ্নই যদি তুই স্থানচ্যুত করলি, জীবনের ভিত্তিই যদি তুই টলিয়ে দিলি, তবে তুই দাঁড়াবি কিসের উপর ? এমনতর দেখলে, তাকে দিয়ে কাজ যে কতখানি হবে, তা' আমার বুঝতে বাকী থাকে না। চাণক্যের জীবনে কিন্তু এমনতর প্রতিজ্ঞা দেখতে পাবে না, যা' কৃষ্টিকে অবদলিত করেছে, কারণ, কৃষ্টি মানেই হ'লো আদর্শে কর্ষিত হওয়া—যা' কিনা অভ্যুদয়ের একমাত্র অমৃত-উৎস !

৫ই পৌষ, শনিবার, ১৩৪৮ (ইং ২০।১২।৪১)

মানুষের মনের কামনা—

'প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি
ওগো অন্তরযামী।'

মূর্ত্ত অন্তর্য্যামী যিনি, যাঁর প্রতি অনুরাগে মানুষের সমগ্র অন্তর নিয়ন্ত্রিত হয়, সুষম ছন্দে ছন্দায়িত হ'য়ে ওঠে, অন্তরের কলুষ বিদূরিত হয় যাঁর মঙ্গল করস্পর্শে, ঊষার আলোয় চোখ মেলে কার না দেখতে ইচ্ছে করে তাঁকে ? তিনি কোথায় ? তাঁকে কি দেখা যায় ? হ্যাঁ ! তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়। আমাদেরই একজন হ'য়ে আমাদের ঘরের দোরে বিরাজ করছেন তিনি। সেখানে তাঁর নিত্যলীলা অজস্রধারে উৎসারিত হ'য়ে চলেছে। এস, দেখবে এখানে পদ্মাতীরে নিখিল-হৃৎপদ্ম ফুটে আছে কী অপূর্ব্ব শোভা বিকিরণ ক'রে ! দেখবে কী অগাধ শান্তি, অনাবিল আকর্ষণ ! তাঁর ছোঁয়ায়, তাঁর হওয়ায় তোমারও হৃদয়-শতদল বিকশিত হ'য়ে উঠবে পাঁপড়ির পর পাঁপড়ি মেলে।

ঠাকুরকে ঘিরে আনন্দের মেলা বসেছে এখন। মধুর কলতানে সংলাপ চলেছে মিহি পর্দ্দায়।

ঈষদাদা (বিশ্বাস)—গণ্ডগোলের ভয়ে আগে আমি মানুষকে কিছু বলতে ভয় পেতাম, এক-এক সময় compromise (আপোষ) ক'রে যেতাম, আজকাল সে ভয় কেটে যাচ্ছে, আদর্শ-বিরোধী কোন কথা হ'লেই চেপে ধরি—সে যিনিই হউন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতরে moral weakness (নৈতিক দুর্ব্বলতা) থাকলে সে sweet compromising (মিষ্টি আপোষকারী) হয়। Strictly

(কঠোরভাবে) চলতে ভয় পায়, পাছে তার weakness (দুর্ব্বলতা) disclosed (প্রকাশিত) হ'য়ে যায়, তাই নিজেদের মান বজায় রাখার জন্য পরস্পর পরস্পরের weakness (দুর্ব্বলতা) support (সমর্থন) করে। যার conscience (বিবেক) strong (সবল), সে হয় sweet (মিষ্টি), invigorating (তেজ-সন্দীপী) but uncompromising (কিন্তু আপোষরফাহীন)। তাঁর রূঢ়ো প্রতিবাদের মধ্যেও একটা শ্রেয়োনিষ্ঠা-সমন্বিত দরদী ব্যক্তিত্বের পৌরুষ-দৃপ্ত অভিব্যক্তি থাকে, যা' মানুষকে শেষ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন ক'রে তোলে তাঁর প্রতি। অবশ্য inferiority (হীনম্মন্যতা)-ওয়ালা একদল থাকবেই, যারা কিছুতেই তাঁকে বরদাস্ত করতে পারবে না, কিন্তু বরদাস্ত না করতে পারলে কি হয়? ভিতরে-ভিতরে তাঁকে ভয় ও ভক্তি করবেই। যাকে প্রয়োজনমত কড়া কথা শুনিয়ে দিলে, তারই বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে তুমি যদি আবার দরদীর মত তার পাশে গিয়ে দাঁড়াও, তোমার সাধ্যমত তার প্রতিকারের চেষ্টা কর, তখন দেখবে সে আপনা-থেকেই কাবু হ'য়ে পড়বে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—শোনা যায়, হিটলার নাকি যাকে ধরে, একেবারে বাঘের মত ধরে, sweetness-এর (মিষ্টতার) নামগন্ধও সেখানে পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Man of conviction (প্রত্যয়বান মানুষ) বাঘের মতই হয়, সে sweet (মিষ্ট) না হ'লেও, invigorating (প্রেরণাসন্দীপী) তো হয়ই, মানুষ ঐ দেখেই moved হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা—Superficial dealings (বাহ্যিক চাল) দেখিয়েও তো অনেকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়, famous (খ্যাতিসম্পন্ন) হ'য়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (কতকটা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়ে)—তা' কখনও হয় না। আপনারা একটা case (দৃষ্টান্ত) খুঁজে বের করুন তো, যার principle-এ (আদর্শে) fanatic attachment (অটুট অনুরাগ) ব'লে কিছু নেই, অথচ সত্যিকার বড় হয়েছে, বহু মানুষের অন্তরে গভীর শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খাচ্ছেন আর কথা বলছেন, মাঝে-মাঝে তামাকের কতকটা ধোঁয়া মুখের মধ্যে পুরে নলটি মুখ থেকে সরিয়ে আস্তে-আস্তে ফুস-ফুস ক'রে ধোঁয়াটা মুখ থেকে বের ক'রে দিচ্ছেন। বালকের মত কৌতুকভরে নিজেই আবার স্বমুখনিঃসৃত ধোঁয়াটার পানে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। তামাকের গন্ধে ঘর আমোদিত, সেই সঙ্গে মিশে আছে তাঁর শ্রীঅঙ্গের সুবাস। পূবদিকের জানালা দিয়ে তরুণ অরুণের উজ্জ্বল আভা এসে লুটিয়ে পড়েছে তাঁর শুভ্র শয্যায়, সোনার বরণ তনু তাঁর আরো অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। সুধানিষ্যন্দী মধুর কণ্ঠে

কথা কইছেন তিনি। মধুময় গন্ধে, বরণে, গানে এক অভিনব মায়ালোক সৃষ্টি হয়েছে মাটির বুকে।

একটু পরে বিশ্বম্ভরভাই (শীল) আসলো শ্রীশ্রীঠাকুরের ক্ষৌরকর্ম্মের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্বম্ভরকে দেখেই বললেন—কি রে, তুই এর মধ্যেই চ'লে আইছিস? এত শীতে কামাবোনে কি ক'রে ?

বিশ্বম্ভর—গরম জল দিয়ে কামালে আপনার অসুবিধে হবে না। সেই বুধবারে কামিয়েছি, আজ শনিবার, তিন-চার দিনে দাড়ি কত বড় হ'য়ে গেছে। গরম জল দিয়ে কামিয়ে দিলে শীতও লাগবে না তেমন, আর কামান হ'য়ে গেলে আরামও পাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বেশ ! তবে আয় ! কী বলেন কেষ্টদা ! কাজটা সেরে নেওয়া যাক।

কেষ্টদা—হ্যাঁ ! তাই ভাল। আপনি কামিয়ে নেন, আমরা বসি।

বিশ্বম্ভর শ্রীশ্রীঠাকুরের আলাদা ক্ষুর, সাবান, ব্রাস, স্ট্রপ, তোয়ালে ইত্যাদি বের ক'রে প্রস্তুত হ'তে লাগলো। তোয়ালেটা শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় বেঁধে দিল। এরপর সে জলের জন্য ইতস্ততঃ করতে লাগলো, কারণ, জল গরম করতে সে কাউকে বলেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর অবস্থা বুঝে বললেন—যাই করিস্, তার জন্য প্রস্তুতি চাই, গোছান ব্যবস্থা চাই, কোন্‌টার পর কোন্‌টা লাগবে, সেটা যদি আগে ঠিক না রাখিস্, তাহ'লে তোরও অসুবিধা, যার করবি তারও অসুবিধা। যা ! তাড়াতাড়ি জলের ব্যবস্থা কর।

বিশ্বম্ভর গরম জলের জন্য ছুটে যাচ্ছে, এমন সময় কালিদাসীমা একটা বাটিতে ক'রে গরম জল নিয়ে এসে হাজির হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুব খুশি হ'য়ে একগাল হেসে বললেন—'না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে, সেই সে সেবক নাম'। একেই বলে অনুসন্ধিৎসু সেবা। মেয়েদের এই জিনিসটা খুব দরকার। মায়েদের মধ্যে এই অভ্যাস থাকলে ছেলেপেলেরাও imbibe (গ্রহণ) করে। কালিদাসীর অনেক জিনিস ধ'রে গেছে। অনুশীলনের উপর যদি থাকে আরো অনেক শিখবে। মানুষ অকালে মুরুব্বি যদি হয়, তাহ'লে আর এগুতে পারে না।

ঈষদাদা—আমি, নগেনদা ও ভূদেবদা টাকার জন্য মিলিত হয়েছিলাম মাতৃ-বিদ্যালয়ে, কিন্তু দেখলাম, টাকার জন্য জোট বাঁধালে সে মিল টেঁকে না, পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বাধেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sincerity (আন্তরিকতা) না থাকলে consolidation (সংহতি) হয় না। একটা গুণ্ডার দল বা ডাকাতের দল করতে গেলেও sincerity (আন্তরিকতা) দরকার, দলপতির প্রতি টান দরকার। যেখানে sincerity (আন্তরিকতা) সেখানেই consolidation (সংহতি)।

কেষ্টদা—পরস্পর বিরোধ-বিবাদ-বিসম্বাদের মূল কারণ হ'লো তিনটে—sex-complex (যৌন-প্রবৃত্তি), টাকাপয়সা ও অহমিকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sex-complex (যৌন-প্রবৃত্তি) হ'লো মূল, তার থেকেই অর্থলোলুপতা ও অহমিকা। মেয়েমানুষের জন্যই টাকা, মেয়েমুখতার জন্যই ইষ্টবিমুখতা, প্রবৃত্তিপরতন্ত্রতা এবং তদ্দরুনই অহমিকার উগ্রতা—আবার, তার ফলেই গণ্ডগোল। অনেকে বলে, বেঁচে থাকার জন্য টাকার প্রয়োজন, তাই টাকা চায়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখবেন—

'পুরুষ মাগে নারীর প্রণয়
নারী মাগে টাকা,
এমনি ক'রেই চলতি জগৎ
বাঁচা-বাড়ায় ফাঁকা।'

কথাটা খাঁটি। মেয়েমানুষের কাছে টাকার জন্য হোক্ খায়, শেষটা করে কী? যেন-তেন প্রকারে জোগাড় করতেই হবে। তখন আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। যার সঙ্গে বিরোধ বাধালে তার নিজের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার সঙ্গেই হয়তো বিরোধ বাধিয়ে বসে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। Sex-complex-এর (যৌন-প্রবৃত্তির) আওতায় প'ড়ে তখন ঐ অর্থের প্রয়োজনবোধটা তাকে আর সুস্থপথে পরিচালিত করে না, নিজের অজ্ঞাতে চলন তার unbalanced (সাম্যহারা) হ'য়ে যায়। সুস্থ মস্তিষ্কে, স্থির চিত্তে বিচার-বিবেচনা ও কর্ম্ম ক'রে প্রয়োজন মেটাবার সামর্থ্য অনেকটা নষ্ট হ'য়ে যায়। আবার, অহমিকা যে উগ্রভাবে এক-এক জনকে পেয়ে বসে, তার পেছনে অনেক সময় থাকে বিশেষ কোন মেয়েছেলের কাছে হিম্মতদার পুরুষ হিসাবে অধিষ্ঠিত থাকার বুদ্ধি। মেয়েছেলেটা হয়তো ওকে তত খাতির করে না, কিন্তু সে দেখাতে চায় তাকে যে, সে সমাজের দশজনের কাছে খুব একটা মস্ত মানী মর্য্যাদা-সম্পন্ন মানুষ। পরিবেশের কারও কাছ থেকে এ ব্যাপারে এতটুকু বাধা পেলেই সে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে ওঠে। হামবড়ায়ী চালে নিজের প্রাধান্য জাহির করতে উঠে-প'ড়ে লেগে যায়। এইভাবে যে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে সেটা বোঝে না। তার লঘুগুরু ভেদ থাকে না, আপনকে পর করতে, উপকারীর উপকার অস্বীকার করতে সে ডাইনে-বাঁয়ে

চায় না। ফল কথা, নিজের বাহাদুরীর জন্য, আত্মপ্রাধান্যের জন্য, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সে যা'-খুশি তাই করতে পারে। তাই, এদের নিয়ে চলতে খুব সাবধান। Wounded sex-complex (আহত যৌন-প্রবৃত্তি) থেকে যে ego (অহং) ও inferiority (হীনম্মন্যতা), তা' সর্পিল গতিতে মানুষকে জাহান্নমের সদর দরজায় নিয়ে হাজির করে। একরকম আছে ডাকারোখা অহঙ্কারী। তাদের একটা আত্মমুগ্ধতার ভাব থাকে, অন্যকে down (খাটো) ক'রে বড় হবার প্রবৃত্তি তাদের খুব একটা উগ্র হ'য়ে থাকে না। কিন্তু নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর খুব একটা বলিষ্ঠ আস্থা থাকে, সেটাকে আঘাত করলে তারা রীতিমত চটে যায়, সামনা-সামনি দু'কথা শুনিয়ে ছেড়ে দেয়। এরা কিন্তু লোক ভাল। এদের নিয়ে চলতে খুব অসুবিধা নেই, আর, এদের mould (নিয়ন্ত্রণ) করাও সহজ। তবে যার যে-দোষই থাক, শ্রেয়-অনুরাগে পরিশুদ্ধ হয় না, এমন দোষ জন্মায়নি পৃথিবীতে। শুনেছি St. Augustine (সাধু অগষ্টিন) নাকি মস্ত বড় rogue (বদমাইস) ছিল। সে কিন্তু এক father (ধর্ম্মযাজক)-এর প্রতি sincere attachment (একনিষ্ঠ অনুরাগ)-এর দরুন saved (উদ্ধার) হ'য়ে গেল, মস্ত saint (সাধু) হ'য়ে দাঁড়ালো, শুনেছি Christian world-এ (খ্রীষ্টান-জগতে) তাঁর position (মর্য্যাদা) হ'লো next to Christ (যীশুখ্রীষ্টের পরই)। তাই, যে যাই থাক, তার টানের মোড় ইষ্টের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই সব ফরসা।

খুব তোড়ের সঙ্গে আলোচনা চলছে, এমন সময় হঠাৎ একটি মা এসে বললেন—বাবা! ছেলেটা কেমন বেহুঁশ হ'য়ে পড়েছে, কাল রাত্রে খুব জ্বর হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর আলোচনা থামিয়ে ব্যাকুলভাবে বললেন—বেহুঁশ হ'য়ে পড়লো কেন রে? প্যারীকে নিয়ে যা, ভাল ক'রে দ্যাখ্। ও প্যারী!

প্যারীদা তখন একটু ঘরে গেছেন, তাঁকে ঘর থেকে ডাকা হ'লো।

প্যারীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর উদ্বেগ নিয়ে চিন্তিতভাবে বললেন—ও প্যারী! যা দেখে আয় তো, ওর ছাওয়াল বেহুঁশ হ'য়ে পড়লো কেন। কাল রাত্রে ব'লে জ্বর হয়েছে। দেখিস্ তো ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া নাকি। তাড়াতাড়ি ভাল ক'রে দেওয়া চাই। ওর জন্য যা' লাগে ব্যবস্থা করবি, নিজে না পারিস্ তো আমাকে বলবি।

উক্ত মায়ের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ২৪ পরগণা থেকে আগত একটি গরীবের ছেলে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধ'রে পড়লো—বাবা! আমার বড় পড়ার ইচ্ছা,

আমার বাবা নেই, বিধবা মা আছেন, তিনি পড়াতে পারেন না। আমি আপনার এখানে থেকে তপোবনে পড়ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে সস্নেহে বললেন—এখানে থাকবি তো! এখানে কিন্তু কষ্ট খুব। যদি স'য়ে থাকতে পারিস্, থাক্। ক্ষিতীশদার সঙ্গে দেখা করিস্।

ছেলেটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় খুব আশ্বস্ত হ'য়ে উঠলো।

বহিরাগত একজন আসলেন মেয়ের বিয়ের সমস্যা নিয়ে, তিনি বললেন—আমি কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব ব্রাহ্মণ, আপনার হাতে একটি ভাল ছেলে আছে, আপনি মুখে ব'লে দিলেই বিনাপণে মেয়েটিকে দিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ ছেলে?

উক্ত ভদ্রলোক—ছেলেটির বাড়ী ফরিদপুর। তাদের বাড়ীর সবাই সৎসঙ্গী, ছেলে নিজেও সৎসঙ্গী। তাঁরা বললেন—ঠাকুর যদি বলেন, তবে করব, আমাদের দাবিদাওয়া কিছুই নেই, কারণ, কন্যাপক্ষকে চাপ দিয়ে পণ বা যৌতুক আদায় করা ঠাকুর পছন্দ করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘর, বর সব দিক দিয়ে মিল যদি হয়, আর তারা যদি কাজ করতে চায়, সে তো ভালই। বয়স্থা মেয়েদের বিয়ে যত হ'য়ে যায়, ততই তো ভাল। আজকাল তো বামুন-কায়েতের মেয়ের বিয়ে দেওয়াই এক দুরূহ সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যা' হোক দেখবেন—ছেলের বংশ যেন আপনার থেকে নীচু না হয়। সমান-সমান যদি হয়, সেও বরং কিঞ্চিৎ নীচু ব'লে গণ্য হবার যোগ্য, আপনার বংশ থেকে কিছুটা উঁচু হয় সেইটা দেখবেন; তা' একান্ত সম্ভব না হ'লে সমান-সমান হওয়া চাই-ই। আর, ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য, বয়স, চরিত্র, প্রকৃতি, শিক্ষা ইত্যাদির সঙ্গতির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

উক্ত ভদ্রলোক—বংশের দিক দিয়ে ঠিকই আছে, ওরা আমাদের থেকে উঁচু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেশুনে যদি পছন্দ হয়, করেন গিয়ে।

উক্ত ভদ্রলোক—আপনি একখানা চিঠি লিখে দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যান যেন।

এর মধ্যে প্যারীদা এসে বললেন—দেখে তো আসলাম, আপনি যা' মনে করেছেন সত্যিই তাই, ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার case (রোগী), এখন তো অন্ততঃ ২০।২৫ টাকার ওষুধ লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিপদ! ও হরিপদ! পঁচিশটে টাকা দিবি লক্ষ্মী?

হরিপদদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে এখনই নিয়ে আয়।

হরিপদদা ঘর থেকে টাকা নিয়ে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্যারীর হাতে দে।

তারপর প্যারীদাকে বললেন—দেখাশুনো করার জন্য ভাল লোক মোতায়েন রাখিস্, আর তুই নিজে গিয়ে বার-বার খবর নিবি। বরফের দরকার হ'লে কাউকে ঈশ্বরদী পাঠিয়ে বরফ আনবার ব্যবস্থা করবি।

প্যারীদা—হ্যাঁ।

আলোচনার ধারা ব্যাহত হ'চ্ছে ব'লে অনেকেই বিরক্ত হচ্ছেন। ফাঁকে-ফাঁকে তাঁরা প্রশ্নাদি উত্থাপন করবার জন্যেও উসখুস করছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর সে-দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য না দিয়ে প্রপীড়িত, আর্ত্ত ও অর্থার্থীদের যারা এসে পড়েছে, তাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতেই ব্যস্ত। তা' না ক'রে তাঁর সোয়াস্তি নেই।

সবাই মনে করছেন এখনকার মত ঝামেলা কেটে গেল—এইবার আবার আলোচনাদি সুরু হবে।

এমন সময় শৈলমা এসে কোনদিকে লক্ষ্য না ক'রে হঠাৎ কেঁদে প'ড়ে বললেন —ঠাকুর, নিস্তারিণী আমাকে যা'-তা' ব'লে অপমান করে, এ কিন্তু আমি সইব না, আপনি এর প্রতিকার যদি করেন ভাল, নয় তো আমি কিন্তু ছাড়ব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আমি কী করব রে? তোকে নিস্তারিণী অপমান করে, আমি তার করব কী? তোকে খুব ভালবাসে কিনা, তাই তার অধিকার দেখায় তোর উপর। তা' তুই চটিস্ কেন? আর চটিস্ই যদি, তাকে বলিস্ না কেন? পাছে পিরীত চটে যায়, তাই তাকে বলতে সাহস পাও না, যত ঝাল আমার উপর ঝাড়, তাই না?

শৈলমা—ছাই ভালবাসি আমি ওকে, ওই ইল্লতের সঙ্গে আবার পিরীত?

শ্রীশ্রীঠাকুর (মধুর কণ্ঠে)—ওকে ছাড়াও তো তোমার চলে না।

শৈলমা (গব্বর্ভরে)—ওই তো আমার পোঁদে-পোঁদে ঘোরে। আমি ওকে থোড়াই কেয়ার করি। (সকলের হাস্য)

এরপর ইয়াদালি (গ্রামস্থ মুসলমান) এসে জানালো—তার একখানা ঘর তোলা দরকার, সাহায্যের প্রয়োজন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ভবানীদাকে (ক্যাশিয়ার, সৎসঙ্গ ফিলান্থ্রপি অফিস) ডাকিয়ে তাকে প্রয়োজনমত সাহায্য করতে বললেন। নিরন্তর চলেছে তাঁর এই দান। সেবা, সম্পোষণা, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, পথ্য, অর্থ, শিক্ষা, সদুপদেশ ইত্যাদি সব্বর্প্রকার বাস্তব সাহায্য-দানে তিনি জাতিধর্ম্ম-নির্বিবশেষে প্রত্যেকটি প্রয়োজন-পীড়িত নরনারীকে অক্লান্তভাবে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ

ক'রে চলেছেন। অজস্র, অবিরাম তাঁর এই অবদান। নিজের শরীরে মানুষের কোন ক্ষত হ'লে মানুষ যেমন তা' সারাবার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগে, প্রত্যেকটি ব্যক্তির যে-কোন প্রকার দুঃখ-ব্যথা দেখে তার নিরসনের জন্যও তিনি মরিয়া হ'য়ে ওঠেন।

তাঁর প্রধান কাজ হ'লো ধর্ম্মদান, যার ভিতর-দিয়ে মানুষ ঈশ্বরমুখী হ'য়ে ওঠে, ইষ্টপ্রাণ সেবামুখর হ'য়ে ওঠে, যোগ্য হ'য়ে ওঠে জীবনে। তাঁর সক্রিয় ঈশ্বরনিষ্ঠ লোককল্যাণব্রতী জীবনই আজ সৎসঙ্গ-আন্দোলনে রূপায়িত। তাঁর জীবনধারাই লক্ষ-লক্ষ নরনারীর জীবনকে স্পর্শ ক'রে, প্রভাবিত ক'রে ইষ্ট, অহং ও পরিবেশের সমন্বয়ে এক নূতন সঙ্গতিমুখর প্রেমপ্রতুল জগৎ রচনার কাজে অমোঘভাবে এগিয়ে চলেছে।—সে-জগতে "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।" এই নূতন জগতের ধারক, বাহক, রক্ষক ও প্রমূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি স্বয়ং। তাই দেখতে পাই, সব থেকেও নিজের জন্য তাঁর কিছুই নয়। তাঁর জ্ঞান, গুণ, শক্তি, সামর্থ্য, সময়, যা'-কিছু সবই ঈশ্বরের জন্য, মানুষের জন্য। নিজের বলতে তাঁর কিছুই নেই। 'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই, তুমি তাই পবিত্র সদাই।' মানুষের অন্তরের স্বতঃ-উৎসারিত বাস্তব অবদান তাঁ'তে অর্ঘ্যান্বিত হ'য়ে ধন্য হ'তে আসে, কিন্তু তার এক কপর্দ্দকও তিনি স্পর্শ করেন না, সবই ব্যয়িত হয় প্রয়োজন-পীড়িত মানুষের জন্য। বিশ্বম্ভর তিনি, বিশ্বকে ভরণ করার আকূতি তাঁকে কিছুতেই ছাড়ে না। তাই স্বতঃই যা' আসে, তা'ও ফিলানথ্রপির মাধ্যমে লোককল্যাণে ব্যয়িত হয়ই। তাছাড়া, নিত্য ভিক্ষা ক'রেও কি তিনি কম লোকের অভাব মেটান? তবে, যখন যার জন্য বা যে-জন্য যাকে দিয়ে যা' সংগ্রহ করেন, কারও মাধ্যমে তাকে তা' দিয়ে দেন। নিজ হাতে পয়সা ছোঁন কমই। এত ভিক্ষা করেন তিনি, কিন্তু নিজের জন্য চান না তিনি কিছুই। তিনি নিজেকে নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিয়েই খুশি। পরমপুরুষই যা'-কিছু হ'য়ে আছেন, প্রতি দেহে দেহী তিনিই, প্রান তাঁর পরিব্যাপ্ত ঘটে-ঘটে। তাই প্রত্যেকের উপভোগের মধ্য-দিয়েই যেন তাঁর প্রকৃষ্ট আত্মোপভোগ—যেমন, ভাল জিনিসটা নিজেরা না খেয়ে সন্তানকে খাইয়েই তার আস্বাদটা বেশী ক'রে উপভোগ করেন মা-বাপ। এই উপভোগের নেশাই তাঁকে ধাবিত ক'রে চলেছে পরিবেশের সর্ব্বতোমুখী সুখ, সন্তোষ ও কল্যাণ সাধনে। 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' কথাটার মানে কী, তা' তাঁর জীবন দেখলেই বোঝা যায়।

এমনতর লোকস্বার্থী পুরুষকে কেন্দ্র ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠায় সৎসঙ্গের আওতায় জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দীক্ষিত-অদীক্ষিত কত লোক আজ সুখে-

স্বাচ্ছন্দ্যে পরম নির্ভাবনায় আনন্দে জীবন যাপন করছে। সৎসঙ্গ ফিলান্থ্রপি, ঋত্বিক্‌সঙ্ঘ, স্বস্তি-সেবকসঙ্ঘ, দাতব্য চিকিৎসালয়, তপোবন বিদ্যালয়, বিজ্ঞানালয়, কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌, মেকানিক্যাল ওয়ার্কস্‌, ইঞ্জিনীয়ারীং ওয়ার্কস্‌, প্রেস, আর্ট ষ্টুডিও, কুটির-শিল্পবিভাগ, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি প্রত্যেকটি জনকল্যাণ-প্রতিষ্ঠান (যা' প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে স্বতঃ-উৎসারণায় তাঁকে কেন্দ্র ক'রে) ও লক্ষ-লক্ষ ইষ্টপ্রাণ সেবাব্রতী সৎসঙ্গীর সেবালাভে সম্পুষ্ট হচ্ছে তারা। সর্ব্বোপরি আছে সৎসঙ্গের জীবন্ত-বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেম, প্রেরণা, প্রয়োজনোপযোগী সেবা ও দেবত্ব-উদ্দীপী পরশ। তাঁর স্পর্শে কত জীবন যে আজ ভাগবতচেতনায় উন্নীত হ'য়ে উঠছে, তার লেখাজোখা নেই। পৃথিবীতে এক নূতন দৈবী-সংহতির অভ্যুদয় হ'চ্ছে তাঁকে আশ্রয় ক'রে। তাই কেবলই মনে হয়, এমনতর প্রেমজ্ঞানমূর্ত্তি নিখিলস্বার্থী কোন মানুষ যদি আজ বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারের নিয়ামক হ'য়ে থাকতেন তাহ'লে পৃথিবীতে মানুষের জীবন কতই না সুখ, শান্তি ও আনন্দময় হ'য়ে উঠতো ; হয়তো আজকের মত যুদ্ধবিগ্রহ, পারিবারিক বিদ্বেষ ও স্বার্থ-সংঘাতের উদ্ভবই হ'তো না।

এরপর খলিলদা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আদর ক'রে খলিলদাকে ডেকে বসালেন।

খলিলদার দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—আজকাল নামটাম খুব করছেন, তাই না খলিলদা ?

খলিলদা—আর তো কোন কাজকর্ম্ম নেই, যতটা পারি করি, আর বেশ ভালই লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেপে নাম-ধ্যান যদি করা যায়, আর কিছু না হোক, শরীর ভাল হবেই।

খলিলদা—মনটা খুব ভাল থাকে, তাই তার জন্য শরীরও ভাল হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারই দেখেন না ! এসেছিলেন কেমন শুটকি চেহারা নিয়ে, অল্প কয়দিনে কেমন নধরকান্তি হ'য়ে উঠিছেন। খুব চেপে করেন। কী পেলেন না-পেলেন, দেখলেন না-দেখলেন, সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে মনের আনন্দে নেশার মত ক'রে যান। অবসাদের ভাব আসলেও ছাড়বেন না, দাঁড় টেনে চলবেন। দেখবেন—স্তরের পর স্তর অতিক্রম ক'রে আপসে-আপ কতদূর এগিয়ে যাবেন।············(শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে মিষ্টি হেসে অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন)—আচ্ছা খলিলদা ! মোস্তাফা-চরিতে ও কোরাণে যে নূর ও আওয়াজের কথা পড়েছেন, তার সঙ্গে মিল পান না ?

খলিলদা—হুবহু মিল, আগে তো মনে হ'তো ওসব আজগবী ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো একে বলে বিজ্ঞান। যে করবে, সেই পাবে, তারই হবে। সব শেয়ালের এক রা, যুগে-যুগে একই কথা, দেশকাল-পাত্রোপযোগী ক'রে বলা। তবে ঐ নবীর প্রতি আনুগত্য চাই, নবীকে বাদ দিয়ে রসুলকে বাদ দিয়ে খোদার রাজ্যে পৌঁছাবার উপায় নেই। রসুলকে বুঝতে গেলে আবার বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত রসুলসেবী যে, খোদাসেবী যে, তাঁর সান্নিধ্যে আসতে হয়। তা' না হ'লে কিন্তু বোধই গজায় না।

খলিলদা—সে আমি আমার নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর মসগুল হ'য়ে অনর্গল ব'লে চলেছেন। আয়ত আঁখি-যুগলে স্নেহ-করুণার পীযূষ-ধারা, মুখ-মণ্ডলে আনন্দের দীপ্তি, অধর-পল্লবে লাবণ্য-মণ্ডিত হাসির বিজলী-রেখা, কণ্ঠস্বরে ললিত গাম্ভীর্য্য, প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গীতে তাঁর মোহন-মাধুর্য্য, ক্ষণে-ক্ষণে অভিব্যক্তিতে তাঁর লীলায়িত বৈচিত্র্য, মনভোলান, ক্ষণভোলান, ভুবনভোলান অপরূপ চরিত্র-ঐশ্বর্য্য নিয়ে রাজ-অধিরাজ ব'সে আছেন সম্মুখে, কার সাধ্য আছে তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরায়? তাই মোহিত হ'য়ে, ভাববিভোর হ'য়ে, তদেকচিত্ত হ'য়ে তাঁর অনবদ্য কথামৃত আকণ্ঠ পান করছেন সমবেত ভক্তবৃন্দ, অনির্ব্বচনীয় সুধা-সমুদ্রের অতলে তলিয়ে গিয়ে খানিকটা সময়ের জন্য দুনিয়ার দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলে গেছেন তাঁরা, পুণ্য-সঙ্কল্পের উগ্র আবেগে টলমল ক'রে কাঁপছে তাঁদের সারাটি সত্তা।

অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—মূল সংঙ্কল্প আমরা যেমনভাবে গ্রহণ করি, ভবিষ্যৎ কাজ কি তারই উপর নির্ভর করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংঙ্কল্প মানে শুধু মানসিক চিন্তা নয়, ওর অর্থ চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে যোগ্যতায় চলা। সঙ্কল্প মানে নূতন সৃষ্টির আবেগময় কর্ম্মমুখর পরিকল্পনা, কী করতে হবে, কেমন ক'রে করতে হবে তার একটা চিত্র মাথায় এঁকে নিয়ে তার উদ্‌যাপনে যখন আমরা বিধিবদ্ধ প্রণালীতে চলি, তাকে বলা যায় সঙ্কল্পের পথে চলা। সঙ্কল্প যখন আমাদের পাকা হয়, তখন কোনরকম প্রতিকূলতা আর আমাদিগকে তা' থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে কমই পারে, আমরা তখন নাছোড়বান্দা হ'য়েই লাগি। অবশ্য যা' তা' সংঙ্কল্প করলে হবে না, সঙ্কল্প হওয়া চাই শুভ-সন্দীপী, ইষ্টার্থ-পোষণী। এমনতর সঙ্কল্প নিয়ে যখন চলি তখন আমাদের চরিত্র ও বুদ্ধিবৃত্তি উৎকর্ষ লাভ করে। কারণ, তখন বাধাবিঘ্নকে জয় ক'রে, অতিক্রম ক'রে, নিয়ন্ত্রিত ক'রে, কাজ হাসিল করা আমাদের কাছে একটা স্ফূর্ত্তির ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়।

প্রফুল্ল—দুর্ব্বলতা কি রক্তবীজের ঝাড়ের মত ? কিছুতেই যে যেতে চায় না, এক-এক স্তরে এক-এক ভাবে আবির্ভূত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্ব্বলতা যেমন রক্তবীজের ঝাড়, পারগতাও তেমনি রক্তবীজের ঝাড়—একটা মরণের property (সম্পদ্) আর-একটা তরণের property (সম্পদ্), যেটাকে nurture (পোষণ) দাও, সেইটাই বাড়বে। পারগতার পথ খোলাই আছে, চললেই হয়, করলেই হয়। এক পা এগুলে, দশ পা এগুবার পথ পরিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব্বের অকামগুলি বাধা সৃষ্টি করবেই, তা'তে ঘাবড়াতে নেই। যা' করণীয়, ফিঙ্গে হ'য়ে লেগে যদি করতে থাক—চলার পথে ভুলগুলিকে শুধরে-শুধরে—তবে কিছুদিন পরে দেখতে পাবে ঐ চলনই তোমার অভ্যাসগত হ'য়ে উঠেছে, তখন আর অতো কষ্ট হবে না। হাতিঘোড়া কিছু না, করলেই হয়। জীবনের ধর্ম্ম বাঁচা-বাড়া, ভগবান আমাদের সব সম্পদ্ দিয়ে দিয়েছেন যা'তে আমরা বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি। যত অকামই ক'রে থাকি, যত দুর্ব্বলতাই আমাদের ঘিরে ধরুক, সবলতাই আমাদের সহজাত সম্পদ্। যে-কোন অবস্থায় ইচ্ছা করলে, লহমায় আমরা চলনার মোড় ফিরিয়ে ঝেড়ে দাঁড়াতে পারি, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্ব্বদাই তাঁর শক্তি নিয়ে আমাদিগকে বাঁচার পথে চলতে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কোন ভাবনা নেই, লেগে যাও, সব ঠিক আছে। আমাদের cell (কোষ)-গুলি leaden jar (সীসার পাত্র)-এর মত, energy (শক্তি) stored up (সঞ্চিত) থাকে, যত করবে, তত পারবে। প্রত্যেকটা করা তার effect (ফল) রেখে যাবে। শুনেছি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে মেধানাড়ী গজায়। ব্রহ্মচর্য্য মানে—বৃদ্ধির পথে চলা, ইষ্টের পথে চলা। ইষ্টের পথে চলতে-চলতে মানুষের বেভুল চলন, বিভ্রান্ত চলন, বিস্মৃত চলন খতম হ'য়ে যায়, ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি তার এমনই মজ্জাগত হ'য়ে ওঠে যে কিছুতেই তা' থেকে বিচ্যুত হয় না, ও-সম্বন্ধে খেয়াল-হারা হয় না সে কখনও, ঐ স্মৃতি-চেতনা তার টনটনে থাকে ; ভুলেও সে অন্য চলনে চলে না, বেচালে পা পড়ে না তার কখনও, তার অবগুণ যদি থাকে, তাকেও ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার কাজে লাগায় তখন। তাই বলেছেন, মেধানাড়ী গজায় অর্থাৎ ঐ স্মৃতি, ঐ ধৃতি স্বভাবগত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ তা'তে জাগ্রত ও সক্রিয় থাকে।

একটু থেমে ইন্দুদার (বসু) দিকে স্নেহল দৃষ্টিতে চেয়ে মনোহর ভঙ্গীতে বললেন—সপ্রতিনিধি তোমরা সবাই যদি তপস্যাপূত পরিশ্রমের উপর থাক ও ছাত্রদেরও অমনতর পরিশ্রমের উপর রাখ, তবে আশ্রম ও তপোবন নাম সার্থক

হবে। তখন বলতে পারবে—'মানুষ হতেছি পাষাণের কোলে, যোগ্য হতেছি কাজে'। (একটু ঘুরে ব'সে উল্লাসব্যঞ্জক দৃপ্তকণ্ঠে বললেন)—কিছু ভাবনা নেই, আবার সব টেনে তুলবোনে চচ্চড় ক'রে।

সবার মুখে তখন আনন্দের হাসি ফুটে উঠেছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে সস্নেহে টাল্লুস-টুল্লুস ক'রে এর-ওর মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন—চোখে-মুখে তাঁর চতুর-চপল মনমাতানো ইশারা ও ইঙ্গিত। সবার মন খুশিতে ভরা। একটা খুশির তরঙ্গ ঢেউ খেলে যাচ্ছে তাম্বুর মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ক'টা বাজে রে?

একজন বললেন—৭টা।

শ্রীশ্রীঠাকুর খানিকটা চিন্তিতভাবে বললেন—ভোলানাথদার আজ আসার কথা ছিল আমনুরা প্যাসেঞ্জারে, এখনও তো আসলো না।

শরৎদা (হালদার) বললেন—এখনও আসবার সময় যায়নি, কোন-কোন দিন ট্রেন 'লেট' থাকে, আবার 'বাসে'ও অনেক সময় দেরী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জানি? কারও আসবার কথা থাকলে, সময় মত না আসলে, আমার বড় দুশ্চিন্তা হয়। ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখলে ডরায়।

কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে এমন সময় ভোলানাথদা (সরকার) এসে হাজির হলেন।

ভোলানাথদাকে দূর থেকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ক'রে সোল্লাসে ব'লে উঠলেন—আইছেন ভোলানাথদা! ওরে আমার মাণিক রে! আমি তো ভেবে-ভেবে সারা। কেবল ভাবছি—এত দেরী হ'চ্ছে কেন?

ভোলানাথদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জুতো খুলে প্রণাম ক'রে হাসিমুখে বললেন—আজ গাড়ী একটু 'লেট' ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে)—যাক, এসে তো গেছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—চলতে-চলতে মানুষের energy ঢলঢলে হ'য়ে যায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যত বিকেন্দ্রিক, অর্থাৎ Ideal-কে (আদর্শকে) ধরণ (ধরা) যার যত কম, জীবন তার তত কম। কারণ, মানুষকে হয় আদর্শের পথে চলতে হয়, না-হয় প্রবৃত্তির পথে চলতে হবে, এ-ছাড়া কোন তৃতীয় পন্থা নেই। প্রবৃত্তির পথে মানুষ যত চলে, তার energy (শক্তি) তত dissipated (অপব্যয়িত) হয়, তাই লাভজনক যা', জীবনীয় যা' তেমনতর ব্যাপারে সে স্বতঃই শ্লথ হ'য়ে ওঠে। প্রবৃত্তি তার সত্তার রস খেয়ে শুষে নিয়ে যায়, তাই সত্তা-

সম্বর্দ্ধনী প্রচেষ্টায় তার খাঁকীত এসে পড়ে। ধর, তোমার শরীরে যদি রক্তক্ষয়ী কতকগুলি রোগজীবাণু এসে বাসা বাঁধে, তখন তারা তোমার রক্ত খেয়ে নিয়ে পুষ্ট হ'তে থাকবে, এর ফলে তোমার শরীর-পোষণোপযোগী রক্তে কমতি পড়বে। এ হ'তে বাধ্য। Ideal-centric urge (ইষ্টকেন্দ্রিক আকূতি) হ'লো মানুষের সমস্ত শক্তির উৎস। ঐ urge (আকূতি) না থাকলে energy (শক্তি) থাকে না, energy (শক্তি) না থাকলে depressed (অবসন্ন) হয়, অপটু হয়।

কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে, এমন সময় আলিমদ্দি (গ্রামস্থ জনৈক মুসলমান) আশ্রমের উপর দিয়ে রস নিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে দেখে বললেন—দাঁড়া। তোর ভাঁড়ে কী?

আলিমদ্দি—রস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল আছে তো?

আলিমদ্দি—জে, ভাল আছে। পেরথম কাটের রস, মধুর মত মিঠে, আর দেখতিও খুব পরিষ্কার। এই দেখেন (এই ব'লে ভাঁড় নিয়ে সামনে এগিয়ে আসলো)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাল তো মনে হয় তোফা মাল। ও বুপু! খাবি নাকি?

শৈলমা—এত সকালে খাব? মুখটুক যে ধুইনি, কাপড় ছাড়িনি, ইষ্টভৃতি করিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে পাগল! খাবি তো তাড়াতাড়ি সা'রে আয়। (চোখ-মুখ ঘুরিয়ে) এমন বাহারের মাল আর পাবি না।

শৈলমা—দেরী হবে যে। আজ থাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আলিমদ্দি তুই যা। ও তো খাবে না।

আলিমদ্দি প্রস্থানোদ্যত।

শৈলমা—আমি বলছিলাম—একটু দেরী হবে, অতো সময় কি ও দাঁড়াবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই বল! তোর খাবার ইচ্ছে আছে। অমন ঢং করিস্ কেন? যা, খাবি তো তাড়াতাড়ি আয়।

শৈলমা চকিতে ঊদ্ধ'শ্বাসে দৌড় মারলেন। সকলে হাসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সেই সঙ্গে হাসছেন।

একটু বাদেই শৈলমা এসে হাজির হলেন—একটা ঘটি নিয়ে।

আলিমদ্দি রস ছেঁকে এক ঘটি ভ'রে দিল। শৈলমা ঢকঢক ক'রে খেয়ে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও উপস্থিত সকলেই তৃপ্তিভরে দেখতে লাগলেন।

ও আলিমদ্দি! আর-এক ঘটি লাগাও।—হেসে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

আলিমদ্দি আর-এক ঘটি দিল।

শৈলমা সে-ঘটিও ধীরে-ধীরে নিঃশেষ ক'রে ফেললেন। খেয়ে-দেয়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চলুক!

শৈলমা ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—আর না ঠাকুর! আর পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিষ্টি কেমন?

শৈলমা—খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন জিনিস রোজ পাবি না। প্রাণডা ভ'রে খেয়ে নে।

শৈলমা—না! আর পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ তো জলের মত। প্রস্রাব হ'য়ে বেরিয়ে যাবে। আর-এক ঘটি রেখে দে। এখন না হয় পরে খাবি।

শৈলমা—তা' রাখা যায়।

আলিমদ্দি আর-এক ঘটি দিয়ে বিদায় নিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিত করতেই একটি দাদা আলিমদ্দিকে রসের দামটা দিয়ে দিলেন।

নগেনদা (বসু)—আমার কী হ'লো, আমি তো অধঃপাতে চললাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গেলে ঠেকাবে কে? না গেলেই হয়! 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে, ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি', (সঙ্গ থেকে কামনা আসে, কামনা থেকে আসে ক্রোধ, ক্রোধের থেকে আসে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে আসে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ থেকে মানুষ নষ্ট পায়)—এই একদিকে যেমন আছে, আবার আছে—সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া দৃষ্টিশুদ্ধতা, দৃষ্টিশুদ্ধেঁহি বিশ্বাসঃ, বিশ্বাসাৎ নির্বিবচারতা, নির্বিবচারাৎ ভবেৎ প্রেম, প্রেম্নশ্চাত্মসমর্পণম্' (সঙ্গ থেকে আসে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা থেকে আসে দৃষ্টিশুদ্ধতা, দৃষ্টিশুদ্ধি থেকে আসে বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে আসে নির্বিবচারতা, নির্বিবচারতা থেকে প্রেমের উদয় হয়। প্রেমের পরিণতি আত্মসমর্পণে): আপনি টাকার জন্য কাম করেন, তাই টাকা হয় না, কিন্তু মানুষের যদি interest (স্বার্থ) হ'য়ে উঠতে পারতেন, তা'তে সব হ'তো। তাই ব'লে টাকার লোভে যদি তা' করতে যান, তবে হবে না। মনে পড়ে সেই কাঠুরিয়ার গল্প? কাঠ কাটতে-কাটতে তার কুড়োল প'ড়ে গেল জলে, সে তখন জলদেবতার কাছে কেঁদে

প্রার্থনা করতে লাগলো। ঠাকুর! আমি গরীব মানুষ, কাঠ কেটে খাই, কুড়োলটা গেলে আমি না-খেয়ে মরব, আর-একটা কুড়োল কেনবার সাধ্যও আমার নেই। দয়াল ঠাকুর! তুমি দয়া ক'রে আমার কুড়োলটা ফিরিয়ে দাও। তুমি ইচ্ছা করলে সব পার। আমায় তুমি দয়া কর। জলদেবতা তখন এক সোনার কুড়োল হাতে নিয়ে জল থেকে উঠে এসে বললেন—তুমি দুঃখ ক'রো না, এই নাও তোমার কুড়োল। কাঠুরিয়া তখন কেঁদে বললো—প্রভু! এ কুড়োল দিয়ে আমি করবো কী? এতে তো কাঠ-ফাড়া চলবে না। আর, এ তো আমার কুড়োল নয়। আমি এ নিই কি ক'রে? এরপর জলদেবতা বললেন—আচ্ছা! তাহলে তোমার কুড়োল নিয়ে আসছি। জলে ডুব দিয়ে এইবার তিনি এক রূপোর কুড়োল নিয়ে এসে হাজির হলেন। কাঠুরিয়া বিনীতভাবে বলল—ঠাকুর, এ কুড়োলও তো আমার নয়। আপনাকে কী-ই বা বলি? আপনি যখন সদয়ই হয়েছেন আমার প্রতি, আমার কুড়োলখানা দিন। এইবার জলদেবতা কাঠুরিয়ার নিজস্ব কুড়োল নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—এই কুড়োল তোমার? কাঠুরিয়া মহাখুশি হ'য়ে বললো—হ্যাঁ! এই কুড়োলই আমার। তখন জলদেবতা তার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে তিনখানি কুড়োলই তাকে দিয়ে গেলেন। তাই শুনে আর-একজন ফন্দী ক'রে জলে কুড়োল ছুঁড়ে ফেললো। কুড়োল ফেলে দিয়ে জলদেবতাকে ডাকতে লাগলো। জলদেবতা একটা সোনার কুড়োল এনে জিজ্ঞাসা করলেন—এই কুড়োল তোমার? সে অমনি বললো—হ্যাঁ। এইটেই আমার। তখন দেবতা অন্তর্হিত হ'লেন। তার নিজের কুড়োলটা পর্য্যন্ত সে পেল না। তাই লোভের পথে চলা, অসাধুতার পথে চলা মানেই আত্মপ্রবঞ্চনা করা। বেকুব-বেহেড যারা তারাই অমন ক'রে থাক। যাদের এতটুকু মাথা আছে তারাই পরার্থকে স্বার্থ ক'রে নেয়, সততার পথে চলে, ক'রে পেতে চায় তারা।

ক'রে পাওয়ার কথা শুনে যারা ঘাবড়ে যায়, বুঝতে হবে তাদের মগজে ঘুণ ধ'রে গেছে, তাদের চিকিৎসার প্রয়োজন। অর্থাৎ টেনে-হেঁচড়েও তাদের কাজের মধ্যে নামাতে হবে, আর পেছনে লেগে থেকে কাজের মধ্য-দিয়ে তাদের কৃতিত্বে পৌঁছে দিতে হবে। Nothing succeeds like success (সাফল্যের মত সফল হয় না আর কিছুই)। সাফল্যের একটা নেশা আছে। একবার যদি মানুষ কৃতকার্য্য হয়, তার ভিতর-দিয়ে তার একটা আত্মপ্রসাদ আসে। নানাব্যাপারে তেমনতর আত্মপ্রসাদলাভে ধন্য হ'তে চায় সে।

আবার, দেওয়ার ফন্দি-ফিকির যদি কারও মাথাও থাকে, তবে সে নষ্ট পায় না। গুরুজনকে দেওয়ানর অভ্যাস ছোটবেলা থেকে ক'রে দিতে হয়। মা

শেখাবে বাপকে দিতে, বাপ শেখাবে মাকে দিতে—আলুটা, পটলটা, ফুলটা, ফলটা, পাতাটা, নুড়িটা, কুলটা কিংবা যাই-ই হোক। আবার, ছেলেপেলে কিছু দিতে আসলে বাহবা দিয়ে আগ্রহভরে সেটা নিতে হয়। মাকে যখন দিতে আসবে, মা উসকে দেবে বাবাকে দেবার জন্য, বাবাকে যখন দিতে আসবে, বাবা চেতিয়ে দেবে মাকে দেবার জন্য। মায়ের অসাক্ষাতে বাবা সন্তানের কাছে তার মায়ের কথা এমন লোভনীয় ক'রে বলবে যে মায়ের জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসায় তার বুকখানা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। আবার, মা-ও অমন ক'রে বাবার সম্বন্ধে বলবে। এমন ক'রে ভালবাসার প্লাবন যদি এনে দিতে পার তাদের জীবনে, দেখবে কত সুখী হবে তারা, কত সুখী হবে তোমরা, প্রত্যেকটা বাড়ী-ঘর তখন দেব-দেউল হ'য়ে উঠবে। এ কি আমার পাগল আশা? এতটুকু আশা করা কি আমার অন্যায়?

তাঁর চোখ-মুখ যেন আবেগে ফেটে পড়ছে। সকলের অন্তর ভাবের আতিশয্যে দুলে-দুলে উঠছে—

এইবার তিনি আপন মনে গান ধরেছেন—

'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে?
আঁধারের তারা যত অবাক হ'য়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল,
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে।'

গানের পর শিক্ষা-সম্বন্ধে আবার কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর সহজভাবে বলছেন—পাঁচ বছরের মধ্যে অভ্যাস, ব্যবহার, ঝোঁক ঠিক ক'রে ছেলেদের সাশ্রয়ী সুন্দর অর্জ্জনপটু ক'রে তুলতে হয়।.........স্বামীর যদি স্ত্রীর প্রতি স্নেহল মমত্বপূর্ণ ভাব থাকে, তা'তে তার sexual life (যৌন-জীবন) অনেকখানি adjusted (সুনিয়ন্ত্রিত) হ'তে থাকে, abnormal sexual urge (অস্বাভাবিক যৌন-সম্বেগ) থাকে না, অন্য মেয়েদের প্রতিও তার normal attitude (সহজ ভাব) আসে, এতে দাম্পত্য-জীবন মধুর হ'য়ে ওঠে। অবশ্য, মা'র তো ছেলের বাপের প্রতি অর্থাৎ তাঁর স্বামীর প্রতি ভক্তি থাকা

চাই-ই। পিতামাতার দাম্পত্য-জীবন যেখানে যত সুন্দর, সন্তানও সেখানে তত সব দিক্ দিয়ে ভাল হ'য়ে ওঠে, অবশ্য বিয়েটা ঠিক মত হওয়া চাই। আর, with every emphasis (সমস্ত জোর দিয়ে), with every urge (সমস্ত আকূতি দিয়ে), with every attitude (সমস্ত ভাব দিয়ে), with every expression (সমস্ত অভিব্যক্তি দিয়ে) বাঞ্ছিতপ্রাণতা effulge (প্রোজ্জ্বল) ক'রে দেওয়াই education-এর (শিক্ষার) মূল। Ideal-centric urge (ইষ্ট-কেন্দ্রিক আকূতি) আস্‌লে সবার character (চরিত্র) ফুটে উঠবে, একটা ছেলেও inferior (নিকৃষ্ট) থাকবে না, মিসমার কাণ্ড হ'য়ে যাবে।

একটু আগে আদিত্য ও মণ্ডাই (গোপালদার ছেলে) এসে দাঁড়িয়েছে। মণ্ডাই ফুটফুটে ছোট্ট ছেলেটি, গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রবীণ লোকের মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের সুরে পর-পর তিন বার বললেন—মুণ্ডু রাজার গালে হাত, মুণ্ডু রাজার গালে হাত, মুণ্ডু রাজার গালে হাত।

মণ্ডাই হাসতে লাগলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদিত্য, মণ্ডাইয়ের মধ্যে গোপালের ভাবটা টের পাওয়া যায়। এখনি যেন ঝুন দেয়।·········বড়খোকা, মণি, কাজল—এদের প্রত্যেকের মধ্যে লক্ষ্য করলেই আমাকে দেখতে পাবেন। এদের প্রত্যেকেরই দেখতে পাবেন সবার উপর খুব দরদ। কাজল যে অতটুকু ছেলে, ওর সামনে সেইদিন কামলারা বাঁশ কাটছে, ও তাই দেখে অস্থির, তাদের বারণ করে, বলে ব্যথা লাগছে, কেটো না, আবার ওর মাকে বলে—মা বাঁশটাকে মিনু দাও, ওর গা কেটে দিচ্ছে।

কেষ্টদা—ওদের রকমই আলাদা। বড়খোকার গোপন দানের লেখা-জোখা নেই। নিজে না খেয়ে মানুষকে খাওয়ায়, এত কষ্ট ক'রে থাকে ছেলেপেলে নিয়ে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, প্রার্থী এসে ওর সামনে দাঁড়ালেই হ'লো।

এরপর কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুকে মানুষ ভাবা নিষেধ কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে urge (আকূতি) ক'মে যায়, তাই ব'লে অমানুষ ভাবতেও বলেনি। ওই অজুহাতে তাঁর দুঃখ-ব্যথায় আমরা যদি বিচলিত না হই, এবং তার নিরাকরণের চেষ্টা যদি না করি, যেমনটা আমরা প্রিয়জনের বেলায় ক'রে থাকি, তাহ'লে কিন্তু সেটা হবে ভণ্ডামি। তাই, মনগড়া ধারণা আরোপ না ক'রে, ভালবাসলে যেমন করে, তেমন করাই ভাল। এর সঙ্গে-সঙ্গে সাধন-ভজনও নিয়মিত করা চাই। এর মধ্য-দিয়ে তত্ত্বতঃ তিনি কী ধীরে-ধীরে ফুটে উঠবে। আমাদের দেশে গুরুজন অনেককে বলে ঠাকুর, তার মানে তিনি ঠোক্কর লাগান,

আবার টান থাকলে ঠোক্করের ফলে আমাদের complex (প্রবৃত্তি)-গুলি profitably (লাভজনকভাবে) adjusted (সুনিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠে with every meaning (সমস্ত অর্থ নিয়ে)।

কথায়-কথায় কেষ্টদা cultural conquest (কৃষ্টিগত বিজয়) সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—University (বিশ্ববিদ্যালয়), থিয়েটার, সিনেমা, পুস্তকালয়, খবরের কাগজ, রেডিও, সভা-সমিতি এবং অন্যান্য যে-সব স্থান cultural conquest (কৃষ্টিগত বিজয়)-এর মূল ঘাঁটি, সে-সবগুলি mould (পরিবর্ত্তন) করুন, খুব ক'রে যাজন চালান, বেতাল কথা শুনলেই ডাঙ্গস মারুন, আর তা' যেন হৃদ্য হয়।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের আদর্শ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবহার হবে, enchanting (মনোমুগ্ধকর), invigorating (উদ্দীপনী)। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমনটি আমি অন্যের কাছ থেকে চাই তেমনটি অন্যের প্রতি করছি কিনা।

এরপর সংহতি-সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক আদর্শে অনুরতি-সম্পন্ন হ'লে তারা সংহত না হ'য়ে পারে না, প্রত্যেকে প্রত্যেককে মানিয়ে নিয়ে চলে। সতীনের যদি কোন দোষ-ত্রুটিও থাকে, কিন্তু স্বামীর প্রতি যদি সে সেবামুখর ও টানসম্পন্ন হয়, তবে সতী-স্ত্রী স্বামীর স্বার্থের দিকে চেয়ে, তার সব দোষ সহ্য করে। আবার, সতী যে, তার সব কাজ-কর্ম্ম, এমন-কি ঝগড়াঝাঁটি, মুখব্যাঁকা করা পর্য্যন্ত তার স্বামীরই জন্য। আর, স্বামীর সবখানির প্রতিই কিন্তু তার সমান নজর, চার-চোখো দৃষ্টি,—একটা দিক দেখছে, অন্য সব দিক দেখছে না বা সেদিকে খেয়াল নেই, এমন হয় না। স্বামীর সব-কিছুতেই ব্যাপ্ত ও ব্যাপৃত ক'রে তোলে সে নিজেকে। এই হ'লো টানের লক্ষণ। এখানে যারা তপোবনের কাজ করছে তারা যদি মনে করে, অন্য department (বিভাগ)-এর সম্বন্ধে তাদের কোন দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য নেই, তবে বুঝতে হবে ঠাকুর তাদের interest (স্বার্থ) হ'য়ে ওঠেনি। ঠাকুর interest (স্বার্থ) হ'লে ঠাকুরের দুনিয়ার যা'-কিছু সব দিকে মমত্বদীপ্ত দায়িত্বপূর্ণ শ্যেনদৃষ্টি থাকবেই, এবং তারা পরস্পর পরস্পরের fulfilling (পরিপূরণী) হবেই। প্রত্যেকে তার নিজস্ব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব তো সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করবেই, সঙ্গে-সঙ্গে তার জ্ঞানবুদ্ধি ও সামর্থ্য-মতন অপরকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবে—অনধিকারচর্চ্চা না ক'রে। এমনতর চৌকস দৃষ্টি যদি

থাকে, তবে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবেও বেড়ে উঠবে ঢের। তবে অনেকের ব্যক্তিগত-ভাবে তারিফ পাওয়ার বুদ্ধি প্রবল থাকে। তার দরুন নিজে efficient (দক্ষ) হ'লেও অন্যকে efficient (দক্ষ) ক'রে তোলার চেষ্টা থাকে না। সে কিন্তু ভাল নয়। কেউ ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় স্বার্থান্বিত হ'লে, সহকর্ম্মীদের efficient (দক্ষ) ক'রে তোলবার ধান্ধা তার থাকবেই। কারণ, সে জানে যে একক তার পক্ষে ইষ্টের বিরাট বহুমুখী ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়, তাই সকলকেই সে তাজা ক'রে তুলতে চায়। বাহবার কাঙ্গাল হয় না সে, সে করে নিজে কিন্তু বাহবা দেয় অন্যকে। নিজস্ব নাম, কাম বা স্বার্থের ধার ধারে না সে, সে কেবলই ভাবে, বাঞ্ছিতের ইচ্ছা পূরণ হবে কেমন ক'রে, আর তেমনি ক'রে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রিত) করে। তার বা অপরের কোন প্রবৃত্তিই তখন তার কাজের পথে বিশেষ একটা বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। কোথাও এড়িয়ে, কোথাও ডুব মেরে, কোথাও ডিঙ্গিয়ে, কোথাও মিষ্টি ক'রে ডাঙ্গস মেরে অন্তরায়গুলিকে সুকৌশলে অতিক্রম ক'রে চলে সে। তার সান্নিধ্যে কতজন আবার এমনতর নিয়ন্ত্রণ-কৌশল-অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। এরা অমোঘভাবে নিজেরা করে, অন্যকে দিয়েও করায়, যার যেমন যোগ্যতা, তাকে দিয়ে তেমনতর। একেই বলে organising skill (সংগঠনী কৌশল)। এমনতর চরিত্রসম্পন্ন লোক যতই বেড়ে যাবে, সংগঠন ও সংহতি ততই দানা বেঁধে উঠবে। পাতলা ধরণের অনেক মানুষ থাকে, তারা অনেক সময় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হ'য়েও এমনভাবে চলে, যে-চলনা সংগঠন ও সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়ায়। এগুলি সব-সময় repair (জোড়া লাগান), adjust (নিয়ন্ত্রণ) ও resist (নিরোধ) করার তালে থাকতে হয়। তাই, কতকগুলি খাঁটি লোকের রীতিমত খাটুনি চাই, এরা positive push (বাস্তব-উচ্চেতনী প্রেরণা) দেবে, আবার, সংহতি-বিরোধী যা'-কিছু ঘটে সেগুলি counteract (প্রতিকার) করবে। এরা যদি fanatic (গোঁড়া), sympathetic (সহানুভূতিপূর্ণ) ও impartial (পক্ষপাতশূন্য) না হয়, কান-কথায় যদি রঙ্গিল হ'য়ে ওঠে, মোকাবিলায় মিলিয়ে নেবার অভ্যাস যদি এদের না থাকে, তাহ'লে কিন্তু হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বন্ধ ক'রে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পা-দুটো টান-টান ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছেন, পায়ের উপর কাঁথা দেওয়া, পা-দুটো ঈষৎ নাড়াচ্ছেন, তাই দেখে তরুমা পা ঘ'সে দিচ্ছেন, যা'তে পায়ে বেশী শীত না লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিত মুখে বললেন—তরু কাঁপায় বড় সুন্দর, যেন তবলা বাজিয়ে যায়।

বিমলদা (মুখোপাধ্যায়)—কেউ যদি বলেন, ঠাকুর এই বলেছেন, আপনি যদি তা' না মানেন, তবে গুরুদ্রোহিতা হবে, কিন্তু আমি যদি বুঝি যে তা' আপনার interest (স্বার্থ)-এর বিরুদ্ধে যাবে, সেখানে আমার করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (চকিতে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে আবেগভরে বল্‌তে লাগলেন)—আগে ঠাকুর, তারপর তাঁর কথা। যেমন শোনা যায় 'resist no evil' (অন্যায়ের প্রতিরোধ ক'রো না) এই কথার দোহাই দিয়ে, এই কথা মান্য করার ভান দেখিয়ে যীশুখ্রীষ্টের শিষ্যবর্গ নীরবে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হ'তে দিল, একটা আঙ্গুলও নাড়াল না, পরম ঔদার্য্যে নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল, কিন্তু মেরী ম্যাকডালিনই বুখে দাঁড়াল যীশুখ্রীষ্টকে বাঁচাবার জন্য, তার কাছে যীশুখ্রীষ্টই বড়। তাঁর কথা মেনে পুণ্য সঞ্চয় করবার লোভে তাঁকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নয় সে, তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে লাখ নরকেও যদি যেতে হয়, তাও সে রাজী। এই হ'লো ভালবাসার নিশানা, প্রেষ্ঠ সেখানে মুখ্য, তাঁকে বাদ দিয়ে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের কোন চিন্তাকেই সে আমল দেয় না। ইষ্ট বিপন্ন যেখানে, সেখানে ঐ-সব নীতিবাদিতার দোহাই দিয়ে চুপ ক'রে থাকা মানেই স্বার্থপরতা ও ভীরুতা। প্রেম যেখানে, সেখানে পরাক্রম ও প্রিয়ার্থ-তৎপরতা মুখর হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে। শুনেছি, শ্রীকৃষ্ণ একবার মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলেন। গোপীরা খবর পেলেন যে ভক্তের পদধূলি তাঁর মাথায় দিলে তিনি সেরে উঠবেন। যেই শোনা, সেই কাজ, পাপ-পুণ্যের কোন চিন্তাই কিন্তু তাদের মাথায় ঠাঁই পেল না। মুনি, ঋষি, সাধকরা কিন্তু সে সাহস পেলেন না, অপরাধের ভয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়লেন। তাই, রক্তমাংসসঙ্কুল ইষ্ট যার কাছে মুখ্য ও কেবল হ'য়ে ওঠেনি, সে কিন্তু ইষ্টপ্রেম তথা ধর্ম্মের দেউড়ি থেকে অনেক দূরে।—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবমুগ্ধ অন্তরে ললিতভঙ্গিমায় মাথা দোলাতে-দোলাতে আবৃত্তির সুরে টেনে-টেনে বললেন—"মরম না জানে, ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা, কাজ নাই সখি তাদের লইয়া বাহিরে থাকুক তারা।'

তপোবনের কথা উঠতে কেষ্টদা বললেন—তপোবন বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর যা' বোঝেন, তা'তে এই এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দিন-রাত যা' চলে, এই-ই তো প্রকৃত তপোবন। তপোবন বলতে যদি কেউ কোন নির্দ্দিষ্ট এলাকা বোঝেন, যে-স্থানটা তপোবন ব'লে পরিচিত, অথচ তপোবনের আদর্শ মূর্ত্ত ক'রে তোলার প্রয়াস নেই সেখানে,—তা'হলে তো ভুল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো ঠিকই। তপোবনের পরিকল্পনা যেখানে রূপায়িত হ'চ্ছে, তার তপোবন নাম থাক বা না থাক, তপোবন সেখানেই। আর, যেখানে

তা' হ'চ্ছে না, সেখানে তা' ফুটিয়ে তুলতে পারলেই সেই স্থান তপোবন নামের যোগ্য হবে।

কেষ্টদা—যে-চরিত্র, যে-কর্ম্মপটুতা, যে-কার্য্যকরী জ্ঞানের ভিত্তি আপনি তপোবনের শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের জীবনে সুদৃঢ় ক'রে তুলতে চাচ্ছিলেন, তা' থেকে তো আমরা অনেক পেছনে প'ড়ে আছি। আর, যারা তিন বৎসরে ম্যাট্রিক পাশ করছে, তাদের অনেকে খুব কাঁচা থেকে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতটুকু করছে, ততটুকু ভালভাবে করলে, তা'তেও লাভ আছে। তিন বছরে যে পাকা ক'রে তৈরী করা যায় সে-সম্বন্ধে conviction (প্রত্যয়) আসলে অন্যান্য সব দিকেও নজর পড়বে। এটা যে হয় তা' তো আমি দেখিয়েই দিয়েছি, আপনাদেরও বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। যে-ভঙ্গীটা নিয়ে যে-ভাবে করতে হয়, সেই ধাঁজে না দাঁড়িয়ে মামুলি চলনে কাজ হাঁসিল করতে চাইলে তো চলবে না। কেমিক্যাল ওয়ার্কস-এরও ঐ কথা। তেমন চেষ্টা ক'রে দেখল না। বিশেষ কিছু না ক'রেই যা' পায়, তা'তেই খুশি আছে। বাড়াবার কথা বললে বলে, 'টাকা না হ'লে হয় না'। কেউ যদি মন করে, তাহ'লে কি টাকার অভাবে কাজ আটকে থাকে? এখন তো আপনাদের সুযোগ আগের থেকে কত বেড়ে গেছে। আপনাদের মানুষ বাড়ছে ক্রমাগত, টাকার অভাব হবার তো কথা নয়! এতখানি যে আজ হয়েছে, টাকার জোরে তো কিছু হয়নি, হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে, আগ্রহের আবেগে। প্রত্যেকটি বিভাগের কর্ম্মীদের বিশেষতঃ পরিচালকদের যদি আগ্রহ থাকে কেমন ক'রে তারা আরো অগণিত লোকের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করবে, তাদের কাজের ভিতর-দিয়ে সারা দেশকে সেবায় সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে কিভাবে, সর্ব্বোপরি নিজেদের ভিতরের দুনিয়া ও বাইরের দুনিয়ার সর্ব্বত্র ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করবে কেমন ক'রে, তবে তাদের সেই আগ্রহ-সম্বেগই সাফল্যকে সহজ ক'রে তুলবে। এই প্রয়োজন-বোধ যদি না থাকে, এই নেশা যদি না থাকে, নিজেদের প্রয়োজন মিটলেই যদি সব আবেগ ঠাণ্ডা মেরে যায়, তাহ'লে যেমন চলছে, তেমনই চলবে। অবশ্য, একটা বিভাগের কাজও যদি ঠিক মত চলে, তা' অন্যান্য বিভাগের কাজকেও এগিয়ে দেবে। একের সাফল্যের দৃষ্টান্ত অন্যকেও প্রবুদ্ধ করবে। আপনার ঋত্বিক্-আন্দোলন অর্থাৎ লোক-সংগ্রহ ও লোকসংগঠন কাজ যদি ঠিকভাবে আশানুরূপ এগিয়ে চলে, আরো ভাল লোক যদি পান, তবে দেখবেন—এর ভিতর-দিয়েই সব আবার গজিয়ে উঠবে। এখন এন্তার লাগান যাজন, দোয়ারে দীক্ষা দিয়ে যান, আর আড়ে-হাতে লেগে প্রত্যেককে বাড়তির পথে ঠেলে দেন।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বদনমণ্ডল দীপ্ত-বিভামণ্ডিত হ'য়ে উঠলো—তাঁর ডাগর চোখ দু'টি তীব্র আবেগে জ্বলতে লাগল।

মানদামা (প্রফুল্লর মা) আসছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে। 'অমন খুঁড়িয়ে হাঁটছিস্ কেন ?'—দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

'পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল'—এই ব'লে এসে প্রণাম করলেন ভূমিষ্ঠ হ'য়ে। প্রণাম ক'রে উঠে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে, তাঁর চোখে-মুখে গভীর কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের অভিব্যক্তি। যেন ভাবছেন—সবার প্রতি এমন স্নেহদৃষ্টি, প্রত্যেকের জন্য এমন ব্যথাবোধ ও তার নিরাকরণ-প্রচেষ্টা, একি কখনও মানুষে সম্ভব ?

'কাঁটাটা বের ক'রে ফেলিস্‌নি ?' আবার প্রশ্ন করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

মা বললেন—'ফেলেছি কিন্তু তবু ব্যথা যা'চ্ছে না, হয়তো আগা-টাগা ভেঙ্গে আছে।'

'একটু আইডিন দিয়ে রাখিস্। দেখিস্ পেকে-টেকে না যায়। যা, এখনই যা, ভগীরথের ওখান থেকে একটু আইডিন লাগায়ে আয়গে, আর বাড়ীতে যদি না থাকে, যাবার বেলায় একটা শিশিতে ক'রে একটু আইডিন নিয়ে যাস্। বারে-বারে ওটা লাগাবি।'—স্নেহকোমল কণ্ঠে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

মা তখনই ডিসপেনসারীতে গেলেন আইডিন লাগাতে।

বিমলদা—অনেকে মহাপুরুষদের নামের আগে দু'টো 'শ্রী' বসান-সম্বন্ধে আপত্তি তোলেন, তাদের ধারণা, ওতে তাঁদিগকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। এ-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেমন পছন্দ করে, সে করেও তেমন, এবং সে সম্পদ্ তার-ই। বিহিত শ্রদ্ধা মানুষকে কখনও বঞ্চিত করে না। কারও নামের আগে একাধিক 'শ্রী' দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'লো—ওর দ্বারা তাঁর অসামান্যতা ও বিশেষ বিভূতি সূচিত করা। 'শ্রী' মানে সেবা। ভগ এসেছে, ভজ্-ধাতু থেকে, ভজ্-ধাতুর একটা প্রধান অর্থ হ'লো সেবা, তাই ভগবান মানে বলা যায় সেবাবান। সত্তাসম্বর্দ্ধনী সেবা অর্থাৎ পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিরক্ষণই যাঁর জীবন-বৈশিষ্ট্য, তিনিই ভগবান। যিনি এই সেবা-বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন, তিনিই হ'লেন মানুষের মুখ্য সেবনীয়, অর্ঘ্যণীয় মানুষ-ভগবান। তাই তাঁর নামের গোড়ায় একাধিক 'শ্রী' যোগ ক'রে জানিয়ে দেওয়া হয় যে তিনি আমাদের সেব্যপরম।

কেষ্টদা—গীতায় আছে, 'ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ'—এই নরাধম কারা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর---নরাধম তারাই যাদের will to becoming (বিবৃদ্ধির ইচ্ছা) stunted (খাটো) হ'য়ে গেছে, বৃত্তি-বেহুঁশ হ'য়ে যারা সঙ্কোচ ও মরণাভিসারে এগিয়ে চলেছে, প্রতিলোম-সঞ্জাত জাতক যারা তারা কিন্তু স্বভাবতঃই শ্রদ্ধাহারা, আদর্শবিমুখ ও প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে ঐ দিকে ঢ'লে পড়ে।

বিমলদা---Will to live (বাঁচার ইচ্ছা) তো সবার মধ্যেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Will to becoming (বিবৃদ্ধির ইচ্ছা) যাদের কম, will to live-ও (বাঁচার ইচ্ছাও) তাদের কম। Becoming-এর (বিবৃদ্ধির) urge (আকূতি) না থাকলে being (সত্তা)-ই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে।

বিমলদা—টাকার লোভে যদি কেউ আপনার ভক্ত সাজে ?

কেষ্টদা কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন—গোড়ায় সেই ভাব নিয়ে আসলেও, পরে ঠাকুরে interested (স্বার্থান্বিত) হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবর্ত্তন হবার নয়, এমন লোকও আছে। আলোর কাছে কতকগুলি পোকা আসে আলোর জন্য, আলোতে আত্মাহুতি দিয়েই তারা সুখী, আবার ব্যাঙ, টিকটিকি ইত্যাদি আসে সেই পোকা খেতে, আলোয় কোন লোভ নেই তাদের, তারা আসে আহারের লোভে। ভক্ত সেজে তেমন লোকও আসে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'লো অন্যান্য ভক্তদের এবং গুরুর goodness-এর (সদাশয়তার) advantage (সুযোগ) নেওয়া। অন্য লোভে গুরুতে অনুরক্ত হ'তে পারে না যারা, দুষ্কৃতিসম্পন্ন লোক তারা! যাদের ভিতরে মাল আছে, তারা বিশেষ কোন বাসনা-কামনা নিয়ে গুরুসান্নিধ্যে আসলেও পরে গুরুতেই আসক্ত হ'য়ে ওঠে, যেমন হয়েছিল হনুমানের। হনুমানের মনে কত সাধ লুকিয়ে ছিল, আর তারই পূরণের আশায় ধরেছিল রামচন্দ্রকে, কিন্তু রামচন্দ্রকে তার এতই ভাল লেগে গেল, তাঁকে খুশি ও সুখী করার সাধ তার এতই প্রবল হ'য়ে উঠলো যে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা তার তলিয়ে গেল। রামচন্দ্রকে নিয়ে মাতাল হ'য়ে, তাঁকে নিয়েই কাটিয়ে দিল সারাটা জীবন—আর সে শুধু ভাবের ঘোরে নয়, প্রচণ্ড কর্ম্মোৎসবের মধ্য-দিয়ে। হনুমানের কথা ভাবলেও বুকখানা বড় হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—গীতায় আছে, 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্'—এই যোগমায়াসমাবৃত মানেই বা কী আর জন্মেও বা তিনি অজ, অব্যয় কেমন ক'রে—ব্যাপারটা বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগমায়াসমাবৃত মানে স্ব-অয়নস্যূত বৃত্ত্যভিধ্যান-সমন্বিত; সাধারণ মানুষের মত তিনিও পুরুষ এবং নারীর cohesive affinity

(সঙ্কর্ষণী সঙ্গতি)-র মধ্য-দিয়েই মানুষ হ'য়ে উদ্ভূত হয়েছেন। সে-দিক দিয়ে অন্য মানুষের সঙ্গে তাঁর কোন পার্থক্য নেই। তাই প্রবৃত্তিরঙ্গিল যারা, তারা ভাবে, তিনিও মানুষ, আমরাও মানুষ—তাঁ'তে আমাদিগেতে প্রভেদ কোথায়? সিদ্ধাই বা অলৌকিকত্বের তাক-লাগান চটক যদি বা খুব দেখতে পায়, তাহ'লে বরং খানিকটা মাথা নোয়াতে রাজি থাকে। কিন্তু তিনি তো আসেন প্রেমের ঐশ্বর্য্য নিয়ে, চরিত্রের ঐশ্বর্য্য নিয়ে, মানুষকে ঐ প্রেম ও চরিত্রের অধিকারী ক'রে ধন্য ক'রে তুলতে। মানুষকে অজ্ঞ ও দুর্ব্বল রেখে, তাদের সামনে রকমারি ক্ষমতা দেখিয়ে, তাদের কাছ থেকে পূজা পাবার লোভ নেই তাঁর। তাই মূঢ় যারা, তাদের কাছে তাঁর বিশেষত্বই ধরা পড়ে না। ওতে একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি লাগে। তিনি যে মানুষ হ'য়েও অজ, অব্যয়, তা' আর তারা বুঝতে পারে না। অজ মানে, তিনিই সব হ'য়ে আছেন, হ'য়ে চলেছেন, এতৎসত্ত্বেও তিনি তিনিই আছেন, যা' ছিলেন আমান তাই-ই আছেন, নূতনত্ব কিছুই হয়নি বা যা' ছিলেন তা' থেকে ন্যূনতাও কিছু ঘটেনি, তাই তিনি জন্মগ্রহণ ক'রেও অজ অর্থাৎ জন্মেন না, অর্থাৎ দেশ-কাল-নাম-রূপের অধীন হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবার দরুন স্বরূপতঃ ও তত্ত্বতঃ তাঁর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি, আর অব্যয় মানে তাঁর ব্যয় নেই, ক্ষয় নেই, যা'-কিছু আছে তাঁতেই আছে, নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে তাঁতেই বিধৃত হ'য়ে আছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে পাশ ফিরে আরও আঁটসাট ক'রে বসলেন। তাই দেখে একজন বললেন, আজ তো বেশ বেলা হ'য়ে গেল, পায়খানায় যাবেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর কৃত্রিম বিরক্তির সঙ্গে বললেন—রাখ্! বেলা দিয়ে আমি করব কী? ঘড়ি দেখে কি আডডা মারা যায়? এমন মরসুমের আসর ভেঙ্গে কি ওঠা যায়? ফূর্ত্তির সময় বাগড়া দিস্ কেন? আর, হাগা পেলে এমনিই উঠে পড়বোনে।

এরপর কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বসুদেবের ছেলে শ্রীকৃষ্ণ, রক্তমাংস-সঙ্কুল এই প্রতীকই যা'-কিছু সব, এই বোধই চরম বোধ। তাঁর ভিতরই সব revealed (প্রকাশিত) হয়, analytically and synthetically (সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ-সহ) with all one's emotion, sentiment, activity and rationality (মানুষের সমগ্র আবেগ, ভাবানুকম্পিতা, কর্ম্ম ও যুক্তি নিয়ে)—আর তা'

আবার তাঁ'তেই সার্থক হ'য়ে ওঠে। আমি যদি মাকে তেমন ভালবাসি, তবে দুনিয়ায় যা' দেখি তা' দেখেই মনে হ'তে থাকে, মা'র শরীর যে-যে উপাদান দিয়ে গড়া, মা'র গায় যা' রক্ত, মাংস, অস্থি, চর্ম্ম, তাঁর ঢল-ঢল মুখখানি হ'য়ে বিরাজ করছে—তইা-ই তো এখানে অন্যরূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একই উপাদান-সামগ্রী নানা রূপান্তরের মধ্য-দিয়ে কোথায় কিভাবে কোন্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে আছে, একই বহুতে পর্য্যবসিত হয়েছে কি ক'রে, একই বহুতে আছে কোথায় কেমন ক'রে—এ বোধই মানুষের ভিতর গজায় না, যদি অমনতর সত্তাপ্লাবী সর্ব্বগ্রাসী প্রীতি কোন উপযুক্ত শ্রেয়তে কেন্দ্রায়িত না হয়। মা'র প্রতি যদি অমন টান হয়, তখন সব তা'তেই মা'র স্ফুরণ হ'তে থাকে, তখন conviction (প্রত্যয়) আসে, realisation (অনুভূতি) আসে—মা-ই ভগবতী। তবে বস্তুগুণ চাই-ই। তাই সদ্‌গুরুর প্রয়োজন হয়, যাঁতে সব-কিছুই জাগ্রতদীপনা নিয়ে জাগরূক। তাঁ'তে তেমন অনুরাগ থাকলে একটা গাছ দেখলেও মনে হয় 'গাছটাও ঠাকুরের এক মূর্ত্তি'। শোনা ধারণা আরোপ করলে কিন্তু হবে না, টানের তোড়ে সহজ বোধ ফুটে ওঠে—বস্তু, তত্ত্ব, ভাব, গুণ, রূপ, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ সব-কিছুর অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে। যা'-কিছু দৃশ্য বস্তু তাঁর স্মৃতিরই উদ্রেক করে, তখন সে ঐ বোধের দাঁড়ায় বস্তুজগৎকেও সত্যি ক'রে দেখতে পারে, জানতে পারে, বুঝতে পারে—প্রতিটি যা'-কিছুর বৈশিষ্ট্যসহ। তার আগে কিছুই জানা হয় না—সামগ্রিক সঙ্গতি নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে আবার তামাক দেওয়া হ'লো। তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় প্যারীদা জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার পেট কেমন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর পট ক'রে মুখ হাঁ ক'রে প্যারীদাকে বললেন—শোঁক তো !

প্যারীদা শুঁকলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গন্ধ আছে নাকি ?

প্যারীদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে পেট ভাল আছে, হজম ঠিকই হ'চ্ছে !

কথা আজ আর ফুরোচ্ছ না, রোদ উঠে গেছে, আশ্রম-প্রাঙ্গণে লোকজনের আনাগোনা সুরু হয়েছে, তবু কথা চলছেই। ভক্তবৃন্দ প্রিয়তমকে কেন্দ্র ক'রে মধু-মহোৎসবে মেতে উঠেছেন, এই উপভোগের আসরে, আনন্দের আসরে সবাই তন্ময়, চারিদিকে কোথায় কী ঘটছে, কোন দিকে খেয়াল নেই কারও।

এই পড়লো, পড়লো, ধর্ ! ধর্ !—ব'লে হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। তখন থতমত খেয়ে কয়েকজন তাড়াতাড়ি উঠে এদিক-

ওদিক চাইতেই দেখতে পেলেন, একটি ছোট ছেলে বাঁধের শেষ সীমানায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, প'ড়ে যায় আর কি ! তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধ'রে আনা হ'লো।

ছেলেটির মা তখন এগিয়ে এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহকোমল ভর্ৎসনার সুরে বললেন—ছাওয়াল-পাওয়ালের উপর যে নজর রাখিস্ না, এটা ভাল নয়। কোন্ সময়ে কোন্ বিপদ ঘটে তার কি ঠিক আছে? তাই সব সময় সাবধানে থাকা লাগে। সব দিকে নজর যদি না থাকে, তাহ'লে ভাল মা-ও হওয়া যায় না, ভাল গিন্নীও হওয়া যায় না। সংসারটা তোদের হাতের উপর, স্বামী-পুত্রের জীবনের মালিক তোরা, তাই প্রতিপদক্ষেপে তোদের হুঁশিয়ার হ'য়ে চলা লাগে। তোরা যদি চৌকস হোস্, তুখোড় হোস্, ছাওয়াল-পাওয়ালরাও তোদের দেখে শিখবে, মানুষ হবে তারা। আবার, তোরা যদি ঢিলে হ'য়ে চলিস্, তোদের দৈনন্দিন আচরণে যদি সুশিক্ষার ছাপ ফুটে না ওঠে, ওরাও বরবাদ যাবে। শিক্ষা মানে কিন্তু কতকগুলি বই পড়া নয়। চাল-চলন যদি দুরস্ত না হয়, হাতেকলমে যদি চৌকস না হয়, তবে পুঁথি-পড়ার কোন দাম নেই। উপযুক্ত মা, উপযুক্ত শাশুড়ী কিংবা তৎস্থানীয় যারা তারাই হ'লো মেয়েদের, বৌদের সেরা শিক্ষক।

এরপর তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার বুকের মধ্যে এখনও কেমন করছে। ছেলেটা যদি ওখান থেকে প'ড়ে যেত।

একটু পরে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—গীতায় আছে, 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে' কথাটার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একভক্তি না হলে হবে না। পঁচিশ ঠাকুর করলেই মুশকিল, বহু-নৈষ্ঠিক যারা তাদের জীবনে কোন সঙ্গতি থাকে না, তারা আস্তে-আস্তে পাগলাটে হ'য়ে ওঠে। বহু-নৈষ্ঠিক মানে মূলতঃ তার কিছুতেই নিষ্ঠা নেই, নিষ্ঠা আছে রকমারি প্রবৃত্তি-স্বার্থে, তাই আত্মনিয়ন্ত্রণ ব'লে জিনিসটা তাদের জীবনে ঘ'টে ওঠে না, ফলে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। ভক্তি ছাড়া, একানুরক্তি ছাড়া জ্ঞান ফোটে না। একটা দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে যে দুনিয়াটাকে দেখে, একের জন্য যে ভাবে, বলে, করে—তারই স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে, তার বোধ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা অন্বয়ী সংহত-বিন্যাস ফুটে ওঠে। কোন্‌টা কী এবং তাকে কেমন ক'রে, কি-ভাবে প্রিয়-স্বার্থে সার্থক ক'রে তোলা যায়, সে-সম্বন্ধে তার হুঁশ থাকে, আবার বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কী, কেমনতর পারস্পরিক সমাবেশের ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকটাকে প্রত্যেকটার পরিপূরণী ক'রে তোলা যায়, এতে গড়ে যাবতীয় যা'-কিছুকে কেমন ক'রে প্রিয়ের পরিবেশের ও

নিজের সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলা যায়, অনুরাগ-সমন্বিত বাস্তব চিন্তা ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ঐ বোধ সে আয়ত্ত ক'রে ফেলে। সে বোঝে, জানে, সমগ্র সত্তা দিয়ে। ফলকথা তার চরিত্রটাই অমন হ'য়ে ওঠে। একেই বলে জ্ঞান। ভক্তি ছাড়া, একভক্তি ছাড়া এই জ্ঞানের দরজা খোলে না। একভক্তি যার আছে তাকে যে-কোন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ফেলো না কেন, সে তার মধ্য-দিয়েই কেটে বেরিয়ে আসবে। তার জ্ঞানের নাড়ী হয় টনটনে। কথায় বলে প্রহ্লাদমার্কা ছেলে, তার মানে সে আগুনে, জলে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে, অন্তরীক্ষে কোথাও ডরায় না। নব-নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি সব অবস্থায় তাকে জয়ী ক'রে তোলে, সে হত হয় না, নষ্ট পায় না সহজে। দয়িত যে, বাঞ্ছিত যে, তাঁর জন্য বেঁচে থাকার, তাঁর সেবায় ব্যাপৃত থাকার তীব্র লালসা তাকে পেয়ে বসে। ঐ লালসাই অমৃত লালসা, অমৃতকে উপভোগ করে সে দুনিয়াদারীর সব আবিল্যের মধ্যে থেকেও। তাই ভক্তির চাইতে বড় কামনার বস্তু আর নেই কিছু মানুষের, ওতে এক ঢিলে সব পাখী মারা হয়, সব-কিছুই ওর ব্যাড়ের মধ্যে পড়ে, নইলে আর যা'-কিছুই চাইতে যাক মানুষ তা'তে অনেক কিছু ছুট যায়, উপভোগ ও স্বার্থকতায় খাঁকতি থাকে মানুষের।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ পুলকে, প্রহর্ষে, প্রেরণায় স্ফীত হ'য়ে উঠেছে—স্নিগ্ধ-মধুর জ্যোতির্ম্ময় আভায় বিভাসিত হ'য়ে উঠেছে। সবার অন্তরে তাঁর তীব্র অনুভূতিময় একটি কথা বার-বার ফুট কাটছে—ভক্তির চাইতে বড় কামনার বস্তু আর নেই কিছু মানুষের। শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে ব'লে চলেছেন—আর অবতারে-অবতারে যে তুলনা ক'রে প্রভেদ দেখায়, একজনকে ছোট দেখিয়ে আর একজনকে বড় করে—এটা ভারি বিশ্রী। রামকেষ্ট ঠাকুরকে কেউ যদি দেখার মত দেখে থাকে, তাহ'লে তাঁর মধ্যে সে বুদ্ধ, যীশু, শ্রীকৃষ্ণ, মহম্মদ, চৈতন্য সবাইকে দেখেছে, তাঁদের জীবনের তাৎপর্য্য তাঁর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে। আর, সত্যিই তাই পাওয়া যায়, এ ছাড়া উপায়ও নেই। বর্ত্তমান প্রেরিত যিনি, তাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন সবাই থরে-থরে সাজান থাকেন, সবারই glimpse (ঝলক) তাঁর মধ্য-দিয়ে ঠিকরে বেরোয়। যার পূর্ব্বতন কারও প্রতি অনুরাগ আছে, এক ঝলক দেখেই সে টের পায়—'এই আমার চিরযুগের চেনা মানুষ, চাওয়া মানুষ।' অমনি সে তাঁকে আঁকড়ে ধরে। রামকেষ্ট ঠাকুরের ভক্ত যদি কেউ হয়, সে কি জ্যান্ত রামকেষ্ট ঠাকুরের flashes (দীপ্তি) দেখে বুঝবে না ? খুব বোঝে। ছেলের ভেতর যেমন বাপকে দেখা যায়, বর্তমানের ভেতরও তেমন পূর্ব্বতনকে পাওয়া যায়—'সঃ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ

কালেনানবচ্ছেদাৎ'। বর্তমানকে দেখেশুনেও যে তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, বুঝতে হবে তার পুর্ব্বতনের কারও প্রতি টান নেই।

অক্ষয়দা (দেব) নিজের খেতের কফি, বেগুন, মূলো ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন একটা ঝুড়িতে ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঝুড়িহাতে অক্ষয়দাকে দেখেই বালকের মত খুশিতে আটখানা হ'য়ে উল্লাসভরে ব'লে উঠলেন—কি মাল আনিছেন অক্ষয়দা।

অক্ষয়দা তাড়াতাড়ি ঝুড়ি নামিয়ে প্রণাম ক'রে বললেন—বাগানে কফি, বেগুন, মূলোটুলো হইছিল, তাই নিয়ে আইছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে তরকারিগুলি দেখতে-দেখতে বললেন—একেবারে গন্ধমাদন ঠেলে নিয়ে আইছেন। শালার অবাক কাণ্ড! যান, বড় বৌয়ের কাছে দিয়ে অসেন গে।·········এ সব আপনি নিজে করিছেন ?

অক্ষয়দা—ছেলেমেয়ে, আমি, মিনুর মা সকলেই খাটি বাগানের পিছনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে খুব ভাল। এতে সংসারের সাশ্রয় হয়, শিক্ষাও হয়, শরীর-মনও ভাল থাকে। কৃষি, গো-পালন, ঢেঁকী, যাঁতা, তাঁত, ছোটখাট কুটিরশিল্প, ছোট্ট রকমের ল্যাবরেটারি, কিছু ভাল বই, খাদ্য-লতাপাতার গুণাগুণ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত কতগুলি ছবি, চার্ট, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি সব বাড়ীতে রাখতে হয়। সমস্ত পরিবার শুদ্ধ অনুশীলনের উপর থাকতে হয়। তাহ'লে ছেলে পাশ করুক না করুক, ঘরোয়াভাবে এমনতর শিক্ষার ভিত্তি পত্তন হ'য়ে যায় যে, তাকে কেউ বুখতে পারে না, বেকারও থাকে না সে, একটা-কিছু ক'রে-ক'র্ম্মে পেটের ভাত, পরণের কাপড় যোগাড় করতে পারেই। আর, তার একটা আত্মপ্রত্যয় থাকে, সে ঘাবড়ায় না। দ্যাখেন কেষ্টদা! আমার খুব ইচ্ছা করে যে, আপনি যেমন জমি করিছেন, সবাই ঐ রকম জমি করে। পেটের ভাতটার জোগাড় থাকলে মানুষের অনেকখানি বল থাকে। যুদ্ধবিগ্রহের যে রকম অবস্থা, কোন্ সময় কী হয় বলা যায় না। তাই নিজেদের খাদ্য-খানার জন্য পরমুখাপেক্ষী না হ'তে হয়, এতটুকু ব্যবস্থা ক'রে রাখা লাগে। এখন থেকে সবাইকে এ-কথা বলতে থাকুন।

কেষ্টদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেয়ে পায়খানায় গেলেন। যাবার পথে ঘাড়টা বেঁকিয়ে কেষ্টদার দিকে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন। সেই রহস্যমণ্ডিত নীরব হাসিতে বুক ভ'রে যায় আনন্দে। যেতে-যেতে হঠাৎ সামনে একখানি পা ও পিছনে একখানি পা রেখে মাজাটি গুঁজে মোহন ভঙ্গীতে থমকে দাঁড়ালেন—

তাঁর দৈর্ঘ্য তখন যেন অনেকখানি কমে গেছে,—ঐভাবে দাঁড়িয়ে ২।১ মিনিট কেষ্টদার সঙ্গে গোপনে কী যেন বললেন। তারপর ঋজু হ'য়ে থপ-থপ ক'রে চটি ফেলে বাঁধের ধারে পূবদক্ষিণ কোণে অস্তিকায়নে পায়খানায় গেলেন। পায়খানা থেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় চৌকিতে বসলেন।

ডাক্তার কালীদা (সেন) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, তোর রোগী-পত্রের খবর ভাল তো?

কালীদা—হ্যাঁ! এখন তেমন serious (গুরুতর) অবস্থা নয় কারও। তবে ঠাকুর! এখানে ডাক্তারি করা ভারি মুশকিল। পয়সা-কড়ি পাবার প্রত্যাশা তো রাখি না, সে যাক—কিন্তু প্রেসক্রিপশন করলেই বলে, পয়সা পাব কোথা থেকে? আপনি একটু ঠাকুরকে ব'লে দেন। আপনাকে ঐ জন্য বিরক্ত করতেও ভাল লাগে না। অনেক রোগী নিজেরাও ব্যবস্থা করতে পারে না। আবার, আপনার কাছে যে নিজে বলবে, তাও বলবে না। আমাকে চাপাচাপি করে। আমি তখন ফাঁপরে প'ড়ে যাই। অথচ ওষুধ না খেলে তো আর রোগ সারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেও কিছু-কিছু যোগাড় ক'রে দেওয়া লাগে।

কালীদা—সে বড় কঠিন ব্যাপার। চাইব কার কাছে? সবারই তো একরকম অবস্থা। আপনি চাইলে মানুষ যেমন ক'রে হো'ক দেয়, কিন্তু আমরা চাইতে গেলে পাওয়া মুশকিল। আর, ভিক্ষা করা আমার পছন্দও হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবে না কেন? খুব দেবে। চেয়ে দেখলেই পারিস্। আজ যদি তুমি কাউকে রুগণ অবস্থায় ওষুধপত্র দিয়ে সাহায্য কর, কাল তাকে দিয়েই তুমি আর-একজনের জন্য করিয়ে নিতে পারবে। এইভাবে মানুষ যদি তোমার হাতে থাকে, তোমার ভাবনা কী? দায়িত্ব নিতে যত ভয় পাবে, তত ছোট হ'য়ে থাকবে। ভগবান-লাভ বা ব্রহ্মলাভ কিছুই সম্ভব নয়, যদি মানুষ সুকেন্দ্রিক হ'য়ে বহুর জীবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে না পড়ে। তিনি প্রেমস্বরূপ, তাঁকে যদি ভালবাস, তাঁর জগৎকে তুমি ঠেলে ফেলতে পার না। তোমার পরিবেশের দায়িত্ব নেওয়াই লাগবে তোমাকে, তাদের ব্যথাটা নিজের ব্যথা ব'লে বোধ করতে হবে। আর নিজের অভাব-অসুবিধার প্রতিকার করতে যেমন উঠে-পড়ে লাগ, অন্যের বেলায়ও সাধ্যমত তেমনি করতে হবে। তুমি দরদী, সমব্যথী, মানুষের দুঃখু-কষ্টে মুখে আহা-উহু কর, কিন্তু বাস্তবে তার নিরাকরণের জন্য কিছু কর না বা তত্ত্বকথা শুনিয়ে ছেড়ে দাও, কিন্তু নিজের গায়ে একটু কাঁটার আঁচড় লাগলে অস্থির হ'য়ে ওঠ, তার মানে তোমার ঈশ্বরানুরাগও কপট। ধ্যান-ধারণায়

একজন মানুষ যতই দেখুক-শুনুক না কেন, তাকে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অনুভূতি কয় না, যদি তা' চরিত্রে, চলনায়, কর্ম্মদক্ষতায়, হৃদয়বত্তায় প্রতিফলিত হ'য়ে তার সত্তাকে ভাগবত ক'রে না তোলে। আর, মানুষের কাছে কা'রও জন্য যে চাইতে পার না, ওর মধ্যেও হীনত্ব-বুদ্ধি আছে। সবাই তোমরা ভাই-ভাই, দেওয়া-নেওয়ায় আপনবোধ বাড়ে—তুমি যা' পার অন্যকে দেবে, আবার প্রয়োজনমত অন্যের কাছ থেকে নেবে। এই সহযোগিতা ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? আর, প্রেসক্রিপসন করতে হয় simple (সরল) অথচ অব্যর্থ। ওর জন্য মাথা খাটান লাগে, ধ্যান করা লাগে। ওর মধ্যেই efficiency (দক্ষতা)। কি কোস্ তুই? আমার তো এইরকম মনে হয়।

কালীদা—আপনার কথাগুলি যুক্তির দিক দিয়ে ঠিকই মনে হয়, কিন্তু করা বড় কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কঠিন মনে করলেই কঠিন, করতে আরম্ভ করলেই সোজা। তাই ব'লে যে অসুবিধে নেই, কষ্ট নেই তা' বলি না' তবে করতে-করতেই আয়ত্তের মধ্যে আসে।

কলকাতা থেকে একটি নূতন দাদা এসেছেন, সঙ্গে তার মেয়ে। মেয়েটি ভাল গাইতে জানে। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুরোধ ক'রে বললেন—বাবা, আমার খুকীর বড় ইচ্ছা যে আপনাকে একটু গান গেয়ে শোনায়, আপনি যদি দয়া ক'রে শোনেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা।

তখন কেষ্টদার বাড়ী থেকে হারমোনিয়াম আনা হ'লো। মেয়েটি গানের উদ্যোগ করছে এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড় বৌকে ডাক্। সে গান শুনতে বড় ভালবাসে।

শ্রীশ্রীবড়মা এসে একপাশে দাঁড়ালেন।

—তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? আস, আমার কাছে এসে এখানে ব'সো—এই ব'লে বালিসটা সরিয়ে তক্তপোষের উপর বিছানায় জায়গা ক'রে দিলেন।

শ্রীশ্রীবড়মা সলজ্জভাবে বিছানার একপাশে এসে বসলেন। মাথায় ঘোমটা টানা। পরনে লাল চওড়া পাড়ওয়ালা শান্তিপুরে শাড়ী। হাতে শাঁখা ও চুড়ি। সদ্য স্নান করেছেন, কপালে ও সিঁথিতে জ্বল-জ্বল করছে সিঁদুর। কার্নিশের ধার দিয়ে রোদের আভা এসে পড়েছে বিছানায়। উভয়ের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আরো উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে সেই আভায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ আনন্দদীপ্ত, স্নেহ-

সিক্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। গান হবে তা'তে তাঁর অশেষ কৌতূহল। পাছে শ্রীশ্রীবড়মার বসতে অসুবিধা হয়, সেইজন্য তিনি সচেতন হ'য়ে পা-টা গুটিয়ে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে একত্র ঐ রকম দেখবার সুযোগ খুব কমই হয়। সবাই তাঁদিগকে একাসনে উপবিষ্ট দেখে খুব খুশি। আশ মিটিয়ে দেখছেন তাঁদের। আস্তে-আস্তে বেশ ভিড় জমে গেছে।

মেয়েটি গাইছে 'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন।' শ্রীশ্রীঠাকুর উদাস দৃষ্টিতে দূর আকাশের পানে চেয়ে আছেন।

এরপর আর-একটা গান হ'লো—রবীন্দ্রনাথের গান 'মন একলা চল, একলা চল, একলা চল রে।'

গানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর সপ্রশংস দৃষ্টিতে বললেন, 'খুব ভাল।' এইবার গানের আসর ভঙ্গ হ'লো। গানের শেষে অনেকে প্রস্থান করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেয়ে খেপুদার বারান্দায় এসে বসলেন হাতল-ওয়ালা একটা বেঞ্চিতে। খেপুদার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বললেন। এর মধ্যে ডাক এসে গেল। ভবানীদা (সাহা) চিঠি নিয়ে আসলেন।

ভবানীদা এক-এক ক'রে কতকগুলি চিঠি হাতে তুলে দিলেন, খামের চিঠি-গুলির মুখ কেটে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলি প'ড়ে নির্দ্দেশ দিয়ে দিলেন, কোথায় কী লিখতে হবে। পরে হাত ধুয়ে ফেললেন। একটা কুকুর এসে বসেছে বাবলা গাছ-তলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে মুখ ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুরও স্নেহভরে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

কুকুরটার আমার উপর কেমন একটা টান আছে। আমি যেখানে থাকি, ঘুরে-ঘুরে ও সেখানে হাজির হয়, আমার দিকে কেমন করুণভাবে চেয়ে থাকে, আমাকে কী যেন বলতে চায়।—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত সবার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

কালীদাসীমা—হয়তো আর-জীবনে ভক্ত ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্মান্তরের খবর যদি আমরা নাও জানি, এটা খুব ঠিক যে, এ জীবনে যার টান যেমন তার গতিও হবে তেমন।

এরপর হরিপদদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তেল মাখিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বাঁধের ধারে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে কলের কাছে একটি ভরা চৌবাচ্চায় নেমে পাঁচটি ডুব দিয়ে স্নান করলেন। তারপর গা'টা মুছলেন।

আহারান্তে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের ঘরের মধ্যে বিশ্রাম নিতে এসেছেন, হরিপদদা তাঁর মাথা আঁচড়ে দিলেন। মায়েদের মধ্যে অনেকে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে ঘরোয়া গল্প সুরু ক'রে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কী রাঁধিছিস্ সুশীলা ?

সুশীলাদি—লাউঘণ্ট, বড়ির ঝোল, পালনের চচ্চড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বা! সত্যং শিবং সুন্দরম্।......দ্যাখ্, তরকারির মধ্যে চিনেবাদামবাঁটা, তিলবাঁটা এই সব যদি দিস্ তাহ'লে কিন্তু খেতেও যেমন সুস্বাদু হয়, তেমন পুষ্টিপ্রদ হয়। এগুলি অভ্যাস ক'রে ফেলা লাগে, তোদের সবাইকেই বলছি।

শৈলমা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আদর ক'রে বললেন—আসছ ভুটনুন।

একজন শৈলমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন যে তিনি (শৈলমা) তাঁর সম্বন্ধে আর একজনের কাছে যা'-তাই বলছেন।

শৈলমা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—হ্যাঁ! ঠাকুরের কাছে খুব করে লাগাও।... দিদি যে বললো আমাকে, তার আর দোষ হলো না। তার কাছে যা' শুনেছি, তাই বলেছি। এখন দোষ হ'লো আমার। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বললেই হ'লো ? তুই সেটা মোকাবিলায় না মিলিয়ে, সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণ না ক'রে, তার নিন্দা-কথায় বিশ্বাস ক'রে আর পাঁচজনের কাছে একজনের বিরুদ্ধে গেয়ে বেড়াবি ? এ তোদের কেমন বিশ্রী স্বভাব ? আমার কিন্তু এসব মোটেই পছন্দ হয় না। মানুষের ভাল যেটা শোন, সেটাকে ঢাক পেটাও না। নিন্দাজনক কিছু শুনলে সেখানে তোমার বিশ্বাস ও যাজন-প্রবৃত্তি উথলে ওঠে—তাই না ? যা'তে মানুষের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়, বিরোধ বাধে, তাই তোমার বুদ্ধি। তোমার সঙ্গে সবার এবং সবার সঙ্গে সবার যা'তে ইষ্টানুগ মিল হয়, সেই বুদ্ধি নিয়ে চ'লে দেখ তো। তা'তে এর থেকে ঢের বেশী সুখ পাবে।

কথাবার্ত্তার পর সবাই বিদায় নিলেন। প্যারীদা প্রভৃতি দুই-একজন রইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘুমের সময় ঝাঁকিয়ে দেবার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু ঘুমুলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের পেছন দিকে বকুল গাছ-তলায় একটা হাতলওয়ালা বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। কাছে রয়েছে গাড়ু, গামছা, তামাক, টিকে, হুঁকো (গড়গড়া), কল্কে, পিকদানি, জলের ঘটি, সুপারির কৌটা ও দাঁত-খোঁটা। শ্রীশ্রীঠাকুর বেঞ্চের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পশ্চিমাস্য হ'য়ে হাতলের উপর বাম হাতখানি রেখে মনোরম ভঙ্গীতে আরামে বসেছেন। পায়ের উপর রোদ এসে পড়েছে—শীতের দিনে বেশ আমেজ বোধ করছেন। পরনে একখানি শান্তিপুরে ধুতি, তার খোটটা গায় দেওয়া। আর কিছু গায় নেই। এদিকে

শীতে কাতর, কিন্তু গরম কিছু গায়ে দেবেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে তাঁর কালো চটি। তামাক সেজে দেওয়া হয়েছে, গড়গড়ার নল টানছেন। নির্ব্বাক স্নেহদৃষ্টিতে সবাইকে নিরীক্ষণ করছেন। এক-এক ক'রে দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকেই সমবেত হয়েছেন। ছোট-ছোট ছেলেপেলেরাও এসেছে, তারা আশ্রম-প্রাঙ্গণে রোদে খেলাধূলো ও কলরব করছে। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, কিন্তু কি যেন এক নিবিড় শান্তি, অনাবিল তৃপ্তি, অনিবার্য্য আকর্ষণ। স্পর্শ তাঁর সর্ব্বদুঃখহরা, তাই তাঁকে দেখেই সুখ। ভক্তবৃন্দ নয়নমনভরে দেখছেন তাঁকে, অন্তরের মণিকোঠায় ভ'রে নিচ্ছেন আনন্দের অক্ষয় সঞ্চয়। এই শান্ত, স্নিগ্ধ, নিস্তরঙ্গ মধুর পরিবেশে মন ব'লে ওঠে—ঐ চরণ-সরোজই তো আনন্দের নিত্য ধাম, যুগযুগান্ত অনন্ত জীবন যেন ঐ আনন্দ-মকরন্দ-পানে মত্ত হ'য়ে থাকতে পারি।

চুপচাপ সবাই ব'সে।

এমন সময় ভেলকু এসে বললো—গোপালী! এই দ্যাখ আমি এটা সেলাই করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিমুখে)—বারে! বড় সুন্দর হইছে তো!—এই ব'লেই গানের সুরে বললেন—মা যশোদার আমার গুনের অন্ত নাই রে।

ভেলকু মহাতৃপ্তিভরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেলাই খুব ভাল ক'রে শেখ। এটা কিন্তু একটা কলা-বিশেষ। সুন্দরের আরতি যে হয় এর ভিতর-দিয়ে। মনে-মনে আঁচ করতে হয়, কোন্ রঙের সঙ্গে কোন্ রঙের সমাবেশ হ'লে মানায় ভাল। এমনি ভেবে নিয়ে হাতে-কলমে আবার সেটা ক'রে দেখতে হয়। এমনি ক'রে-ক'রে একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বোধ গজায়। সেই সৌন্দর্য্যবোধকে আবার সংসারের কাজে-কর্ম্মে, চলায়-ফেরায়, কথাবার্ত্তায়, সাজে-শয্যায় সব জায়গায় রূপ দিতে হয়। এমনি ক'রেই মানুষ সুন্দর হ'য়ে ওঠে, তখন সবাই তাকে ভালবাসে, আদর করে। রকমারি রং-বেরংয়ের সুতো তোর আছে তো। না থাকলে আমাকে বলিস্।

ভেলকু—আছে। এখন দরকার নেই, পরে দরকার হ'লে বলব।

সুধাদি বাড়ীর ভিতর আশ্রমের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের গান, আবৃত্তি, নাচ ইত্যাদি শেখাচ্ছেন, ঋত্বিক্-অধিবেশনের সময় তারা এই সব করবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কতকগুলি ছড়ায় সুর দেওয়া হয়েছে, তদনুযায়ী নাচের পরিকল্পনা করা হয়েছে। নৃত্য-গীতের ভিতর-দিয়ে পরিবেষণ করা হবে ছড়াগুলি। বাড়ীর ভিতর-থেকে গানের সুর ভেসে আসছে।

তাই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—ছড়াগুলি যে এমনি ওতরাবে, তা' আগে মনে করিনি। আমি কি ওসব পারি? কিন্তু কেষ্টদা তো ছাড়বার পাত্র নয়, আমাকে ট্যাংলায়ে-ট্যাংলায়ে কিভাবে আমাকে দিয়ে ক'রে নিচ্ছে। এখন ওরা যখন আমার সামনে পড়ে, আমার মনে হয় না যে আমি কইছি।

বঙ্কিমদা (রায়)—কতকগুলি ছড়ার কাব্য-ঐশ্বর্য্যও অপূর্ব্ব, বাংলা ভাষায় অমন কমই মেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কিছু কেরামতি নেই। সবই পরমপিতার দান। তিনি দিলে হয়, আমি ইচ্ছামত দিতে পারি না। আমার ওর উপর কোন দখল নেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে একবার শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন—বড় বৌ! খিদে পাইছে।

শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—কী দেব? ছানা আছে, বিস্কুট আছে, সন্দেশ আছে। যা' পছন্দ, দিতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছানাই একটু দাও।

শ্রীশ্রীবড়মা ছানা এনে দিলেন। ছানা খেয়ে মুখ ধুয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বের হলেন।

বেলা প'ড়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বেড়াতে যাব নাকি?

শরৎদা—গেলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদাকে ডাকেন।

কেষ্টদাকে ডাকা হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার রওনা হ'লেন।

কেষ্টদা, শরৎদা, শ্রীশদা, যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), রত্নেশ্বরদা, চুনিদা প্রভৃতি অনেকেই সঙ্গে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (কেষ্টদা ও শরৎদাকে লক্ষ্য ক'রে)—ইষ্টায়নীর ব্যাপারটি কিন্তু খুব ভাল ক'রে চারিয়ে দেবেন। খাতাগুলি প্রেস থেকে আসছে তো?

কেষ্টদা—হ্যাঁ! এসে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু কনফারেন্সের মধ্যে বললে হবে না। মাথা-মাথা কর্ম্মীদের নিয়ে আপনারা আলাদা বসবেন। সকলের মাথায় সংকল্প গজিয়ে দিয়ে আগুন ক'রে তোলা চাই। এটা কঠিন কিছু না, সবাই পারবে।

কেষ্টদা—হ্যাঁ! এটা খুবই সহজ। এ পর্য্যন্ত যতজনের সঙ্গে আলাপ করেছি, সবারই দেখলাম খুব positive (কৃতনিশ্চয়) ভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কনফারেন্সে সব জায়গা থেকে লোক যা'তে আসে, সেদিকেও

লক্ষ্য রাখবেন। প্রোগ্রাম যেমন পাঠাবেন, সঙ্গে-সঙ্গে বিশিষ্টদের কাছে চিঠি-পত্রও দেবেন। এক-একজনের কাছে ২।৩ খানা ক'রে চিঠি গেলে ভাল হয়। আপনি লিখবেন, শরৎদা লিখবে, প্রফুল্ল লিখবে। তা'তে জোর হবে। এখান থেকে কেউ বাইরে গেলে তাকেও ব'লে দেবেন, সে যা'তে মুখে-মুখে সকলকে বলে। মোটপর যতরকম ভাবে যা' করা যায়, তার কোনটা বাদ রাখবেন না।

কেষ্টদা—আচ্ছা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, আমার যেন কেমন নেশার মত হয়। যেটা করব ব'লে মনে করি, সব দিক দেখে-শুনে তার আট-ঘাট, অন্ধি-সন্ধি সবটা ঠিক ক'রে, হাতে-কলমে ক'রে সিদ্ধিতে এসে না দাঁড়াতে পারলে আমি যেন সোয়াস্তি পাই না। ঐ ধ্যান আমার মাথায় লেগেই থাকে। এই ভাবেই মানুষ সিদ্ধার্থ হয়। আপনারাও যদি ঐ রকম ক'রে লাগেন, দেখবেন এক-একজন কত বড় সিদ্ধার্থ হ'য়ে উঠবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে-আস্তে হাঁটছেন, মাঝে-মাঝে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে খানিকটা বলছেন। সহজভাবে কথা বলছেন, কিন্তু তার মধ্যে একটা তীব্র বেগ আছে, যা বুকের মধ্যে তীরের মত গিয়ে বেঁধে। আবার বলছেন—কৃতী হ'তে যে হাতী-ঘোড়া কিছু লাগে, তা' নয়। প্রথম কথা—করণীয়-সম্বন্ধে clear conception (স্পষ্ট ধারণা) চাই—কী করব, কেমন ক'রে করব, এর অন্তরায় কি-কি আসতে পারে, সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করব কেমনভাবে, কাজটা উদ্‌যাপন করতে কি-কি প্রয়োজন, তা' কোথা থেকে, কার কাছ থেকে কি-ভাবে জোগাড় করব, কার-কার সহযোগিতা আমার প্রয়োজন হবে, তার মধ্যে কে-কে আমার আয়ত্তের মধ্যে আছে, কে নেই, তাকে সরাসরি ধরব, না আর কাউকে দিয়ে ধরলে সুবিধা হবে, কাজ হাসিল করতে গেলে কোন্‌-কোন্‌ step (পর্যায়)-এর মধ্য-দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে, তার জন্য পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত হ'তে হবে কতখানি, কেমন ক'রে, একটা দিককার চেষ্টা যদি নিষ্ফল হয়, তখন কি করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে গভীরভাবে লাগাজোড়া চিন্তা ক'রে একটা সর্ব্বাঙ্গপুষ্ট ছবি মাথায় এঁকে নিতে হবে। আর সেই চিন্তা-অনুযায়ী বাস্তবে লেগে যেতে হবে। এইভাবে চললে কৃতকার্য্যতা অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। যারাই কৃতী হয়, তারাই এইভাবে হয়। তবে মানুষের যদি কোন প্রীতিকেন্দ্র না থাকে, এবং তার করাগুলি যদি তৎপ্রীত্যর্থে না হয়, তবে দুনিয়ার নানা আকর্ষণ এবং প্রবৃত্তির রকমারি বিক্ষেপ ও বিক্ষোভ তার ঐ চিন্তা ও চেষ্টাধারা হ'তে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আর চিন্তা ও চেষ্টায় ক্রমাগতি ও সঙ্গতি না থাকায় সে সফল হ'তে

পারে না। তখন সে ভাগ্যের দোষ দেয়, কিন্তু ঐ ভাগ্য যে সে নিজের ভজনা দিয়েই সৃষ্টি করেছে, তা' আর বোঝে না।

হাঁটতে-হাঁটতে শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানার কাছাকাছি এসেছেন। কারখানায় তখন সুধীরদা (দাস) প্রভৃতি কাজ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানায় ঢুকে ঘুরে-ঘুরে কাজ-কর্ম্ম দেখলেন। কাজ-কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ দিলেন। একটা নূতন ধরণের ল্যাম্প তৈরী করতে বললেন। সুধীরদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ভাল ক'রে বুঝতে পারছিলেন না। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—কাগজ-পেন্সিল দে তো দেখি।

কাগজ-পেন্সিল দেবার পর সুধীরদাকে কাছে ডেকে একটা ডায়গ্রাম এঁকে দেখিয়ে দিলেন, কী করতে হবে, কেমনভাবে করতে হবে।—এইবার বুঝলি তো? —হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

সুধীরদাও খুশি হ'য়ে বললেন—হ্যাঁ!

ঘুরতে-ঘুরতে একটা জায়গায় এসে বললেন—এ মেসিনটায় কতদিন হাত দিস্ না? এটায় মরচে পড়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে সবগুলিই নাড়াচাড়া করতে হয়, তেল-টেল দিতে হয়। মানুষ, গরু, মেসিন যার কাছে থেকেই কাজ পেতে চাও, তাকেই যত্ন করতে হয়, সুস্থ রাখতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে একটু বসলেন, ব'সে তামাক খেলেন। তারপর বেরিয়ে কেমিক্যাল ও বিশ্ববিজ্ঞানের পাশ দিয়ে সদর রাস্তায় এসে পড়লেন।

তখন সূর্য্য ডুবে গেছে, আলোছায়ার মিলিত ম্লান আলোকে ধূসর আভা ধারণ করেছে পল্লীপ্রকৃতি। ডোবার পাশে বাঁশঝাড়ে কতকগুলি পাখী একটানা কিচিরমিচির করছে। একটা বাছুর ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটছে।

তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—মানুষ, গরু, জীবজন্তু সবাই বাঁচে ভালবাসার টানে। বাছুরটাও দেখেন মা'র টানে, ঘরের টানে কেমন ক'রে ছুটছে।

আর কোন কথাবার্ত্তা নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার বেশ দ্রুত হাঁটছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দার বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'বড় খোকা কেমন আছিস্ রে'?

বড়দা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বাইরে এসে বললেন—ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সোজা এসে বাঁধের ধারে তাসুতে বসলেন।

মাতৃমন্দিরের দোতালায় তখন আশ্রমের মেয়েরা শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়ে সান্ধ্যস্তোত্রাদি পাঠ করছে। বিভিন্ন বাড়ী থেকে বিনতির সুর ভেসে আসছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় নীরব থাকলেন।

খানিকটা বাদে অমূল্যদা (চক্রবর্ত্তী) ব'লে একজন উকিল আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ঠাকুর! আপনি আমাকে ঋত্বিকের পাঞ্জা দিয়েছেন। কিন্তু ওকালতি ও ঋত্বিকতা একেবারে পরস্পর-বিরুদ্ধ। আমার এ ওকালতি আর ভাল লাগে না, কিন্তু সংসারের জন্য না ক'রেও পারি না। মনে হয়, তেমনি সঙ্গতি থাকলে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে শুধু যাজন নিয়েই থাকতাম। এখন যেন দোটানার মধ্যে আছি। ওকালতিতে কেবল মিথ্যা নিয়ে কারবার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রাহ্মণের ছেলে তুমি, তুমি শুধু যাজন নিয়ে থাক, সে তো খুব ভাল কথা। খাঁটি ঋত্বিক্ যদি হ'তে পার, তখন আর পেটের ভাবনা ভাবা লাগবে না। যজমানেরাই তখন তোমাকে দেবার জন্য পাগল হ'য়ে উঠবে। তুমি দয়া ক'রে গ্রহণ করলে তারা বর্ত্তে যাবে। সে-দিক দিয়ে শুধু ঋত্বিকতার কাজ নিয়ে থাক, তা'তে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তুমি যে বলছ, ঋত্বিকতা ও ওকালতি পরস্পর-বিরুদ্ধ, ওখানে আমি একমত নই। 'সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণং।' যে-কথায় লোকের মঙ্গল হয়, মানুষ বিপদ থেকে ত্রাণ পায়, তা' সত্য বই আর কিছু নয়। উকিলের কাজও তো তাই, বিপন্নকে রক্ষা করাই তার কাজ।

অমূল্যদা—ধরুন, একজন খুনী যদি আমার আশ্রয় নেয়, আর আমি যদি তাকে আমার বুদ্ধির জোরে খালাস ক'রে আনি, তা'তে ক'রে তা'কে তো খুনের ব্যাপারে আরো উৎসাহিত ক'রে তোলা হবে। তাই বিপদ থেকে ত্রাণ করাই কি সব ক্ষেত্রে মঙ্গলপ্রদ? বরং শাস্তি পেলে সে শোধরাতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তুমিই যদি সেই খুনী হও, তাহ'লে তুমি কী চাও? তুমি কি উদ্ধার পেতে চাও না? যতদিন তোমার প্রাণে ব্যথাবোধ আছে, ততদিন আর্ত্তের ত্রাণ তোমার ধর্ম্ম। কেউ যখন আর্ত্ত, তখন যদি তুমি বাস্তবভাবে তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হও, এবং অপকর্ম্ম থেকে সে যা'তে প্রতিনিবৃত্ত হয়, অনুতাপ, অনুশোচনা ও দরদবোধ জাগিয়ে সেইভাবে তাকে অনুপ্রাণিত ক'রে তোল —সৎ-এ উদ্বুদ্ধ ক'রে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তার বিপদমুক্তির ব্যবস্থা কর, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়েই বরং তার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকে। কেউ অপরাধ করেছে ব'লে তার প্রতি যদি নিষ্ঠুর হও, সে যদি দুনিয়ায় কোথাও আশ্রয় না পায়, এক নির্দ্দয় কারাগারের আশ্রয় ছাড়া,—তুমি কি মনে কর, সে সেখান থেকে সমাজ-হিতৈষণার সাধু প্রেরণা নিয়ে বের হবে? সে কি সমাজের পক্ষে আরো ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়াবে না? এক প্রাণদণ্ডের বিধান ক'রে হয়তো তার হাত থেকে

বাঁচাতে পার সমাজকে। কিন্তু তার মধ্যে তো কোন কৃতিত্ব নেই। হিংস্র পশুজগতেও তো এমনতর সুবিচারের নমুনা হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা তো শিক্ষা, সভ্যতার গর্ব্ব ক'রে থাক। অবশ্য, সংশোধনী শাস্তির প্রয়োজন নেই, এ কথা আমি বলি না। এ তো গেল এদিককার কথা, আর শুধু অপরাধীই যে উকিলের আশ্রয় নেয়, তা' তো নয়, অত্যাচারিত, উৎপীড়িত ও বঞ্চিত হ'য়েও তো মানুষ আসে, তাদের বাঁচানও তো ধর্ম্ম। তাই মক্কেল যে যেমনই হোক, তারও সমাজের মঙ্গলের দিকে চেয়ে যে-ক্ষেত্রে যেমন বিহিত তাই করতে হবে। সে দিক-দিয়ে আমার মনে হয়, ঋত্বিকতা ও ওকালতি বিরুদ্ধ কাজ তো নয়ই, বরং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক।

অমূল্যদা—আপনি যা' বললেন, তার উপর আর কথা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বললাম ব'লে নয়, কথাটা যুক্তিযুক্ত কিনা, বাস্তবতার দিক-দিয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গী কার্য্যকরী কিনা।

অমূল্যদা—হ্যাঁ।

এরপর কেষ্টদা আসলেন। কেষ্টদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বসেন কেষ্টদা! গপ্প করি।

কেষ্টদা যুদ্ধের খবরাখবর বলতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—হিটলার শক্তিমান খুব, কিন্তু কূটনীতির দিক-দিয়ে একটু খাটো মনে হয়। শক্তিমত্তা ও কূটনীতিজ্ঞান এই দুয়ের সার্থক সমাবেশ হ'লে মানুষ অপরাজেয় হ'য়ে ওঠে।

কেষ্টদা—যাজনের বেলায়ও এ-কথা খাটে। সেখানে শক্তিমত্তা মানে হবে চরিত্রবল ও বোধসম্পদ্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল কথা কি জানেন? আসল কথা ঐ ভালবাসা। ওতে সব গজিয়ে ওঠে। আমরা থাকি প্রবৃত্তি-রঙ্গিল হ'য়ে, আমাদের ক্ষুদ্র জগতেই আমরা ঘুরপাক খাই। নিজে ছাড়া অন্য কেউ যদি আমাদের সত্যিকার স্বার্থ হয়, কারও প্রতি যদি তার জন্য টান হয়, তবে মনে সেই রং ধরে। নিয়ন্ত্রিত-বৃত্তি কোন মানুষের প্রতি যদি তাঁর জন্য টান হয়, তবে আমাদের প্রবৃত্তিগুলিই adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে luminous glow (প্রোজ্জ্বল বিভা) ছড়াতে থাকে। Sincerely (একনিষ্ঠভাবে) ভালবাসতে যে জানে, সে ত'রে যায়। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে ভালবাসতে গিয়ে নিজেকে ভুললো, ভালবাসা জিনিসটা বুঝলো, তাই চিন্তামণির এক কথাতেই তার জীবন ঘুরে গেল। তখন তার সংস্পর্শে আবার কতলোক ভক্তিরসে আপ্লুত হ'য়ে উঠলো। ভক্তি-ভালবাসাময় মানুষের

জীবনটাই যাজন। ভাবভক্তির অধিকারী যে—বাস্তব সক্রিয়তায়, বাঞ্ছিতকে নিয়েই অহরহ ব্যাপৃত যে, তাঁকে নিয়েই যে মাতাল—এমন লোক দেখাও পুণ্য, তা'তে অন্তরে ভক্তির উন্মেষ হয়। তাই প্রকৃত ভক্তই হয় যাজন-জৈত্র। অমনতর ভক্তকেই বলা যায় সাধু। তাই সাধুসঙ্গের গুণ শাস্ত্রে অতো ক'রে লেখা আছে।

ললিত-মধুর ভঙ্গীতে বলছেন শ্রীশ্রীঠাকুর, তাঁর চোখে-মুখে করুণা ও প্রীতির প্লাবন।

কেষ্টদা—'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ, পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্'—এর মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি নরবিগ্রহ ধারণ ক'রেও যা' তাই আছেন। তাঁর মধ্যে সবখানিই সংহত হ'য়ে আছে, কিছুই খতম হয়নি, ব্যক্ত, অব্যক্ত উভয়-সীমা অতিক্রম ক'রে তিনি আছেন, ব্যক্তিত্বে ব্যক্ত হয়েছেন ব'লে তাঁর অব্যক্ত স্বরূপ মুছে যায়নি। নির্ব্বুদ্ধিরা এইটুকু না বুঝে তাঁকে চেতনাহারা সাধারণ ব্যক্তি ব'লেই মনে করে।

এরপর কেষ্টদা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসীমাকে বললেন—বড়বৌ-এর কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আয় তো আজ কী ব্যবস্থা।

কালিদাসীমা শুনে এসে খবর দিলেন—মুগের ডালের মধ্যে কফি, কলাইশুটি এই সব দিয়ে ঘন ক'রে রান্না করা হয়েছে, আর হয়েছে একটা পাতলা ঝোল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুগের ডালে কফি দিয়ে ভাল ক'রে রান্না করলে মুড়িঘণ্টর মত লাগে।·········

প্রফুল্লকে লক্ষ্য ক'রে—তুই রুই মাছের মুড়িঘণ্ট খাইছিস্ ?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন লাগে ?

প্রফুল্ল—খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতীন আচার্য্যি কাঁঠাল রাঁধতো এমন ক'রে যে, তার কাছে মাংস কোথায় লাগে! যারা মাছ-মাংস খায়, তারাও সেই কাঁঠালের তরকারি পেলে আর কিছু চাইত না।

শৈলমা এসে বাইরে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর পট ক'রে তার মুখে টর্চ্চ ফেললেন।

শৈলমা চোখ বন্ধ ক'রে হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কালো হলিও সুন্দরী আছে—কি বলিস্ সুরমা ?

সুরমা-মা—আপনার কাছে তো সবাই সুন্দর। আমাদের সবাইকে আপনি নিজের ছেলেমেয়ের মত দেখেন, তাই আপনার চোখে সুন্দর বইকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুমোরখালির মাকে দেখছি না কাল থেকে। তার শরীর ভাল তো ?

সুরমা-মা—মা'র খুব সর্দ্দি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ-টষুধ দিচ্ছিস্ তো ? বুড়ো মানুষ খুব সাবধানে রাখিস্।

সুরমা-মা—ওষুধ দেওয়া হইছে। কালকের থেকে আজ একটু কম।······ একটু বাদে সুরমা-মা বললেন—আমার একটু প্রাইভেট আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—'হটিও, প্রাইভেট'।

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, হাসতে-হাসতে স'রে গেলেন।

সুরমা-মা অনেক সময় ধ'রে তাঁর কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ সহকারে শুনে যা' বলবার ব'লে দিলেন। এর একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর খাওয়া-দাওয়া ক'রে শুয়ে পড়লেন।

৬ই পৌষ, রবিবার, ১৩৪৮ (ইং ২১।১২।৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে উঠে বাঁধের ধারে তাম্বুতে বিছানায় ব'সে আছেন। তাঁর চোখে-মুখে আনন্দের লহর এবং আপন-করা হাসির ছটা। সেই আনন্দ, সেই হাসি সকলকেই আমন্ত্রণ করে, সকলকেই আকর্ষণ করে। বিমলদা (মুখোপাধ্যায়) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকর ইঙ্গিত ক'রে বসতে বললেন। বিমলদা তাম্বুর ভিতর ঢুকে একপাশে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিমলদার দিকে চেয়ে মৃদু-মৃদু হাসছেন, কেবলই হাসছেন। আকুল-করা, পাগল-করা অনির্ব্বচনীয় সে হাসি। বিমলদাও চোখ ফেরাতে পারছেন না, বিহ্বল হ'য়ে চেয়ে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে। মুখে তাঁর সলজ্জ ঔজ্জ্বল্য, চোখে তাঁর আনন্দের অশ্রু। চেহারা দেখে মনে হয়, ভিতরে যেন কি রূপান্তর চলেছে। এমনি ক'রেই বোধ হয় স্রষ্টার গূঢ় স্পর্শে সৃষ্টির বুকে জাগে গভীরতর জীবন। প্রভাতের এই শুভক্ষণে এখন জাগরণের পালা, জেগে উঠেছেন সবিতৃদেব, জেগে উঠেছে এই ধরণী তার সমগ্র জীব-জীবন নিয়ে, আর ধরণীধর জেগে ব'সে আছেন সবাইকে 'জাগৃহি' মন্ত্রে উদ্বোধিত ক'রে তুলতে। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ

পায়ের নীচে কোলবালিশটা টেনে দিয়ে আঁটসাঁট হ'য়ে ব'সে বললেন—তামুক খাওয়াও।

হরিপদদা (সাহা) তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাস্ কোথায় ?

হরিপদদা—টিকে ফুরিয়ে গেছে, টিকে আনতে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টিকে নেই, তা' আগে এনে রাখতি হয়। সব ব্যাপারে সজাগ থাকা লাগে। ছোটখাট কাজে, সব ব্যাপারে সজাগ প্রস্তুতি যদি না থাকে, তবে চৈতন্যের রাজ্যেরও দরজা খুলবে না ঠিক জেনো। (সহাস্যে)—যা', দৌড় মেরে নিয়ে আয়।

হরিপদদা তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন টিকে আনতে, এক মিনিটের মধ্যে টিকে নিয়ে এসে হাজির হলেন। আস্তে-আস্তে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ঈষদাদা (বিশ্বাস) প্রভৃতি অনেকে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছুটে আসতে কষ্ট হ'লো ?

হরিপদদা (সহাস্যে)—না, কষ্ট কি ? দৌড়ে যাওয়া-আসায় এত শীতের মধ্যেও আমার গরম লাগছে।—হরিপদদা আলোয়ানটা তাসুর পশ্চিমদিকের জানলার পাশে রেখে তাড়াতাড়ি তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (তামাক খেতে-খেতে)—এই যে টিকে না থাকার দরুন আমাকে তামাক দিতে একটু দেরী হ'লো, উঠে-প'ড়ে লেগে এই অগোছাল অভ্যাসটা যদি না তাড়াও, তাহ'লে অন্যান্য ব্যাপারেও কিন্তু এটা ঢুকে পড়বে। আমি যখন যা' বলব, তখন তা' ক'রে উঠতে পারবে না। ফলে অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অভ্যাসের গোলমালে এইভাবে অনেক অসঙ্গতি আসে। সেইজন্য নিজের এতটুকু ত্রুটিকেও ক্ষমা করতে নেই। যখনই যেটা চোখে পড়ে, তখনই সেইটে ঠিক ক'রে ফেলতে হয়। আবার, ত্রুটি হ'লো ব'লে ঘাবড়ে যেতে নেই, তখন আরো রোখ ক'রে লাগতে হয়, কেমন ক'রে এর হাত থেকে রেহাই পাব।

হরিপদদা এবং উপস্থিত সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

বিমলদা তপোবনের prospectus (অনুষ্ঠানপত্র) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কোন-কোন জায়গায় ভাষা পরিবর্ত্তন ক'রে দিতে বললেন।

কথায়-কথায় বিমলদা বললেন—টাকার consideration-এ (চিন্তায়) অনেক সময় আমরা তপোবনের Ideal (আদর্শ) থেকে deviate করি (বিচ্যুত হই)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ভাল না। শালা ওতে কি কাম হয়? তা'তে চিরকাল ছ্যাঁচড়ামি ক'রে চলতে হবে। জাতও যাবে, পেটও ভরবে না। তার চাইতে কিছুদিন কষ্ট ক'রে খাঁটি জিনিসটা যদি দাঁড় করাতে পারেন, তখন দেখবেন আর অভাব থাকবে না। অভাব যদি থাকেও, লাখ কষ্টও যদি করেন, আর দেশের সামনে, দুনিয়ার সামনে, মানুষগড়া-শিক্ষার নমুনাটা যদি দেখিয়ে যেতে পারেন, সে-অভাব, সে-কষ্টেরও একটা সার্থকতা আছে। হাজার-হাজার, লাখো-লাখো, কচি-কচি শিশুরা আপনাদের দৌলতে, আপনাদের প্রবর্ত্তনায়, আনন্দে মানুষ হ'য়ে বেড়ে উঠবে, সেই সুখের দৃশ্য কল্পনা ক'রেও তো তৃপ্তিতে পেট ভ'রে ওঠে। আর ১৩০ টাকার স্বাক্ষরকারী, যা' আপনারা সংগ্রহ করবেন ব'লে পরিকল্পনা করেছেন, তা' শেষ ক'রে ফেলেন। দেখেন আমি বাজের মত লেগে যাবোনে। মন্তরের মত কাম হ'য়ে যাবি। (হাতে তুড়ি দিয়ে, চোখ-মুখের বিচিত্র ভঙ্গী ক'রে উল্লাস সহকারে)—'আর কি পারে, আঁখি ঠেরে উধাও যাই চ'লে।'

প্রতিটি কথার উচ্চারণে অনন্ত আশা, আশ্বাস ও ভরসার অনুরণন। সবাই মাতোয়ারা।

কলকাতা থেকে আগত একটি দাদা তাঁর কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহাসান্তপন করছেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ক'দিন হ'লো রে?

দাদাটি ক্ষীণস্বরে উত্তর দিলেন—আজ চার দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উৎসাহভরে)—তাহলি তো পাড়ি দিছিস্ আর কি?·········কি, খুব দুর্ব্বল লাগে নাকি?

উক্ত দাদা—মাঝে-মাঝে খুব তেষ্টা পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেষ্টা পেলেই পট ক'রে তখনই জল খেয়ে বসিস্ না যেন। যেমন-যেমন নিয়ম আছে, কাঁটায়-কাঁটায় মেনে চলবি। এ কিন্তু এক রকমের treatment (চিকিৎসা)। এর প্রত্যেকটা বিধানের সার্থকতা আছে। Sodomy (পুং-মৈথুন) ইত্যাদি অবৈধ আচরণের ফলে psychical (মানস) ও physiological plane-এ (শারীর-স্তরে) যে-সব damage (ক্ষতি) হয়, এই প্রায়শ্চিত্তে তার অনেকখানি প্রতিকার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেবীকে বললেন—তুই ওর 'পর লক্ষ্য রাখিস্। প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে যা' দরকার হয়, জোগাড় ক'রে দিস্।

দেবী (চক্রবর্ত্তী)—আচ্ছা।

কেষ্টদা—ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদির যে কি অমোঘ প্রভাব, তা' না করলে বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ভেবে দেখুন, আমাদের ঋষিরা কী জিনিস দিয়ে গেছেন, কী জিনিস রেখে গেছেন। জীবন-গঠনের এমন বিজ্ঞান আর পাবেন না। আপনারা যে-সব পরিবারে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, সদাচার ইত্যাদি চারিয়ে দিয়েছেন, তাদের দিকে চেয়ে দেখেন, তাদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে। ভুলভ্রান্তি, দোষত্রুটি সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের পথে এগিয়ে চলেছে। বংশ-পরম্পরায় এইভাবে যদি চলে, দেখবেন দেশ সোনার দেশ হ'য়ে উঠবে। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।' এই সঙ্গে-সঙ্গে যদি বর্ণাশ্রম, উপযুক্ত সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ, উপনয়ন-গ্রহণ এবং দশবিধ-সংস্কারের অন্যান্য সংস্কারগুলি যথাযথভাবে চারিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে দেখতে-দেখতে ভোল বদলে যাবে। জানবেন, এ-কথা আমার শুধু হিন্দু, মুসলমান বা ভারতীয়ের জন্য নয়, এ-কথা পৃথিবীর প্রত্যেকের জন্য। আপনাদের শাস্ত্র সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অনুশাসনে ভরা! সত্তা-সম্বর্দ্ধনা যারাই চায়, তারাই এ-থেকে জীবনীয় লওয়াজিমা সংগ্রহ করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একবার প্রস্রাব করতে উঠলেন। প্রস্রাব ক'রে ফেরার পথে পূজনীয়া ছোটমার কাছে খোঁজ নিলেন—কাজলা কেমন আছে?

ছোটমা বললেন—একটু ঠাণ্ডা লেগেছে। গলাটা ভার হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ দিছ?

ছোটমা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারীকে দেখাও। গোড়া থেকে সাবধান হওয়া ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর আশুকে বললেন—প্যারীকে ডাক তো। প্যারীদা না আসা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

আশু (ভট্টাচার্য্য) প্যারীদাকে ডেকে আনলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজলাকে দেখ্ তো ভালো ক'রে। (এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে তাম্বুতে এসে বসলেন।)

ক্রমেই লোক বাড়তে লাগলো।

মালদহের এক দাদা আজ বাড়ী ফিরে যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় নিতে এসেছেন। তিনি করুণ কণ্ঠে বললেন—বাবা! আজ বাড়ী যেতে হবে, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে, এ আনন্দধাম ছেড়ে যেতে মন আমার সরছে না। সংসারে অনেক শোক-তাপ-দাগা পেয়েছি, অকৃত্রিম ভালবাসা আর

কোথাও পাইনি, এক আপনার কাছে ছাড়া (বলতে-বলতে ভদ্রলোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন)।

—লক্ষ্মী আমার ! কাঁ'দো না ! পরমপিতার নাম কর। সুখে থাক। যখন ফাঁক পাও, চ'লে আ'সো। কাছেই তো।—আদরের সুরে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসলেন। বললেন—তোমাদের ওখানে খুব ভাল আম পাওয়া যায়, তাই না ?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমের সময় কিছু ভাল আম পাঠিও।······কি রে ইয়াদালি, ফজলি খাবু নাকি ? (ইয়াদালি অদূরে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছিল)।

ইয়াদালি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বুঝতে না পেরে প্রশ্নসূচকভাবে বললো—জে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফজলি, ফজলি·········ফজলি আম খাবু ?

ইয়াদালি একগাল হেসে সম্মতি জানালো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন না কিন্তু। সময় আসুক। যদি পরমপিতা জোগান। এই ভাইয়ের বাড়ীতে ভাল-ভাল ফজলি হয়, সময়মত পাঠাবে বলছে।

ইয়াদালি—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের এই আদেশ পেয়ে ভদ্রলোক খুশি হ'য়ে উঠলেন। চোখ-মুখের বিষণ্ণভাব বদলে গেল, আনন্দদীপ্ত মুখশ্রী নিয়ে আর একবার প্রণাম ক'রে তিনি বিদায় নিলেন। ভদ্রলোক অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যখন চ'লে যায়, আমারও মনটা তখন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। মানুষ যত আসে, যত কাছে থাকে, ততই আমার ভাল লাগে। যেখানে যত মানুষ আছে, সবাই আসে, সকলে মিলে একত্র গুলতানি করতে পারি, আনন্দ করতে পারি, তাহ'লে বেশ হয়।

ঈষদাদা—ইষ্টভৃতির অঙ্গ হিসাবে ইষ্ট, ইষ্টভ্রাতা ও ভূতগণের জন্য তিনটে আলাদা নৈবেদ্য রোজ বাস্তবভাবে নিবেদন করলে আমার মনে হয় ইষ্টভৃতি ঠিক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভ্রাতৃভোজ্য ও ভূতভোজ্যও উৎসর্গ করতে হবে ইষ্টপ্রীতিকে লক্ষ্য ক'রে, সবটা মিলে integrated (সংহত) একটা জিনিস। নিজের ভরণের কথা ভাববার আগে আমরা ভাবব আমাদের ইষ্ট, গুরুজন, গুরুভ্রাতা ও ভূতগণের ভরণের কথা, ও বাস্তবভাবে যেজন্য যতটা পারি করব। এর ভিতর-

দিয়েই আমাদের মগজে ঢোকে যে, ইষ্টসেবা ও ইষ্টার্থে পরিবেশের সেবাই আমাদের জীবনে মুখ্য। এই চিন্তাটা যদি আমাদের মাথায় ও আচরণে ঢোকে, তাহ'লে কিন্তু দারিদ্র্য, অযোগ্যতা ও অলক্ষ্মী আর সেখানে ঠাঁই পায় না। ইষ্টভৃতি তাই ধর্ম্মের অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধির একটা corner stone (প্রধান ভিত্তি-প্রস্তর)। ইষ্টভৃতি হিসাবে নিত্য ভোজ্য বা নৈবেদ্য উৎসর্গ করাই বিধি। তবে তা' রাখা এবং ঐ জিনিসই মাসান্তে ইষ্টস্থানে পৌঁছে দেবার বাস্তব অসুবিধা আছে। তাই ভোজ্যের অনুকল্পে পয়সা রাখা চলে।

ইষ্টভৃতি করার সময় নিত্য ইষ্টভৃতি, ভূতভোজ্য ও ভ্রাতৃভোজ্য যদি আলাদা-আলাদা ক'রে আলাদা তিনটে কৌটায় বা ন্যাকড়ায় বেঁধে earmark (চিহ্নিত) ক'রে রাখ, তা'তেও কোন দোষ নেই। সারা মাসে যে-বাবদ যেমন নিবেদিত হ'লো, সেই অনুযায়ী মাসের শেষে দেবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে ইষ্টভরণই মুখ্য, ঐটেই গুঁড়ি, ভূতভোজ্য ও ভ্রাতৃভোজ্য ওরই শাখা। শুধু ভূতভোজ্য বা ভ্রাতৃভোজ্যের কোন দাম নেই, যদি একজন ইষ্টভৃতি না করে। ইষ্টভৃতির আনুষঙ্গিক হিসাবেই ভূতভোজ্য ও ভ্রাতৃভোজ্য। অবশ্য, ইষ্টভৃতির পূর্ণাঙ্গতার জন্য ভূতভোজ্য ও ভ্রাতৃভোজ্য অবশ্য দেয়। তিনটি আলাদা নৈবেদ্য উৎসর্গ করার প্রসঙ্গেই আমি এত কথা বলছি। আলাদা নিবেদন করা যেতে পারে ব'লে কেউ যেন মনে না করে যে ঐগুলি তুল্য মূল্যের। আলাদা হ'লেও আলাদা নয়, সবটা মিলে ইষ্টভৃতি পূর্ণ হয়, এই যা' কথা। এবং ভ্রাতৃভোজ্য, ও ভূতভোজ্য, ইষ্টভৃতি ও ইষ্টপ্রীতিকেই লক্ষ্য ক'রে। প্রত্যেক ৩০ দিনের দিন দক্ষিণা ও সংগঠনী-সহ ইষ্টভৃতি দেওয়াই বিধি। আগে ইষ্টভৃতি দিয়ে বা পাঠিয়ে তারপর ভ্রাতৃ ভাজ্য ও ভূতভোজ্য দানের কথা। আবার, কেউ যদি ভ্রাতৃভোজ্য ও ভূতভোজ্য রোজ না রাখে, এবং মাসের শেষে নিবেদিত ইষ্টার্ঘ্য পুরোপুরি ইষ্টস্থানে পাঠিয়ে আলাদা ক'রে ঐটে দেয়, তাহ'লেও চলতে পারে। পরিবেশের সেবার ব্যাপারে আমরা যেন এই concentric (সুকেন্দ্রিক) ধাঁজটা অক্ষুণ্ণ রাখি। তাকেই বলে ইষ্টপ্রাণ সেবা। তার মাধ্যমেই মানুষকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলা যায়, ইষ্টপ্রাণ ক'রে তোলা যায়। তা'তেই মানুষ ত'রে যায়। নচেৎ মানুষের বৃত্তিতে তেল মালিস করাই সার হয়। তুমি নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়েও কারও সত্যিকার কিছু করতে পার না। তোমাকে সবাই exploit (শোষণ) করতে সুরু ক'রে দেয়, নিজেদের প্রবৃত্তি-পোষণের জন্য। তা'তে নিজের ও অন্যের খারাপ ছাড়া ভাল কিছু হয় না। ওতে তারাই যোগ্য হয় না, শক্তিমান হয় না, সুনিয়ন্ত্রিত হয় না।

কেষ্টদা—ইষ্টভৃতি ভাল ক'রে পালন যারা করে, তারা এই যুদ্ধে বোমা চাপা পড়বে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না পড়াই সম্ভব। ভাল ক'রে কিছুদিন এ-সব করলে একটা intuition (অন্তর্দৃষ্টি) develop করে (বিকশিত হয়), তার দরুন আগে থাকতে টের পেয়ে সাবধান হ'তে পারে। James (জেম্‌স্‌) কী বলেছে তো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিত করতেই কেষ্টদার বাড়ী থেকে প্রফুল্ল উইলিয়ম জেম্‌সের Selected Papers (নির্ব্বাচিত নিবন্ধরাজি) বইখানি নিয়ে আসলেন।

কেষ্টদা সেই বই থেকে পড়লেন—Keep the faculty of effort alive in you by a little gratuitous exercise everyday. That is, be systematically ascetic or heroic in little unnecessary points, do everyday or two something for no other reason than that you would rather not do it, so that when the hour of dire need draws nigh, it may find you not unnerved and untrained to stand the test. Asceticism of this sort is like the insurance which a man pays on his house and goods. The tax does him no good at the time, and possibly may never bring him a return. But if the fire does come, his having paid it will be his salvation from ruin. So with the man who has inured himself to habits of concentrated attention, energetic volition and self-denial in unnecessary things. He will stand like a tower, when everything rocks around him, and when his softer fellow-mortals are winnowed like chaff in the blast. অর্থাৎ, মানুষ যদি স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহে নিত্য তপস্যা-পরায়ণ হয়, শুভার্থে উৎসর্গপরায়ণ হয়, তবে ঐ তপপ্রাণতায় তার মধ্যে এমন শক্তি সঞ্চিত হয় যে, তার বলে সে হেলায় বহু বিপদ, আপদ ও দুর্দ্দৈবকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। যাদের অমনতর তপসঞ্জাত শক্তি নেই, তারা অমনতর অবস্থায় প'ড়ে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ২।৩ মিনিটের মধ্যে পর-পর কয়েকজনকে কয়েকটি কথা বললেন—

—বীরেনদা! এখন কুলেখাড়া পাওয়া যায় না ? রোজ যদি যোগাড় করতে পারেন খুব ভাল হয়। আমাদের সবটির লিভার খারাপ। কুলেখাড়া পালি কুলেখাড়ার ঝোল খেয়ে দেখতাম কিছুদিন।

বীরেনদা—চেষ্টা করব। বোধ হয় পাওয়া যাবে।

—বঙ্কিম! আর দুটো ডে-লাইট আনিয়ে দিবি? সামনে কন্‌ফারেন্স আসছে, তখন আরো আলোর দরকার হবে। দুটো-একটা হাতে থাকা ভাল, কোন্ সময় কোন্‌টা নষ্ট হ'য়ে যায়?

বঙ্কিমদা—আচ্ছা। সে তো কলকাতা ছাড়া সুবিধা হবে না।

—আরে, মন করলি কাউকে পাঠায়েই তো দেওয়া যায়। আজ যাবে, কাল নিয়ে চ'লে আসবে।

বঙ্কিমদা—দেখি।

—তাড়াতাড়ি আ'নে দাও মণি!.........আর ফিলানথ্রপীর বিল্ডিংয়ের জন্য ইঁট কত লাগবে হিসাব করিছ নাকি?

বঙ্কিমদা—এখনও হিসাব করিনি।

—কয়লা পাওয়া গেলি নিজেরাই ইঁট কাটা যেত। ইঁট কাটার কি যুগই গেছে। এখন এ তো সামান্য ব্যাপার। আর, প্রকাশকে ব'লে দিও, সিমেণ্টের পারমিট যা'তে পাওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা যেন করে।

ভগীরথদাকে বললেন—চারিদিকে জ্বর-জ্বারি হ'চ্ছে, ভাল কুইনাইন্ কিন্তু যোগাড় রাখিস্।

ভগীরথদা—আজকাল যে ভাল জিনিস পাওয়াই মুশকিল।

—তোর আবার আটকায় নাকি?—স্নেহল কণ্ঠে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

উমাদা এসে দাঁড়াতেই বললেন—তোর মা আজ কেমন?

উমাদা—সর্দ্দি আগের থেকে কম!

—ওষুধ ঠিক মত দিস্।

মায়েদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন। এইবার নিস্তারিণীমা আসলেন। নিস্তারিণীমা এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ টিপে ইশারায় কি যেন বললেন।

নিস্তারিণীমার মুখে একটা রহস্যজনক হাসির রেখা ফুটে উঠলো—ভিতরে-ভিতরে কি যেন কৌতুককর মতলব আঁটছেন। এইবার তা'তে আরো জোর বাঁধলো।

হরিপদদা তামাক সেজে দিয়েছেন। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাশি আসলো। কাশতে-কাশতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। পরে বললেন—তামাকটা বড় কড়া হ'য়ে গেছে। আর-একটু জল দিয়ে ভাল ক'রে ড'লে দিস্। নেশাখোর মানুষ, নেশার মাল ঠিক না থাকলে দুনিয়া অন্ধকার। ('দুনিয়া অন্ধকার' কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে চোখে-মুখে এমন অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো, যেন দুনিয়া সত্যই অন্ধকার হ'য়ে গেছে)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব দেখে সবাই হেসে ফেললেন।

সলীল গতিতে আলোচনার স্রোত ব'য়ে চলেছে।

ঈষদাদা নিজের সম্বন্ধে বললেন—কেউ ভালবেসে সহজভাবে আমাকে কিছু দিলেও তা' নিতে সঙ্কোচ মনে হয় কেন বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) থাকলে inferiority (হীন-ম্মন্যতা) আসে, তার থেকে অমন হয়। ভাল কথা বললেও মনে হয় taunt (বিদ্রূপ)। বিমলদা হয়তো আপনাকে দেখে বলল, 'কি ঈষদাদা! আপনার শরীরটা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে কেন?' তখন হয়তো ভাবলেন—আমার অবস্থা খারাপ, তাই পরিহাস করছে। যদি বলে—'আপনার শরীরটা তো আজকাল ভাল হ'চ্ছে', আপনি ভেবে বসলেন, আমি মানুষের সঙ্গে কথা ঠিক রাখতে পারি না অভাবে, তাই মনে করেছে, আমি মানুষ ঠকিয়ে ঘি-দুধ খেয়ে মোটা হচ্ছি! হয়তো আপনি দু'দিন আগে বিমলদার কাছে দু'টো টাকার জন্য গিয়েছিলেন। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)-এর জন্য ভিতরে থাকে weakness (দুর্ব্বলতা), তাই মনে হয়, সবাই বোধ হয় আমাকে হীন ভাবে। নিজের কাছেই নিজে পালিয়ে-পালিয়ে চলতে হয়, এ এক নরক-যন্ত্রণা বিশেষ। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)-এর চাইতে অনেক জিনিস, এমন কি চুরি-ডাকাতি পর্য্যন্ত ঢের ভাল। তাই ব'লে যে আমি চুরি-ডাকাতি করতে বলছি, তা' কিন্তু নয়। আমার মনে হয়, চুরি-ডাকাতির অভ্যাস থেকে একটা মানুষ যত সহজে রেহাই পেতে পারে, go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)-এর অভ্যাস থেকে রেহাই পাওয়া তার থেকে দুষ্কর। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) ছাড়তে গেলেও আগের go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) চেপে ধরে। তখন খুব শক্ত না হ'লে পারা মুশকিল। 'যাই আসুক, go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) আর করছি না'—এমনতর কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে দাঁড়াতে হয়, আর সে-সঙ্কল্প থেকে এক চুলও নড়তে নেই—মাথার উপর দিয়ে যদি ঝড় ব'য়ে যায় তাও নয়। মানুষের কাছে খ্যাপন করলে ফল ভাল হয়। কেউ যদি তোমার কাছে কিছু রাখতে চায়, তা' রাখতে গেলে আগে থাকতে সব ব'লে নিতে হয়, 'হয়তো আমি খরচ ক'রে ফেলতে পারি, সময় মত না-ও পেতে পারেন, তা' জেনেও যদি দেন, দিতে পারেন।' নির্দ্দিষ্ট কথা দিতে নেই। 'চেষ্টা করব' এই পর্য্যন্ত বলা চলে, কথার ধাঁজগুলি ঠিক ক'রে নিতে হয়। ইংরেজদের এ-সব national characteristics-এ (জাতীয় চরিত্রে) পরিণত হ'য়ে গেছে। Both in word and action (কাজে ও কথায়) cautiously (সাবধানে) go-

between avoid করতে হবে (দ্বন্দ্বীবৃত্তি এড়িয়ে চলতে হবে)। যেটা যে-উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে, সেটা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয় করা উচিত। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) ক'রে যদি দান-ধ্যান বা সৎকাজ করা যায়, তাতেও কিন্তু অপরাধ হয়। Go-between-এর নাম দেওয়া যায় মিথ্যাচার, কারণ, এটা সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে হনন করে। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) অসম্ভব ব্যাপার, এতে treachery (বিশ্বাসঘাতকতা)-র vibgyor (সাতটি রং) আছে। আর যা' হো'ক, বা না হো'ক, go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) ধর্ম্মরাজ্যের জিনিস নয়। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) যার আছে—সত্তাপোষণী উপচয়ী চলনার ব্যাপারে, বিশেষ ক'রে personal profit (ব্যক্তিগত লাভ) হ'তে পারে এমন কোন কাজের বেলায়—সে blundering move (ভুল চাল) নেবেই, হয়তো সেই মুহূর্ত্তে হাগা চেপে যাবে।

বহু মানুষ এসে বলে, ঠাকুর! আমার এখন সময় খারাপ, গ্রহবৈগুণ্য। এক সময় ছিল যখন ছাইমুঠো ধরলে সোনামুঠো হ'য়ে যেত, যে-কাজে হাত দিতাম সহজেই সিদ্ধ হ'তো, কিন্তু এখন আর কিছুই জমিয়ে তুলতে পারি না, সবই ভেস্তে যায়, সোনামুঠো ধরলে ছাই হ'য়ে যায়। এর মধ্যে করা ও চলার অন্যান্য ত্রুটি তো থাকেই, কিন্তু অনেক সময় লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, মানুষটা হয়তো আগে অনেক go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) করেছে, এবং এখনও go-between-এর অভ্যাস আছে। জমায়েৎ go-between-এর ফল যখন মানুষকে চেপে ধরে, তখন পদে-পদে সে ব্যর্থ ও ব্যাহত হ'তে থাকে। সে-চিত্র ভাবতে আমার গা শিউরে উঠছে (শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে একটা আর্ত্ত আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠলো)। খুব সাবধান!

যা' হো'ক, কেউ ভালবেসে কিছু দিলে নেবেন, বিশেষতঃ আপনি না নিলে যদি সে ক্ষুণ্ণ হয়। জিনিসের 'পরে আমাদের লোভ না থাকা ভাল, কিন্তু যে আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রীতি ও বান্ধবতা পুষ্ট হয়, তাকে রহিত করা ভাল নয়।

শ্রীশদা (রায়চৌধুরী) এসে প্রণাম ক'রে বসলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে স্মিতমুখে বললেন—কি শ্রীশদা, কি খবর? Plan (পরিকল্পনা) করিছেন না কি?

শ্রীশদা—হ্যাঁ, করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উৎসাহভরে)—তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলেন, শালা লাগায়ে দেবনে কাণ্ড।

শ্রীশ্রীঠাকুরের হাসিখুশিভাব দেখে সবাই খুব স্ফূর্ত্তিযুক্ত হ'য়ে উঠলেন। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)-সম্বন্ধে যেভাবে আলোচনা হচ্ছিল, তাতে প্রত্যেকে স্ব-স্ব অপরাধের কথা চিন্তা ক'রে খানিকটা যেন অবসন্ন ও নিস্তেজ হ'য়ে পড়েছিলেন, আবহাওয়া অত্যন্ত ভারী লাগছিল, হঠাৎ একটা মিষ্টি হালকা হাওয়ার আমেজ ভেসে আসলো শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার ভঙ্গীকে আশ্রয় ক'রে।

কেষ্টদা পূর্ব্ব কথার সূত্র ধ'রে প্রশ্ন করলেন—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)-এর কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই ? Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) আর না করা ছাড়া তো প্রায়শ্চিত্ত দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখি না তো ! খুঁজে দেখবেন তো পান নাকি। শোনেননি এমন ভূত আছে যা' ওঝা মানে না, এও সেইরকম। Shortcut (সহজ) প্রায়শ্চিত্ত আছে ব'লে মনে হয় না।······(চিন্তিতভাবে) এ যে কি সর্ব্বনেশে জিনিস, ইহকাল-পরকাল ঝর-ঝরে ক'রে দিয়ে যায়, চরিত্রে একরত্তি বল থাকে না। Conviction (প্রত্যয়) ব'লে জিনিস থাকে না, সে যত ভাল কথাই হো'ক, মনে হয় ফাঁপা, ফাঁকা আওয়াজ, কোন বস্তু নেই তা'তে, তাই মানুষের অন্তরে গভীরভাবে, স্থায়ীভাবে দাগ কাটতে পারে না।

আবার, পরিবেশ আমাকে অনেক সময় সূক্ষ্মভাবে go-between করিয়ে ছাড়ে। আমি হয়তো ইচ্ছা করলাম তরুর হাতে জল খাব, ইঙ্গিতও করলাম তেমনি, তরুও দিতে প্রস্তুত, তখন হয়তো মাঝখান থেকে আর একজন এসে জলের ঘটি ধ'রে বসলো। তরুও কিছু বলতে পারে না, পাছে ঝগড়া বাঁধে, এই নিয়ে একটা অনর্থ ঘটে। আর আমার তো কিছু করার উপায়ই নেই। আমি যখন যাকে দিয়ে যেটা চাই, তখন তাকে দিয়ে সেটা না পেলে আমার ভাল লাগে না। রীতিমত অসুবিধা হয়। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না, পাছে কেউ মনে ব্যথা পায়। তবে এতে আমার কষ্ট হয়। অনেকে আবার এমনই প্রবৃত্তি-ঝোঁকা ও আমার পছন্দ-অপছন্দ, সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে এতই খেয়ালহারা যে, তাদের কিছু ব'লে দিলেও তা' তাদের মাথায় থাকে না। ফলকথা, তারা অন্যের সম্বন্ধে অন্ধ, তারা জানে নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ ক'রে সেবা করার দম্ভ নিয়ে চলতে। সে-সেবায় আমারও সুখ-সোয়াস্তি নেই, তাদেরও সার্থকতা নেই। নইলে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে মানুষ সামান্যতম কাজ পর্য্যন্তও যদি নিখুঁতভাবে শ্রদ্ধাসহকারে করে, তবে তার ভিতর-দিয়ে যে বোধ, জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণশক্তি লাভ হয়, তাই-ই তাকে ভূমার মন্দিরে পৌঁছে দিতে পারে, সর্ব্বোপরি লাভ করে সে অনাবিল আত্মপ্রসাদ, একজনকে খুশি ক'রে

খুশি হবার আনন্দ। অহঙ্কারের সেবা যারা করে, তারা সে সার্থকতার সন্ধান পাবে কেমন ক'রে ? তাই ব'লে সার্থকতার লোভে যদি কেউ সেবা করে, তার সেবা কিন্তু সার্থক হয় না—ভালবেসে যে করে, সেই-ই সার্থক হয়।

শীতের মধ্যে একভাবে অনেকক্ষণ ব'সে থাকার দরুন শ্রীশ্রীঠাকুরের ডান পা'টা ধ'রে গেছে,তাই পা বাড়িয়ে দিয়ে প্যারীদাকে বললেন—একটু টেনে দে তো !

প্যারীদা টেনে দিলেন। টেনে দেবার সময় একটু জোর লাগাতে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—শালার পাগল, করে কী রে ? অতো জোরে না।

প্যারীদা—লাগলো নাকি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তেমন কিছু না, আর একটু আস্তে দে।

ঋণ-পরিশোধ সম্বন্ধে কথা উঠতে বললেন—পাওনাদার আস্‌লে যাই থাক্, কিছু দিতে হয়, সে যত সামান্যই হোক, তা' সে নিতে না চাইলেও জোর ক'রে দিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট ওয়াদা করতে নেই, বলতে হয় অমুক দিনের মধ্যে কিছু দিতে চেষ্টা করব। চেষ্টা করব যদি বল, তাহ'লে অবশ্য দেয়—এই ভেবে সময়ের পূর্ব্বে'ই দেবে। আর, পাওনাদারকে তাগাদা করবার সুযোগ না দিয়ে, তুমি নিজে তার বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আসবে। তখন টাকা দেবার কথা নেই, হঠাৎ হয়তো তোমার হাতে কিছু জুটে গেল, নিজেই গিয়ে দিয়ে আসলে, বললে, 'আজ এই তিনটে টাকা হাতে এসে গেছে, তাই ভাবলাম আপনাকে দিয়ে যাই। আমার যে টানের সংসার, সবই তো জানেন, হাতে থাকলেই খরচ হ'য়ে যাবে।' পাওনাদারকে তুমি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছ, এইটে যেন সে কিছুতেই না বুঝতে পারে। ওয়াদামত যে সময় যা' দেবার, সবটা যদি না দিতে পার, তাহ'লেও একটু আগে তার কাছে গিয়ে যা' পার দিয়ে, তোমার অবস্থার কথা তাকে জানিয়ে তার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে আসবে। ঐ অবস্থায় একটু আগে তার কাছে যাবার কথা বলছি এই জন্য যে, শেষ মুহূর্ত্তে তুমি যদি তার কাছে হাজির হ'য়ে তোমার অক্ষমতার কথা জানাও, তখন সে হয়তো বিব্রত হ'য়ে পড়তে পারে, বিশেষতঃ তোমার কথার উপর দাঁড়িয়ে সে যদি আর কাউকে কথা দিয়ে থাকে, কিংবা বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় কাজের পরিকল্পনা ক'রে থাকে। এইভাবে যদি চল, তবে পাওনাদারের সহানুভূতি থাকবে তোমার উপর এবং তুমি মানুষটাকে হারাবে না। একটা মানুষকে হারান মানে কিন্তু একটা দুনিয়াকে হারান। আবার, তোমরা কখনও কাউকে যদি ঋণ দাও, ধ'রেই নেবে সে হয়তো ঐ টাকা পরিশোধ করতে পারবে না। যে-পরিমাণ টাকা ঋণকারী পরিশোধ না করলে তুমি আর্থিক ও মানসিক জীবনে বিধ্বস্ত হবে না, সেই পরিমাণ টাকা বা

জিনিস তুমি ধার দিতে পার। মানসিক জীবনের কথা উল্লেখ করছি এই জন্য, তুমি টাকা বা জিনিসের ক্ষতিটা হয়তো সামলে নিলে, কিন্তু মনের সঙ্গে লোকটাকে হয়তো ক্ষমা করতে পারলে না। তখন লোকটার সঙ্গে ব্যবহারে সেটা ফুটে বেরুবেই! ফলে, সে হয়তো তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বে। তাকে ঋণ দিয়ে একাধারে তুমি টাকা তো খোয়ালেই, মানুষটাও হারালে। গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে এই অপ-ফল কুড়িয়ে লাভ কী? ওর চাইতে ধার না দিয়ে তুমি যা' পার যদি এমনি দাও, সেই সব থেকে ভাল। ধার নেবার বেলায়ও ঐ কথা। ধার না নিয়ে বরং এমনি চেয়ে নাও। আমি সেইজন্য সাধারণতঃ যা' মানুষকে দিই তা'ও নিই না, আবার মানুষের কাছ থেকে যা' নিই তা'ও তাকে দিই না। তার প্রয়োজনমত অনেক বেশী দেবার জন্যই প্রস্তুত থাকি। কিন্তু ঋণের ভিত্তিতে আদান-প্রদানের কথা আমি ভাবি না।

আমাদের দেশে আরও একটা জিনিস আছে—ভাগে কারবার করা। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখি partnership business-এ (ভাগে কারবারে) পরে গোলমালের সৃষ্টি হয়, কিছুদিন যেতে না যেতেই পারস্পরিক বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব চ'টে যায়। তখন পরস্পরের মধ্যে আসে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। তাই আমার মনে হয়, ব্যবসায়ের ব্যাপারে জাতীয় চরিত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় একক ব্যবসা করাই ভাল। বড় জোর একজন আর একজনকে working partner (কর্ম্মী-অংশীদার) রাখতে পারে। ২/৩ জনের মূলধন একত্র মিলিয়ে মিলিত পরিচালনায় ব্যবসা করতে গেলে প্রায় ভেস্তে যায়। উদ্দেশ্য যদি অসাধু না হয়, এবং পরিচালনা যদি ঠিক থাকে, তবে Limited concern (দায়িত্বশীল যৌথ কারবার) বরং এর থেকে নিরাপদ। Limited concern (দায়িত্বশীল যৌথ কারবার) ভাল চলছে, এ অনেক ক্ষেত্রে শোনা যায়, কিন্তু partnership business (ভাগে কারবার) দীর্ঘদিন ধ'রে ভালভাবে চলছে, এ আমাদের বাঙ্গালী-জীবনে বড় বেশী শুনি না। অবশ্য, থাকতে পারে, আমার হয়তো জানা নেই, আমি আর কতটুকুই বা খবর রাখি। তবে আমার সাক্ষাৎ সংস্রবে যত লোক এসেছে, তাদের মধ্যে যা' প্রত্যক্ষ করেছি, সে অভিজ্ঞতা আমাকে partnership business (ভাগে কারবার)-এর ব্যাপারে উৎসাহ দিতে দেয় না। ধার, ভাগে কারবার—এগুলি সব go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)-এর বাহন।

প্রফুল্ল—কারও যদি খুব talents (ক্ষমতা) থাকে, মানুষকে খুব service (সেবা) দেওয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন talent (ক্ষমতা), কোন service (সেবা) দেওয়ায়

কিছু হবে না। অমনিভাবে service (সেবা) দিয়ে যাকে পঙ্গু ক'রে তুলেছ, সেই-ই তোমাকে বলবে 'চোর কাহে কা ! তুই-ই তো আমাকে টাকা দিয়ে সর্ব্বনাশ করেছিস্, নইলে আমি এতদিনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম।'

Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)-ওয়ালারা যে psychology (মনোবিজ্ঞান) ও philosophy (দর্শন) আওড়ায়, তা'ও go-between-এ (দ্বন্দ্বীবৃত্তিতে) ভরা, scheme (পরিকল্পনা)-ও করে সেই ধরণের, 'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে'। কেষ্টদা ! পাঞ্জা দেবার সময় খুব লক্ষ্য রাখবেন, মানুষটার go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) আছে কি না। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) থাকলে সে এ-কাজে successful (কৃতকার্য্য) হ'তে পারবে না, কামের থেকে অকাম বেশী করবে, আর যেখানে-সেখানে ভণ্ডুল বাঁধাবে, আর আপনার হবে জ্বালা।

ঈষদাদা—একজনের কথার উপরে বিশ্বাস ক'রে থাকলে সে যদি go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) করে, তবে সেই সঙ্গে-সঙ্গে আর একজনের go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যাকে বল বিশ্বাস, সেটা বিশ্বাস নয়। বিশ্বাস মানে সম্পূর্ণ প্রশ্নশূন্য হওয়া। বিহিত করণের ভিতর-দিয়ে তা' হয়। এমন ব্যবস্থা করতে হয়, যা'তে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পার সে-বিষয়ে, অন্য আর কোন অবকাশ না থাকে। আলস্যের দরুন তা' আমরা করি না, পরে ঠকি। আলস্য আর বিশ্বাস এক কথা নয়। তাই বলছিলাম, without any condition (নিঃসর্ত্তে) দেওয়া ভাল, তা' ছাড়া পেলাম পেলাম, না-পেলাম না-পেলাম এভাবে দেওয়া চলে। এটা ঠিক জেনো, তোমাকে যদি কেউ deceive (প্রতারণা) করে, সেজন্য প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ দায়ী তুমি নিজে, আর একজনকে সে-সুযোগ তুমি দিলে কেন ? তোমার সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও তুমি যদি দান কর বা ভিক্ষা দাও, তা'তে তোমার ততখানি অপরাধ হয় না, যতখানি অপরাধ হয় নির্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ নিজেকে প্রবঞ্চিত হ'তে দেওয়ায়। আর, অপারগ অবস্থায় আবোল-তাবোল করার চাইতে, মানুষকে ফাঁকি দিয়ে নেওয়ার চাইতে ভিক্ষা করা ঢের ভাল।

কেষ্টদা—আপনি তো বলেন, জাতটা যদি চাকরী না ক'রে ভিক্ষা ক'রে খেত, এর চাইতে ভাল থাকতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তাই মনে হয়। ভিক্ষা করতে চাকরীর চাইতে ক্ষ্যামতা লাগে। মানুষের খুশির দান আহরণ করা সহজ কথা নয়। আর, শুধু কথায়ও তা' হয় না। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে মানুষকে দেখা লাগে। তাদের জন্য

সাধ্যমত করা লাগে। ভিক্ষা কথার পেছনে আছে ভজন অর্থাৎ ভক্তি, অনুরাগ, সেবা, দান, প্রাপ্তি। আপনার ইষ্টে ভক্তি থাকবে, অনুরাগ থাকবে, সেই অনুরাগ-অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁরই স্বার্থপ্রতিষ্ঠা ও প্রীতিকামনায় সশ্রদ্ধভাবে মানুষকে আপনি আপনার সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা-অনুযায়ী সেবা করবেন, তাকে আপনার যা' দেবার তা' দেবেন—তার প্রয়োজন-পূরণে লক্ষ্য রেখে ;—এর ফলে আপনার যে সহজ স্বতঃ-উৎসারিত প্রাপ্তি—তাকে বলে ভিক্ষা। ভিক্ষা চারটিখানি কথা নয়। এতে চাকরীর চাইতে অনেক বেশী মাথা খাটান লাগে, অনেক বেশী চৌকস হ'তে হয়, অনেক বেশী দক্ষ হ'তে হয়, অনেক বেশী দায়িত্ব নিতে হয়। শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণ রাজার চাকরী করবে না, তা'তে বাধ্যবাধকতায় রাজার প্রতি leaning-এর (আনতির) দরুন অন্যায় ব্যাপারেও তার পক্ষ অবলম্বন করতে পারে—দ্রোণাচার্য্যের যা' হয়েছিল, ওতে greater cause (বৃহত্তর উদ্দেশ্য) suffer করে (ক্ষতিগ্রস্ত হয়)।

বেলা হয়েছে, চরে বহু গরু চ'রে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে রোদ ছেয়ে গেছে, আশ্রম-প্রাঙ্গণে লোকজনের আনাগোনাও বেশ বেড়ে গেছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের এখনও পায়খানা যাওয়া হয়নি, তবু সমানে আলাপ চলছে।

কেষ্টদা বললেন—যে-সব ব্রাহ্মণ চাকরী করেছে, তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

বিমলদা তখন একটু বাইরে গিয়েছিলেন,—একটু পরে এসে জোরের সঙ্গে বললেন—ব্রাহ্মণের ছেলে পরের চাকরী ক'রে যে মহাপাতক করছে, তার তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে হেসে বললেন—বিমলদা, কেষ্টদার দপ্তরের মানুষ, কথার মধ্যে যেন ঠিক কেষ্টদার ঝলক।............একটু পরে স্মিতহাস্যে বললেন—অতো কঠোর হ'তে গেলে চলবে কেন? স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিবেচনা ক'রে র'য়ে-স'য়ে চলতে হবে। আপদ্ধর্ম্ম ব'লেও তো একটা জিনিস আছে।

কেষ্টদা ঠাকুরের চাকরীর দরখাস্ত করার কথা উল্লেখ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—সবাই চাকরীর দরখাস্ত করে, আমিও একবার হাউস ক'রে শিলাইদহ ঠাকুর-ষ্টেটে একখানা দরখাস্ত করেছিলাম। আমি ভাবিওনি যে ওর উত্তর আসবে, কিন্তু কিছুদিন পরে appointment-letter (নিয়োগ-পত্র) আসলো, ৫০ টাকা মাইনে, free quarters (বিনা ভাড়ায় বাসা), private practice allowed (সরকারী কাজ ছাড়া নিজের মত ডাক্তারী করা চলবে)। চিঠি পেয়ে বন্ ক'রে আমার মাথাটা ঘুরে গেল,

চোখে সরষের ফুল দেখতি লাগলাম। মনে হ'লো, বাবা ও-চিঠি দেখলি তো রক্ষে নেই, অমনি কচ-কচ ক'রে (হাত দিয়ে দেখালেন) ছিঁড়ে ফেললাম, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে কলতলার পাশে পূজনীয়া ছোটমার খড়ের ঘরের বারান্দায় মোড়ার উপর বসেছেন, তাঁর অমর-বাঞ্ছিত পদযুগলে প্রভাতের রোদ এসে পড়েছে। ভক্তবৃন্দও রোদপিঠ ক'রে তাঁকে ঘিরে বসেছেন।

এমন সময় প্যারীদা এসে কথায়-কথায় বললেন—একটি টাইফয়েডের রোগীকে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে এ্যাজামঞ্জিট দিয়ে খুব উপকার পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। তুমি কম রোগীর চিকিৎসা করনি, আর অভিজ্ঞতাও তোমার কম নয়। তবে মাঝে-মাঝে খেই হারিয়ে ফেল। তার কারণ, কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ পর্য্যায়ে, কোন্ মাত্রায়, কী-কী ওষুধ প্রয়োগ ক'রে তুমি কী ফল পেয়েছ, সে-সম্বন্ধে তোমার একটা analysis (বিশ্লেষণ) নেই। ভাল ডাক্তার হ'তে গেলে case-note (চিকিৎসার বিবরণ) নিজের মত ক'রে লিখে রাখা লাগে। আর, মাঝে-মাঝে সেগুলি পড়তে হয়, সেগুলি নিয়ে ভাবতে হয়। কী করলে আরো ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে, তাও ভেবে দেখতে হয়। বিভিন্ন গ্রুপের অসুখের নোট বিভিন্ন chapter (অধ্যায়)-এ লিখতে হয়, যা'তে প্রয়োজনমত তাড়াতাড়ি খুঁজে পাওয়া যায়। লিখে না রাখলে, সব কথা মনে থাকে না। নূতন যা' পড় তার মধ্যে যা' মনে ধরে, তা'ও লিখে রাখতে হয়। আর, colleagues (সহকর্ম্মী) যারা আছে, তাদের সঙ্গেও পারস্পরিক অভিজ্ঞতা-বিনিময় ভাল। কার কাছ থেকে কখন কী পাওয়া যায়, তার ঠিক কি? আবার, তোমার অভিজ্ঞতা দিয়েও আর পাঁচজন ডাক্তার উপকৃত হ'তে পারে।

প্যারীদা—শেখবার বুদ্ধি তো বড় কারও দেখি না, প্রত্যেকেই এক-এক জন মাতব্বর। বললেও শুনতে চায় না, inferiority-তে (হীনম্মন্যতায়) ভরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেজন্য তুমি নিজেকেই দায়ী করতে পার। তোমার ভিতর যদি ছাত্রত্বের বোধ জাগরূক থাকে, তুমি যদি সশ্রদ্ধভাবে, আগ্রহসহকারে, অন্যের কথা শোন, এবং যার কাছ থেকে যেটা গ্রহণীয় সেটা বিনীতভাবে গ্রহণ কর, আবার তা' প্রয়োগ ক'রে ফল পেলে দশজনের কাছে মুক্তকণ্ঠে যদি তার প্রশংসা কর, এইভাবে যদি বল 'আমার এটা জানা ছিল না, অমুকের কাছে শুনে ভেবে দেখলাম, suggestion (নির্দ্দেশ)-টা তো মন্দ নয়, পরে apply (প্রয়োগ) ক'রে খুব ফল পেয়েছি', তখন দেখবে, যার যত inferiority (হীনম্মন্যতা)-ই থাক,

সে কাবেজ হ'য়ে যাবে। তখন তোমার কাছ থেকে শুনতে বা শিখতে তার আর কোন আড় থাকবে না। নিজে rigid (অনমনীয়) হয়েছ কি আর পারবে না।

প্যারীদা—অনেক সময় মানুষ ভুল suggestion (নির্দ্দেশ) দিয়ে mislead করে (ভুল পথে নেয়), আবার এমনই তাদের অহঙ্কার যে সেইটে কেন শুনলাম না, তার জন্যে চটে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভুল ব'লে যেটা বোঝ, সেটা গ্রহণ করতে যাবে কেন? কিন্তু সেখানে তাকে directly (সরাসরি) oppose (বিরোধ) না ক'রে, তোমার positive experience (বাস্তব অভিজ্ঞতা) যেটা কারণসহ সেইটে মিষ্টি ক'রে বলবে, with all respect to the person (মানুষটির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা দেখিয়ে)। ন্যায়সঙ্গত ভাল কথাও যদি তুমি অকারণ রূঢ় ও রাগতভাবে বল, তাও মানুষ শুনতে চাইবে না। আবার, নিজের মেজাজ ঠিক রেখে, অন্যের মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে খেলিয়ে-খেলিয়ে, রসিয়ে-রসিয়ে তুমি কিন্তু অনেক কথা বসিয়ে দিতে পার তার মাথায়। নিজের উপর নিজের লাগাম যদি ঠিক না থাকে, তাহ'লে আর কাউকে কিন্তু তোমার পথে আনতে পারবে না। তোমার পথে মানে কল্যাণের পথে, সত্যের পথে, সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পথে, অভ্রান্তির পথে, বিজ্ঞানের পথে; আর, সে-পথ সবারই পথ। আমাদের অহং-এর খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে মানুষ যেন আমাদের অনুসৃত সত্যপথ হ'তে বঞ্চিত না হয়। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং'। মানুষের জানা যদি বিহিত বিনয়-সমন্বিত না হয়, তবে সে-জানা দিয়ে সে অন্যকে উদ্বুদ্ধ ও উচ্চেতিত ক'রে তুলতে পারে না। বিনয় মানে বিশেষভাবে নিয়ে যাওয়া। তুমি তোমার পরিবেশকে তোমার জানার রাজ্যে যদি নিয়ে যেতে চাও, তবে প্রতিটি বিশেষকে বিশেষভাবে অনুধাবন ক'রে বিশিষ্ট পথে ঘটিয়ে তুলতে হবে তা'। বিদ্যা আছে, অথচ বিনয় অর্থাৎ বিনয়ন-কৌশল নেই, তার মানে সে-বিদ্যা আয়ত্ত হয়নি তোমার। এই বিনয় মানে কিন্তু একটা নির্জ্জীব নরমভাব নয়। যেখানে, যখন, যে-ক্ষেত্রে, যার সঙ্গে, যেমনতর ব্যবহার করলে তুমি তাকে তোমার আদর্শ ও উদ্দেশ্যানুগ পন্থায় আনতে পারবে, তেমনতর আচরণটাই বিনয়। তাই, বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ নানাক্ষেত্রে নানারকম হ'তে পারে। তবে তার সঙ্গে থাকা চাই দরদ ও শ্রদ্ধা। তা' কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের মনকে স্পর্শ করেই।

প্যারীদা—বিনয়ের expression (অভিব্যক্তি) নানারকম হ'তে পারে, সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমার নিজের কথাই বলি। সে ভারি মজার কাণ্ড হইছিল। তখন আমি ডাক্তারি করি। একবার এক রোগীর বাড়ী থেকে কয়দিন খবরও দেয় না, ওষুধও নিয়ে যায় না। অথচ বলবৎ রোগী। আমি ভেবে-ভেবে সারা। নিজে যে যাব, সে ফুরসুতও নেই। ওরাও আসে না। উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। শেষটা তিনদিন পরে রোগীর বাড়ী থেকে ওষুধ নিতে এলো। লোকটাকে দেখে প্রথমে রোগীর খবর নিলাম, তারপর রেগে আমি এইছান গালাগালি সুরু ক'রে দিলাম, সে আর কথা কবে কী? আমাকে তিনদিন ধ'রে এতখানি দুশ্চিন্তায় ভুগিয়েছে, আমিও মনের ঝাল মিটিয়ে বকলাম। যা' মনে আসলো, বললাম। সে-বলার মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল তাদেরই মঙ্গল। আমার বকা খেয়ে সে বলে, 'বাবু! আপনি আর একটু গালান। আমার ঘাট হইছে বাবু, আর এমন করব না। তবে গালমন্দ যে এত মিঠে লাগে আমার জানা ছিল না, আপনি আর একটু গালান। আপনার মুখে কথাগুলি কত ভাল শোনালো, আর কেউ আমাকে এমন কথা ক'লি তার ঘাড়ডা আমি ছিঁড়ে ফেলতাম না এতক্ষণ! কিন্তু আপনি কেমন সুন্দর ক'রে ক'লেন।' তখন আমার মনে হ'লো পরমপিতা তাহ'লে আমাকে গালাগালি দিতে শিখিয়েছেন বটে! এখানে গালাগালিই কিন্তু তাকে ঈপ্সিত বোধে উপনীত ক'রে দিয়েছে। তাই এটা বিনয়বহির্ভূত নয়। তবে এ বড় কঠিন ব্যাপার। পট ক'রে যদি নকল করতে যাও, কেউ ঘাড়টাই ছিঁড়ে ফেলতে পারে। তবে এইটুকু লক্ষ্য রাখবে, যদি কোথাও তিক্ত কথাও বলা প্রয়োজন হয়, তা' বলবে যথাসম্ভব হৃদ্য ক'রে। চ'টে আত্মহারা হয়েছ কি আর মাত্রা ঠিক রাখতে পারবে না, তখন আর মানুষকে পথে আনতে পারবে না। তোমার ক্রোধের সংস্পর্শে তারও ক্রোধের উদ্দীপন হবে। মনের যে-দরজা খোলা থাকলে মানুষ ভাল কথা মাথায় নিতে পারে, সে-দরজায় তখন কপাট প'ড়ে যাবে। তখন তুমি লাখ ভাল কথা কও, তা' তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। সে ভাববে, তুমি তাকে খাটো করবার জন্য সব কথা বলছ। তাই, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে খুব হুঁশিয়ার।

প্যারীদা—অতো হিসাব করতে গেলে তো কাজ করাই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ওখানেই তো বাহাদুরি প্যারীচরণ! ওখানেই তো বাহাদুরি! কার্য্যক্ষেত্রে সংঘাতের মধ্যে প'ড়ে কার কতখানি মাথা ঠিক থাকে, সেইটেই তো চরিত্রের পরখ। আর, কাজের কোন মানে হয় না, সে-কাজের সঙ্গে যদি আত্মনিয়ন্ত্রণবুদ্ধি না থাকে। সে-কাজ তখন ভিতরে-বাইরে জঞ্জাল সৃষ্টি করে। নিরখ-পরখ ঠিক রেখে কাজ ক'রো, তাহ'লে দেখবে, সে-কাজে নিজেও

শান্তি পাবে, অন্যকেও শান্তি দিতে পারবে। একদিনেই মানুষ নির্ভুল হ'য়ে যায় না, তবে ভুল সংশোধনের দিকে লক্ষ্য থাকলে আস্তে-আস্তে ঠিক হ'য়ে আসে। ইষ্টপ্রীতিকে লক্ষ্য ক'রে কাজ করলে তখন প্রত্যেকটা কাজ হয় তাঁর আরতি-বিশেষ। সেখানে অহমিকা বা প্রবৃত্তি বেশী মাথাতোলা দিতে পারে না। তাই দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিরক্তি, দম্ভ, বিদ্বেষ স্বতঃই প্রশমিত হয়। মানুষ কঠোর, ক্ষিপ্র, অনন্তকর্ম্মা হ'য়েও হয় নিরভিমান ও নির্ব্বিরোধ; তাই ব'লে সে অন্যায়ের সঙ্গে কিন্তু আপোষ করে না, দৃপ্ত বিনয়ে প্রতিরোধ করে সেখানে। তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে থাকে এমন একটা ঔজ্জ্বল্য যা' মানুষের অন্তরের জটিল অন্ধকারকে আলোকিত ক'রে তোলে। তেমনি হ'লে তুমি যা' খুশি তাই করতে পার। তখন তোমাকে দেখে লোকে বলবে (শ্রীশ্রীঠাকুর মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে সুর ক'রে গাইলেন)—যাদুকরের ছেলের মত প্যারী কত রঙ্গ জানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার রহস্য ক'রে বললেন—অনেক বকাইছ, এইবার ভাল ক'রে এক কলকে তামাক খাওয়াও।

প্যারীদা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ভিড় জমে উঠেছে। তাঁর মধুর আলাপন শুনে সবাই আনন্দে মসগুল। এইবার তিনি নলটি মুখে দিয়ে ধীরে-ধীরে টানছেন আর স্নেহল দৃষ্টিতে সবার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। উপস্থিত সকলের দৃষ্টিও তাঁ'তে নিবদ্ধ। কেমন যেন একটা চৌম্বক-আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে আছেন সবাই।

এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর দেখতে পেলেন, একদল বাবুই পাখী মুখে ক'রে খড় নিয়ে যা'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে প্রীতিভরে বললেন—দ্যাখ, বুদ্ধি কারও কম নয়। মুখে ক'রে খড় নিয়ে যা'চ্ছে। সেই খড় দিয়ে গাছের ডালে বাসা বাঁধবে। সেখানে কাচ্চাবাচ্চা, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে নিরাপদে থাকবে। পরমপিতার রাজ্যে যে-দিকে চাওয়া যায় সেই দিকেই বিস্ময়ে ভরা।………………… (আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে)—ঐ যে কচি দূর্ব্বাঘাসটি অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠছে, জীবনের এই যে নবীন উদ্ভেদ, এর মধ্যেও লুকিয়ে আছে প্রকৃতির অনন্ত রহস্য, বিজ্ঞানের অগণিত তত্ত্ব।…………এর সামান্য একটা ব্যাপারকেও যদি সামগ্রিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চাও—যাবতীয় যা'-কিছুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত ক'রে,—তবে সেই আদিকারণকে জানতে হবে, অনাদিরাদি-গোবিন্দে যেয়ে পৌঁছুতে হবে। তাঁকে না পেলে তাই কিছুই পাওয়া হ'লো না, তাঁকে না জানলে কিছুই জানা হ'লো না।

বলতে-বলতে শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ম মর্ম্মভেদী হ'য়ে উঠলো, চোখে-মুখে ফুটে উঠলো একটা দীপ্ত আরক্তিম আভা, কপালখানা চকচক করতে লাগলো। লোচনলোভন সেই অনুপম মূর্ত্তির দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে রইলেন সবাই।

একটু পরে বাবরালী ঘরামী যাচ্ছিল শ্রীশ্রীমায়ের কুটিরের পাশ দিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে বাবরালী! ঘরের কতদূর?

বাবরালী—হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দরজা, জানালা পাইছিস্ তো?

বাবরালী—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি কথা! আমি যে সেদিন হরেনকে ক'য়ে দিলাম পাবনা থেকে আনবার কথা। ডাক্ তো হরেনকে (ভদ্র)।

হরেনদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাবরালী কয়, ঘরের দরজা-জানালা ব'লে এখনও আ'নে দিস্‌নি। আমি সেদিন অতো ক'রে ক'লাম। আমি ভাবছি, হরেনকে যখন কইছি তখন সব ঠিক আছে। তোকে কাজের ভার দিয়েও আমি যদি নিশ্চিন্ত না হ'তে পারি, তাহ'লে বল্ তো আমি দাঁড়াই কোথায়? তুই তো আগে এমন ছিলি না, বলতে যতটুকু দেরী, বলার সঙ্গে-সঙ্গে ক'রে ফেলতিস্।

হরেনদা—আমি ভবানীদার কাছে টাকা চাইলাম, সে টাকা দিল না, আমি তাই রাগ ক'রে আনিনি। সে বলে, তুমি টাকা যোগাড় ক'রে আন গিয়ে, আমি অতো টাকা যোগাড় করব কোথার থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভবানী যদি না দিতে পেরে থাকে, আর তুইও যদি যোগাড় করতে না পেরে থাকিস্ তাহ'লে আমাকে তো বলা লাগতো। তখন যা' হয় একটা ব্যবস্থা করতাম।

হরেনদা—ভবানীদা 'না' করায় আমার রাগ হইয়া গেল, ভাবলাম—'থাকগা', ঠাকুরের কাছে যদি যাইতে হয়, তবে আসামী হইয়াই যাইব।

হরেনদার কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর-সহ সবাই হেসে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—আসামী তো তুই হো'স্‌নি। আসামী যে আমাকে বানাইছিস্। ওদের যদি সময় মত জোগান দিতে না পারি, তাহ'লে যে কাজে দেরী প'ড়ে যাবে, পয়সা বেশী লাগবে।

হরেনদা লজ্জিত হ'য়ে বললেন—সে কথা ভাবিনি। যাহো'ক, টাকা হ'লে তো আজই এনে দেওয়া যায়। গোলায় তো নানান মাপের দরজা-জানালা তৈরীই থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত টাকা ?

হরেনদা—৫০ টাকা আন্দাজ লাগবে। কিছু কম-বেশী হইতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত ৫ জনকে বললেন ১০ টাকা ক'রে সংগ্রহ ক'রে দিতে। হরেনদাকে বললেন একটু পরে ভবানীদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেতে।

এক-এক জন টাকা যোগাড় ক'রে আনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন 'প্রফুল্লর হাতে দে।' সব টাকা যোগাড় হবার পর বললেন—ভবানীর কাছে দিয়ে বলিস্, দরজা, জানালার জন্য হরেনকে দেয় যেন।

পরে জানা গেল, গ্রামস্থ এক জনের ঘর তৈরী ক'রে দিচ্ছেন শ্রীশ্রীঠাকুর এবং সেই ঘরের জন্যই ঐ দরজা-জানালা।

টাকা যোগাড় হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে ফিলান্‌থ্রপি অফিসের দিকে গেলেন, ওখানে যাবার পর শশধরদা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বসবার আসন ও তাকিয়ে দিতে গেলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—না, এখন বসব না। এরপর কিশোরীদার ঘরের পাশে গিয়ে স্নেহ-মধুর কণ্ঠে ডাক দিলেন—ডাক্তার!

কিশোরীদা 'আজ্ঞে' ব'লে ডাক শুনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে ছুটে বাইরে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজকাম করতিছিলে নাকি ?

কিশোরীদা—না! এমন কিছু না। একটু ওষুধ-টষুধ দিচ্ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে যাও, কাজ সেরে আস গিয়ে।

কিশোরীদা—ওদের ওষুধ পরে দিলেও ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, যাও। তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে এস। আমি এখানে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাবলা গাছটির ওদিকে রোদ-পিঠ ক'রে একটা হাতলওয়ালা বেঞ্চে বসলেন। বসার পরক্ষণেই হাতে-হাতে গাড়ু, গামছা, তামাক, টিকে, গড়গড়া, পিকদানি, সুপারির কৌটা, দাঁতখোটা ও জলের ঘটিও এসে উপস্থিত হ'লো।

একটু বাদে কিশোরীদা ওষুধ দেবার কাজ মিটিয়ে ওখানে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোরা একটু সর্ তো, আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা কই।

সবাই স'রে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ-মুখ ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে কিশোরীদাকে কী যেন বলছেন। উভয়ের মুখেই খুব হাসি। শেষটা দূর থেকে শোনা গেল শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—পারবা তো ?

কিশোরীদা সহজভাবে বললেন—আপনার দয়ায় এ এমন একটা কঠিন কাজ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হ'য়ে—তোমার শালার বরাবর ঝুন ঠিক আছে। কত ঝড়-ঝাপটা গেল, তুমি বড় একটা হেলদোলনি। সমানে চালায়ে যাচ্ছ বরাবর। তোমার পুণ্যি আছে খুব।

কিশোরীদা—পুণ্যি যা' আমার আছে, সে আপনিও জানেন, আমিও জানি। নেহাৎ দয়া ক'রে চরণে ঠাঁই দিছিলেন, তা' না হলি কোথায় ভাটায়ে যাতাম, তার কি ঠিক আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (ও-কথা যেন শোনেননি এমনতর রকমে)—তুমি এইবার বারায়ে পড়, কাজ হাসিল ক'রে আসা চাই।

কিশোরীদা প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

ফরিদপুর থেকে একটি দাদা এসেছেন তাঁর স্ত্রী ও ছোট ছেলে সহ। আজ তার মুখে ভাত।

দাদাটি খোকার একটা নাম রেখে দেবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে অনুরোধ জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর নাম ও তাঁর বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

দাদাটি বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণতঃ পিতা ও পিতামহের নামের সঙ্গে সঙ্গতি ও সম্পর্ক রেখে নামকরণ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন কিছু মনে পড়ছে না, পরে আবার স্মরণ করিয়ে দিস্।

মা'টি বললেন—আমার বড় ছেলেটা বড় দুষ্টু, মোটে পড়তে চায় না, একদম কথা শোনে না। আট বছর বয়স হ'লো, এখনও প্রথম ভাগ শেষ করতে পারলো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়ার জন্য তাড়না করিস্ না। আর, পদে-পদে নিষেধ ক'রে কথা না-শোনাটা কায়েম ক'রে তুলিস্ না। যে-ভাবে চলুক চলতে দে, শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখবি, কোন বদ অভ্যাস যেন আয়ত্ত না করে বা নিজেকে বিপন্ন ক'রে না তোলে। ছেলে-পেলে একটু ডানপিটে হয়, সে ভাল। তবে ঐ ডানপিটেমিকে যত তুমি তোমার শিক্ষাদানের হাতিয়ার ক'রে নিতে পারবে, ততই সে আমোদ পাবে, এবং শিক্ষাটাও তার কাছে আনন্দদায়ক হবে। ধর, সে সবসময় মার্ব্বেল খেলতে ভালবাসে, অনেকগুলি মার্ব্বেল তাকে কিনে দিলে, মার্ব্বেলগুলি দিয়ে তাকে গোণা শেখালে, হাতে-কলমে যোগ-বিয়োগ শিখিয়ে দিলে। প্রথমে হয়তো মুখে-মুখে বলল, সেটা তাকে দিয়ে লেখায় আনালে।

এইভাবে ঝোঁকগুলিকে হাতিয়ার ক'রে নিতে হয়। ওগুলি যদি ভাঙ্গ তবে পরে দেখবে ছেলে লেখাপড়া শিখেও অথর্ব্ব হ'য়ে থাকবে। আমাদের মায়েরা, অভিভাবকরা জানে না কেমন ক'রে ছেলে-পেলে মানুষ করতে হয়। তাই, শিব গড়তে গিয়ে তারা বানরই গড়ে বেশীর ভাগ। বহুর ভাগ বাবা-মা ছেলে-পেলেকে যেমনভাবে শিক্ষা দেয়, যেমনভাবে শাসন করে, তারা তা' আদৌ যদি না করতো, তাহ'লে ছেলে-পেলেদের পক্ষে ঢের ভাল হ'তো। নিষেধ করতে হ'লে জানা চাই, কখন, কোন্ অবস্থায়, কেমন ক'রে নিষেধ করতে হবে। আবার, যদি আদেশ বা অনুরোধ করতে হয়, তারও রীতি আছে। সেগুলির দিকে লক্ষ্য না রেখে হরদম ব'লেই যাচ্ছি, তার মানে ছেলেকে অবাধ্য হ'তে বাধ্য করছি। অর্থাৎ, আমিই তাকে অবাধ্য ক'রে তুলছি। শুধু তাই নয়, মা-ই আবার হয়তো যেখানে-সেখানে যার-তার কাছে ব'লে বেড়ায়—খোকা আমার কথা শোনে না। সে-কথা আবার তার কানে যায়। প্রত্যেকেরই একটা অহং আছে তো? ছোট ছেলে হ'লে কি হয়? তারও একটা আত্মমর্য্যাদা বোধ আছে। ঐভাবে যদি তাকে উৎক্ষিপ্ত কর, অবমাননা কর, তখন দেখতে পাবে, ক্রমে-ক্রমে সে বেপরোয়া হ'য়ে উঠছে, তোমার বাগের বাইরে চ'লে যাচ্ছে, তখন আর তাকে সামাল দিতে পারবে না। মা-বাপের উপর ভালবাসা যদি থাকে, তাহ'লে লেখা-পড়া তো এক তুড়ির (হাতে তুড়ি দিয়ে দেখালেন) কাজ। তাই সব সময় লক্ষ্য রেখো, তোমাদের চক্ষুষ্মান সুসঙ্গত চলন ও আচরণ যেন তার শ্রদ্ধা-ভালবাসাকে স্ফীত ক'রে তোলে। তখন ছেলেকে অতো তাড়া দেওয়া লাগবে না। ছেলে তোমাদের খুশি করবার গরজে নিজে থেকেই পড়বে।

এর মধ্যে রমজানকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোনে গেছিলু রে ও রমজান?

রমজান—মাঠে।

একটু পরে নগেনদা (বসু) এসে জিজ্ঞাসা করলেন—ঠাকুর! বিরূপাক্ষ কথাটার মানে ভাল ক'রে বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরূপ মানে বিরুদ্ধ, প্রতিকূল। একটা কথা আছে 'পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বং হি ভগবত্বম্'। তেমনি যাবতীয় বিরুদ্ধ গুণ যাঁর মধ্যে **fulfillingly adjusted** (পরিপূরণীভাবে বিন্যস্ত), বাঁচা-মরা, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ সব-কিছু যিনি মঙ্গলে নিয়ন্ত্রিত করেন তিনিই বিরূপাক্ষ।

নগেনদা—যিনি মঙ্গলময় শিব, তিনি আবার বিরূপ অক্ষিযুক্ত হ'তে যাবেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরূপ, রুদ্রভাব দেখিয়েও তিনি মঙ্গল করেন, তাই তিনি শিব। ছাওয়াল যখন অন্যায় করে তখন মাঝে-মাঝে আপনিও বিরূপাক্ষ হন না ?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর চিঠিপত্র দেখে তেল মেখে স্নান করতে গেলেন। স্নান ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীর মধ্যে শ্রীশ্রীবড়মার ঘরে খেতে গেলেন। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিতে আসলেন মাতৃমন্দিরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আহারাদি সমাপনান্তে মাতৃমন্দিরের উত্তরদিকের দরদালানে তক্তপোষের উপর পাতা বিছানায় ব'সে প্রসন্নবয়ানে সুপুরি চিবোচ্ছেন। দর-দালানের উত্তরদিকে পাশাপাশি কয়েকখানি দরজা। দরজাগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। বাইরে বকুলতলায় অনেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখছেন। অনেকে দরদালানের ভিতরে এসে বসেছেন। ঘরের ভিতর জায়গা অপেক্ষাকৃত কম, পূর্বদিক দিয়ে মাতৃমন্দিরের দোতলায় সিঁড়ি উঠে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের তক্তপোষ ফেলে জায়গাটা জুড়ে গেছে অনেকখানি। তারই পাশে মায়েদের মধ্যে অনেকে ঠাসাঠাসি ক'রে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ডান হাতের দুটি আঙ্গুলের মধ্যে আলগোছে গড়গড়ার নলটি মুখে ধ'রে তামাক টানছেন। চোখে-মুখে খুব একটা আমেজের বোধ। স্নেহল দৃষ্টিতে মায়েদের দিকে চাইতে-চাইতে বলছেন—যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় তিনজন। তোরা এতজন এইটুকু জায়গার মধ্যে বসেছিস্, কিন্তু কা'রও কোন অসুবিধা-বোধ নেই। তোদের বসার ধরণ দেখে মনে হ'চ্ছে, তোরা ব্যক্তিগতভাবে কেউ তো কোন অসুবিধা বোধ করছিস্ই না, প্রত্যেকেই ভাবছিস্—অন্যের অসুবিধা না হয়, এই ভেবে নিজে যথাসম্ভব কম জায়গার মধ্যে ব'সে অন্যের সুবিধে ক'রে দিতে চেষ্টা করছিস্। এই জিনিসটা কত মিষ্টি। ঘর-সংসারে, সমাজে এই ভাবটা ফুটে উঠলে মানুষের জীবন ঢের বেশী আনন্দের হ'য়ে ওঠে। খেয়োখেয়ি ক'রে সুখ নেই। সুখ আছে অন্যকে যথাসম্ভব সুখ-সুবিধা দেওয়ায়। এতে আত্ম-সংযম আসে, নিজের প্রয়োজন-বাহুল্য ক'মে যায়। তোমরা যদি এইভাবে চল, তোমাদের ছেলেপেলেরাও এইভাবে গজিয়ে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে মায়েরা খুব খুশি হ'য়ে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটুক্ষণ চুপ ক'রে বাইরে বাবলা গাছটার দিকে উদাসভাবে চেয়ে রইলেন।

পরে রহস্য ক'রে একটি মা'কে বললেন—তোর কাপড়ের রংটা তো করিছিস্ বেশ।

মা-টি লজ্জিত হ'য়ে বললেন—কাপড়টা ময়লা হ'য়ে গেছে, কাচা হয়নি অনেকদিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার গম্ভীরভাবে বললেন—আমার এইরকম নোংরা লক্ষ্মীশ্রী-হীন ভাব ভাল লাগে না। তোরা সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবি, সদাচারে চলবি, তবেই না সংসারে লক্ষ্মীশ্রী আসবে। তোদের অনেককে দেখি চুলটা ভাল ক'রে আঁচড়াস্ না, সিঁথিতে সিন্দূরটা রীতিমত দিস্ না, কপালে সিঁন্দূরের টিপটা ভাল ক'রে পরিস্ না, অগোছাল চলনায় চলিস্। তোদের দেখে ছেলেমেয়েদের অভ্যাস অমনি হয়। এটা ভাল না। সব কাজের মধ্যে চাই সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলাবোধ। প্রাণের অনুরাগ ঢেলে দিয়ে সব কাজ করবি, চলবি, বলবি—নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে। তা'তে দেখবি নেই-নেই, হাহা-টাটা-ভাব, রোগবালাই ক'মে যাবে, গায় বল পাবি, কাজে আনন্দ পাবি। সংসারে যাই করিস্, তা' আরো ভাল ক'রে, আরো নিপুণ ও ক্ষিপ্রভাবে কেমন ক'রে করতে পারিস্, সেই নিয়ে মাথা খাটাবি, আর কাজেও করবি তেমনি। সুসঙ্গতভাবে মাথা খাটানটা, চিন্তা করাটাই ধ্যান। একজনের চলা-বলা কাজ-কর্ম্মের রকম দেখেই বোঝা যায়, সে নামধ্যান করে কিনা। নিয়মিত নামধ্যান যে করে, তার সব-কিছুই দিনের পর দিন সুষ্ঠু ও সুন্দর হবেই-কি-হবে। তুমি হয়তো রান্না কর, তোমার ভাবা লাগে, তোমার সঙ্গতির মধ্যে রান্নাটা কিভাবে আরো ভাল ক'রে করতে পার। এই ভাল ক'রে রান্না করার মধ্যে অনেকগুলি দিক ভাববার আছে। প্রথম কথা হ'চ্ছে—যাদের জন্য রান্না কর, তাদের বিভিন্ন জনের রুচিটা কী, তারপর শরীরের জন্য কার প্রয়োজনটা কী, কোন্ ঋতুতে কোন্ জিনিস বিশেষভাবে গ্রহণীয়, একই জিনিস দিয়ে রকমারি কতরকম করতে পার, ইত্যাদি। এর জন্য তোমাকে অনেক বিষয় জানতে হবে, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন্ জিনিসটার কী গুণাগুণ, শরীরের কোন্ অবস্থায় কোন্ জিনিসটা বিশেষভাবে উপযোগী, কোন্ আবহাওয়ায় শরীরের উপর কী প্রতিক্রিয়া হয় এবং তার প্রতিবিধানই বা হয় কি ক'রে, সংসারে কার রুচি ও পছন্দ কেমন—এই সব সম্বন্ধে তোমাকে অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ওয়াকিবহাল হ'তে হবে।

সুরমামা—বাড়ীর কর্ত্তার একরকম পছন্দ তো ছেলেমেয়েদের এক-এক জনের এক-এক রকম পছন্দ, আবার সবার শরীরের জন্য প্রয়োজনও একরকম নয়, এত-সব ভাবতে গেলে তো খেই পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মধ্যে কিছু-কিছু পাবে, যা'তে সবারই মিল আছে। তাছাড়া, বিশিষ্ট রুচি ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে, টুকটাক এটা-ওটা একটু ক'রে দিলে। কঠিন কিছু না, মাথা খাটিয়ে করলেই হয়। হয়তো স্বাস্থ্যপ্রদ রুচিকর নানারকম আচার, মোরব্বা ইত্যাদি ক'রে রাখলে ঘরে, আমসত্ত্ব, কাঁঠালসত্ত্ব

ইত্যাদি ক'রে রাখলে, কফি যখন সস্তা তখন কফি শুকিয়ে রাখলে, রকমারি হজমি মশল্লা দিয়ে বড়ি ক'রে রেখে দিলে, কত রকম করা যায়, আমার চেয়ে তোমরাই তো ভাল জান। এতে খরচ এমন-কিছু নয়। আর, তোমাদের চাই সংরক্ষণ-বুদ্ধি, প্রস্তুতি-বুদ্ধি। সংসারে যা'-যা' লাগে, আগে থাকতে যোগাড় ক'রে রাখতে হয়। হয়তো সারা বছর তেঁতুল প্রয়োজন, তেঁতুলের সময় তেঁতুলটা কিনে রাখলে না। যখনই দরকার হয়, তখনই তেঁতুলের জন্য দোকানে দৌড়াও। এতে খরচও বেশী পড়ে আবার পরিষ্কার ভাল জিনিসটাও পাও না। মনে কর, ডাল-কলাইটা যদি সময়মত নিজেরা কিনে রেখে, ঝেড়ে শুকিয়ে নিজেরা যাঁতায় ভেঙে নেও, তাহ'লে কতখানি সাশ্রয় হয়। ঢেঁকি থাকলে ধান কিনে নিজেদের ধান নিজেরা ভেনে নেওয়া যায়। তুষ আর গোবর দিয়ে ঘুটে দিতে পার। ক্ষুদ-কুঁড়ো গরু থাকলে তাকে খাওয়াতে পার। আর, গরু-পোষা খুব ভাল। গো-পালন আমাদের আর্য্যঘরের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। বাড়ীতে শাক-সব্‌জি, তরি-তরকারির বাগান নিজেরা করা ভাল। ওতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, একটা শিক্ষাও হয়। সঙ্গে-সঙ্গে দু'চারটে ফুলগাছ হয়তো লাগালে। টোটকা চিকিৎসার জন্য যে-সব গাছ-গাছড়া লাগে, তা'ও হয়তো লাগিয়ে রাখলে। দু'চারটে ফলের গাছ পুঁতলে। নিম, তুলসী, ইউক্যালিপ্‌টাস্ ইত্যাদি যে-সব গাছের হাওয়া ভাল, সে-সব গাছ বাড়ীর মধ্যে পুঁতে দিলে। এক-কথায় নিজেদের এবং আশেপাশের প্রয়োজন নিজেরা কতখানি মেটাতে পার, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে সাধ্য ও সঙ্গতিমতন যা'-যা' করা সম্ভব, যদি করতে সুরু ক'রে দাও, তাহ'লে দেখতে পাবে, নিজেদের অজান্তে ঘরে-ঘরে কৃষি, শিল্প গজিয়ে উঠছে, প্রাচুর্য্যে ঘর ভ'রে উঠছে। তখন আরো কতজনকে খাওয়াতে পারবে তোমরা। তোমরা প্রত্যেকে বহুপালক হও, বহুপোষক হও, তাই আমি দেখতে চাই। নইলে সংসারী হওয়াই মিছে। তাই আমার ইচ্ছা করে, তোরা সব ধানের জমি কর্। মানুষের ঘরে খোরাকী ধান ও ডাল-কলাইটা থাকলে, তার মাজায় অনেকখানি জোর থাকে।............দেখছিস্ তো যুদ্ধবিগ্রহের অবস্থা, কোন্ সময় কী হয় বলা যায় না। এমন দিন আসতে পারে, যে-দিন একমুঠো দানার জন্য বহুলোক হয়তো পথে-পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়াবে। না খেতে পেয়ে কত লোক হয়তো ম'রে যাবে।

কালীষষ্ঠীমা—আমার সন্তুষ ব্যবসা-বাণিজ্য পছন্দ করে, কিন্তু ধানের জমি করা তেমন পছন্দ করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসা-বাণিজ্য করা তো খুব ভাল, সেই সঙ্গে ধানের জমি

করাও ভাল। পয়সা তো চাবায়ে খাওয়া যায় না। দুটো পেটে দিতি গেলি চাল ফুটিয়েই দিতি হয়। দুটো-চারটে পয়সা হাতে থাকলেই যে সব সময়, সব অবস্থায় সহজে ধান-চাল পাওয়া যায় তা' কিন্তু নয়।

এরমধ্যে হরিপদদা একবার তামাক সেজে দিলেন ও চিরুনি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের চুলটা আঁচড়ে দিলেন।

মানদামা (প্রফুল্লর মা)—আমি নিজেদের দেশ-বাড়ীতে দেখিছি, কোন একটা লোক যদি ভিক্ষা করতি আসে, তাহলি একমুঠ দেব মনে করলি দুই মুঠ চাল হাতে উঠে আসে, কিন্তু এখানে কেনা চাল, তাই দুই মুঠ দেব মনে করলিও, এক মুঠর বেশী হাতে উঠতি চায় না। নিজেদের ক্ষেতের ধান-চাল ও কেনা চালে এতখানি তফাৎ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—ঠিক কইছিস্।

সুরমা-মা'র পাশে তাঁর মেয়ে মুনকু বসেছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুরমা-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মুনকু রান্না করতি পারে না ?

সুরমা-মা—হ্যাঁ, পারে। ওর হাতের রান্না খুব ভাল। ওর খুব ইচ্ছে আপনাকে একদিন তরকারি রান্না ক'রে খাওয়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' খাওয়ালিই পারিস্।............মেয়েকে খুব ভাল ক'রে মানুষ কর। লেখা-পড়া, নাচ-গান যতটা শিখুক-না-শিখুক, কাজকর্ম্ম, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে দুরস্ত ক'রে তোল। তুমি গিন্নীবান্নী মানুষ আছ, তোমারটা যদি অনুসরণ করে, ঢের শিখে যাবে। শিক্ষায় প্রধান জিনিস হ'লো ভক্তি, তাই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে মা-বাপের প্রথম কাজ হ'লো—নিজেরা বাস্তবভাবে শ্রেয়নিষ্ঠ হ'য়ে, গুরু ও গুরুজনে ভক্তিমান হ'য়ে, ভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরা তাদের সামনে। এর ভিতর-দিয়ে মাতা-পিতার প্রতিও ভক্তি সঞ্চারিত হয় ছেলেপেলেদের মধ্যে, আর গুরুভক্তি তো গজিয়ে ওঠেই। এই হ'লো শিক্ষার মূল জিনিস। কারও জীবনে এইটুকু যদি গেঁথে তুলতে পার, আর সে যদি কাগজের উপর কালির আঁচড় দিতেও না জানে, তাহ'লেও দেখবে সে কেইস্যান পেথম তুলে দাঁড়ায়। লোকে অবাক ব'নে যাবে তাকে দেখে। অবশ্য, লেখাপড়া তার পক্ষে একটা ফাও জিনিস, তা' সে অনায়াসেই পারে। আমি কথার-কথা হিসাবে বলছিলাম। ফলকথা, লেখাপড়াটা শিক্ষার একটা গৌণ জিনিস। মুখ্য জিনিস হ'লো অভ্যাস, ব্যবহার, ঝোঁক, নিষ্ঠা, নেশা, প্রত্যয়, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যানুপাতিক কর্ম্মদক্ষতার স্ফুরণ ও সুনিয়ন্ত্রণ।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় হামলা করতে-করতে শৈলমা ও নিস্তারিণীমা এসে

হাজির হলেন। শৈলমা ক্ষিপ্ত হ'য়ে হাতমুখ নেড়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বললেন—ও কিনা বলে, ও আমার স্বামী। আস্পর্দ্ধা দেখেন, ছোট জাতের মেয়ে, আবার স্বামী ফলাতে আসে। আমি দেব একেবারে ঢিট্ ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নির্লিপ্তভাবে বললেন—নিস্তারিণী কয়, ও রাজী নয়, তুই-ই ব'লে ওকে গিয়ে সাধাসাধি করিস্।

শৈলমা (রেগে আগুন হ'য়ে নিস্তারিণীমার দিকে ধাবিত হ'য়ে)—আমি তোকে কবে সাধাসাধি করতে গিছি রে? শয়তান! পাপিষ্ঠ! জানিস্ আমি কায়েতের মেয়ে, আমি যাব স্বামী ব'লে তোর পা-পূজো করতে?

নিস্তারিণীমা—তুই তো গোপনে যাস্ রোজ আমাকে তোয়াজ করতে। মানুষের সামনে তেজ দেখাস্, না? আমার সাক্ষীও আছে, তাদের ডাকি, তারা বলুক সত্যি কি মিথ্যে।

শৈলমা—ডাক্ দেখি তোর কে সাক্ষী।

নিস্তারিণীমা উপস্থিত মায়েদের মধ্যে দুইজনের নাম ক'রে বললেন—দিদি! তোমরা তো জান। সেই দিন ও যখন ঘরে গিয়ে সাধাসাধি করছিল, তখন তোমরা তো গিয়ে হাজির হ'লে, তোমরা তো স্বচক্ষে দেখেছ সব।

তাঁরা দু-জন একবাক্যে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন—হ্যাঁ! আমরা তো স্বচক্ষে দেখেছি ওর পিছু-পিছু ঘুরতে।

শৈলমা ক্রোধে, ক্ষোভে, বিস্ময়ে হাত-দুটো উঁচু ক'রে একটা লাফ দিয়ে আর্ত্ত চীৎকারে সপ্তমে গলা চড়িয়ে ব'লে উঠলেন—ঠাকুর! এরাও ঐ পাজির দলে, এদের কথা বিশ্বাস করবেন না ঠাকুর! এদের কথা বিশ্বাস করবেন না। এরা সব ঢাকাই সাক্ষী। (কেঁদে ফেলে)—আপনি অন্তর্য্যামী! আপনি তো সবই জানেন। আমি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-ঘরের মেয়ে। পড়েছিলামও বড় ঘরে। আজ না হয় আমি কপালদোষে অনাথা। তাহ'লেও নীচু বর্ণের মেয়েকে কেন যাব আমি স্বামী ব'লে স্বীকার করতে? অথচ নিস্তারিণী সবার কাছে ব'লে বেড়ায়, আমি নাকি ওকে স্বামী ব'লে স্বীকার করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর মুচকি-মুচকি হাসতে-হাসতে বললেন—আমিও তো তাই কই। তা' তুই ক'বের যাবি কেন?

শৈলমা—আমি স্বীকার করিনি যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ তো। নাই যদি স্বীকার ক'রে থাকিস্, তাহ'লে ওরা যা' কয়, কে'াক না, তুই অতো গায় মাখতে যাস্ কেন? যদি না চটিস্, তাহ'লে নিস্তারিণীই তো হেরে যায়। রোজ এখান থেকে বুঝে ঠিক ক'রে যাস্,

কার্য্যকালে যে মাথা ঠিক রাখতে পারিস্ না। তাইতো অযথা অশান্তি বাড়াস্।

এরপর শৈলমা, নিস্তারিণীমা বিদায় নিলেন। যাবার বেলায় শৈলমা নিস্তারিণীমাকে বলছেন—মিছেমিছি ওসব কথা আর বলিস্ না আমাকে। বুঝিস্ না, আমার দুঃখু হয়।

নিস্তারিণীমা—তুমি যা' বল, তাই-ই তো বলি।

শৈলমা আবার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—ফের ঐ কথা! খবরদার বলছি, ভাল হবে না কিন্তু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ দ্যাখ্, এইমাত্র বুঝে গেল, শুনে গেল আমার কাছে। এখনই আবার কেমন করছে। অভ্যস্ত চলন আমাদের মধ্যে এমন পাথরের মত শক্ত হ'য়ে থাকে যে তা' আর নাড়াতে পারি না, তাই খামাকা সব দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করি। অথচ সে-সমস্যা হয়তো সমস্যাই নয়।............তবে একটা জিনিস আছে—পাগল হো'ক, নির্ব্বোধ হো'ক, শৈলর এই বুদ্ধিটা মাথায় আছে যে নিকৃষ্টকে কখনও স্বামী ব'লে স্বীকার করা যায় না। ঐটুকুও মন্দের ভাল।

এরপর সবাই বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরে-ধীরে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্যারীদা ঘুমের সহায়তার জন্য শরীরটা কাঁপিয়ে দিতে লাগলেন।

* * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘুম থেকে উঠে মাতৃমন্দিরের উত্তর দিকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বকুল-গাছতলায় একটা হাতলওয়ালা লম্বা বেঞ্চে এসে বসলেন। ধীরে-ধীরে লোক জমা হ'তে লাগল। এক-একজন এসে প্রণাম ক'রে বসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রামের একজন মুসলমানের জন্য একটি লেপ তৈরী করতে দিয়েছিলেন, হরেনদা সেই লেপ তৈরী ক'রে নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর লেপ দেখে খুব খুশি, বললেন—বেশ হইছে। আজই দিয়ে দিস্, শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে ওরা।.........তা' লেপ তো করিছিস্ ভাল, একটা ওয়াড় যদি করায়ে দিবের পারতিস্, খুব ভাল হ'তো।

হরেনদা—লেপই জোটে না, তার উপর আবার ওয়াড়! এই রকম লেপ ওরা কোন দিন গায় দিছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর পাগল! শুধু লেপের থেকে ওয়াড়ওয়ালা লেপে যে আরাম বেশী হয়, সে তো বুঝিস্? আরাম-বোধ সকলের শরীরেই আছে। ওয়াড় দিয়ে দেওয়াই ভাল। দিবিই যখন একটু খুঁত রাখবি কেন? যা, বাজারে

যেয়ে ওয়াড় করায়ে নিয়ে আয় গে। সন্ধ্যে-নাগাদ ওয়াড়শুদ্ধ লেপ ওর বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবি।

হরেনদা—এখন আবার টাকা পাব কোথায় ? আর এতদিনই যখন গেছে, একদিন দেরী করলি হয় না ? আমি এইমাত্র সহর থেকে আ'সে দুটো খাওয়া-দাওয়া ক'রে এখানে চ'লে আসছি। এখন আমার ঘুম পাইছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই শালা বুঝিস্ না। কাচ্চাবাচ্চাশুদ্ধ ওদের একটা রাত বেশী শীতে কষ্ট পাতি দিবি ক্যান্ ? তোরা থাকতি ওরা অযথা একদিন বেশী দুর্ভোগ ভুগবে ক্যান্।............বোঁ ক'রে সাইকেলে দৌড় মার্, দেখিসহানে তোর ঘুম কোথায় পালায়ে যায়। আর, ওয়াড় ঠিক ক'রে ওদের লেপ যখন দেওয়া হ'য়ে যাবে তখন দেখবি শরীরে কত স্ফূর্ত্তি আসে।.........ও ডাক্তার!

কিশোরীদা (দাস) তাড়াতাড়ি এসে হাজির হ'লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কয়ডা টাকা ওরে এখনই জোগাড় ক'রে দাও তো, ওই লেপটার ওয়াড়ের জন্য। এক্ষুণি নিয়ে আস, দেরী ক'রো না, ও সন্ধ্যে-নাগাদ ওয়াড় ক'রে নিয়ে আসবে।

কিশোরীদা মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে কয়েকটা টাকা এনে হরেনদার হাতে দিয়ে বললেন—এই নিয়ে যাও, আরো যদি কিছু লাগে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিও।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার হরেনদার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—এইবার দাও তুফান মেল চালায়ে।

হরেনদা প্রস্থানোদ্যত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি যেতে গাড়ী, ঘোড়া, মানুষ-গরুর উপর লক্ষ্য রাখিস্ কিন্তু!

হরেনদা, 'আচ্ছা' ব'লে বিদায় নিলেন।

সাধনাদি (শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথমা কন্যা) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বেঞ্চখানির পূব পাশে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি রে, কখন আসলি ?

সাধনাদি—এই একটু আগে। মা'র কাছে ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর শরীরটা এমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন ?

সাধনাদি—পেটটা ভাল নয়। যা' খাই, হজম হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধপত্র খাস্ না ?

সাধনাদি—হ্যাঁ। প্যারীদা তো ওষুধ দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা আমি প্যারীর কাছে শুনবোনে।·········তোর শ্বশুর-শাশুড়ীর শরীর ভাল তো ?

সাধনাদি—মোটামুটি।

একটু পরে সাধনাদি আবার শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধনা লেখে বড় সুন্দর। কি বলেন যোগেশদা ?

যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী)—হ্যাঁ। ওর লেখাগুলি প'ড়ে বোঝা যায়, ওর conception (ধারণা) কত clear (পরিষ্কার)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু conception (ধারণা) নয়, ওর জীবনের একটা গভীর যোগ আছে এর সঙ্গে। ওর আওতায় আশ্রমের মেয়েগুলির মধ্যেও একটা রং ধ'রে গেছে। শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়েও চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ করেছে শ্বশুর-শাশুড়ীকে। পরমপিতা করেন, ও সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকে।

বরিশাল থেকে একটি দাদা এসেছেন, তিনি কর্ম্মকার, লোহার কাজ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বলছেন—শুধু পেট চালিয়েই খুশি থাকিস্ না। তোর কাজ খুব ভাল ক'রে শিখবি। এই তোদের উজিরপুরের কর্ম্মকারই নাকি এমন পোলাদ দিতে পারতো, যার কাছে শেফিল্ড-ই হার মেনে যেত। তোর পূর্ব্বপুরুষরা কামান-বন্দুক পর্য্যন্ত তৈরী ক'রে গেছে। তারা লোহার জিনিস এমন তৈরী করতে পারতো, যা' শত-শত বছর আলো-জল-হাওয়ার মধ্যে থাকলেও মরচে ধরতো না। এই কর্ম্মকার-জাতির একটা বিরাট ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস খুঁড়ে বের করতে হয়। আর, জাতীয় ব্যবসায়ে উৎসাহিত করতে হয় সবাইকে। কাজকর্ম্মের বিশেষ-বিশেষ কলা-কৌশল যা' বিশেষ-বিশেষ পরিবারে সীমাবদ্ধ আছে, যার অনেকগুলি লোপ পেতে বসেছে, সেগুলিকে আয়ত্ত করতে হয়, উদ্ধার করতে হয়, লিপিবদ্ধ করতে হয়। সেই সঙ্গে-সঙ্গে ঘরোয়া প্রাচীন সরল রকমটা বজায় রেখে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কী-কী সাহায্য গ্রহণ ক'রে কাজের মানটাকে উন্নীত করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তোমাদের ভিতরকার শিক্ষিত ছেলেরা যদি এই কাজে লেগে যায়, ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায় যারা করছে, তারা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করলেও তা'দিগকে যদি সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তোলা যায়, তাদের সুষ্ঠুতর শিক্ষার ব্যবস্থা যদি করা যায়, তবে আমার মনে হয়, তোমরা এই যান্ত্রিক যুগে অনেক কিছু অবদান দিয়ে যেতে পার। তোমাদের ভিতর থেকে এমন-সব শিল্পী, এমন-সব কারিগর, এমন-সব আবিষ্কারক গজিয়ে উঠতে পারে, যারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেবে। আর, বিশেষ ক'রে লক্ষ্য রাখতে হয়, যা'তে আমাদের দেশের উপযোগী ক'রে কুটিরশিল্পের যন্ত্রাদি আবিষ্কার করতে পার।

আমাদের দেশের অবস্থা কী, কী-কী কুটিরশিল্প এখানে চলতে পারে, সেগুলির উপর লক্ষ্য রেখে যন্ত্র বানাতে হবে। ছোট-ছোট যন্ত্রের সাহায্যে কেমন ক'রে লাভাবহ শিল্পের প্রবর্ত্তন করা যায়, তা'ও তোমাদিগকে দেখিয়ে দিতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে সম্ভব হ'লে সমবেত চেষ্টায় বিভিন্ন স্থানে শিল্পের জন্য সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যতীতও যা'তে যন্ত্রগুলি লাভজনকভাবে পরিচালনা করা যায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। ফলকথা, বৈদ্যুতিক বা বাষ্পশক্তির সাহায্য না নিয়েও তোমরা যেন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'তে পার। বৈদ্যুতিক বা বাষ্পশক্তির সৃষ্টি ও প্রয়োগ বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বত্র সম্ভব হবে না, সেইজন্যই এই কথা বলছি। এইগুলি যদি তোমরা করতে পার, তাহ'লে দেখবে, তোমরাই হ'য়ে উঠবে দেশে শিল্প-পুনরুজ্জীবনের অগ্রদূত।

বেলা প'ড়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বরিশালের কর্ম্মকার-দাদাটির সঙ্গে কথা শেষ ক'রে তামাক খেলেন। পরে বললেন—চল্, বেড়িয়ে আসি। এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পড়লেন। উঠে আশ্রমের সামনে দিয়ে বাঁধের পাশের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসলেন চরে। সঙ্গে সামান্য কয়েকজন লোক। সূর্য্য তখন আবীর ঢেলে দিয়েছে পশ্চিম দিগন্তে, আর, তারই আভায় ঝিলের জলের দৃশ্য মনোরম বর্ণাঢ্য হ'য়ে উঠেছে। এখন শস্যাদি বেশী-কিছু নেই মাঠে। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর খানিকটা রিক্ত ও ধূসর। জায়গায়-জায়গায় দু'চারটে গরু, ছাগল ইত্যাদি চ'রে বেড়াচ্ছে। ঝিলের ওপাশে জলা জায়গাটায় একদল বক ব'সে আছে শিকারের সন্ধানে। আশ্রমের পাশে বাঁশবনে কতগুলি গ্রাম্য পাখী আপন মনে কলরব করছে। তা'ছাড়া চতুর্দ্দিক নীরব, নিস্তব্ধ। শ্রীশ্রীঠাকুর চরের দিকে খানিকটা এগিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আত্মহারা হ'য়ে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দেখছেন।

কিছুক্ষণ পরে রহস্যাবিষ্ট দৃষ্টিতে ফিরে চাইলেন, বললেন—এইসব দৃশ্য দেখতে-দেখতে নাম করলে খুব তাড়াতাড়ি উদ্দীপন হয়, শব্দ জাগে। নাম না করলেও শব্দ পাওয়া যায়। তোরা শুনতে পাচ্ছিস্ না?

উপস্থিত সবাই বললেন—না।

—কী রে প্রফুল্ল, কিছু টের পাস্ না?

—না, শুধু মনটা যেন ফাঁকা হ'য়ে আসছে।

—ঐ তো ভাল লক্ষণ। চেপে নাম কর্। খোলামেলা সব ঠিক পাবি। সৃষ্টিরহস্যের মানচিত্র উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যাবে। উরে বাবা! (শ্রীশ্রীঠাকুরের

শরীর চমকে উঠলো)—কত কী যে দেখা যায় তার কি অবধি আছে ? লক্ষ-কোটি জীবনের ছবি দেখতে-দেখতে যেতে হয়। পৃথিবীর জীবন, তোমার জীবন, অনন্ত অতীত পর্দ্দার পর পর্দ্দা উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যায়। প্রচণ্ড অনুভবের চাপে ধড় ফেটে যেতে চায়। কষ্টও খুব, আনন্দও খুব। কষ্ট হ'লে কি হয় ? ছাড়ার জো নেই। নেশায় যেন অবশ ক'রে টেনে নিয়ে যায়। নামের একটা নেশা আছে, সেই নেশা ঘাড় ধ'রে নাম করিয়ে নেয়। তুমি নাম করবে না ভাবলেই কি তখন নাম ছাড়তে পার ? ঐ নেশা তোমাকে রাহুর মত গ্রাস ক'রে ফেলবে। তার কবল থেকে রেহাই পাবে না। কু-প্রবৃত্তি যেমন ক'রে মানুষকে পেয়ে বসে, সু-প্রবৃত্তিও অমনি ক'রে পেয়ে বসে। নাম করতে-করতে দেখবে, নাম তোমাদের পেয়ে বসবে। নাম যখন পেয়ে বসবে, তখন আর ভাবনা নেই। সেই অবস্থাটা আনবার জন্যই প্রথমে চেষ্টাযত্ন ক'রে নিয়মিত নাম করতে হয়। আগ্রহভরে নাম করতে-করতে ভিতরের ঠাকুর জেগে ওঠেন। তিনি জেগে উঠলে, সব সময় কেবল আসল ঠাকুরকে খোঁজেন। তাঁর সেবা, তাঁর যত্ন, তাঁর স্মরণ, তাঁর মনন, তাঁর পূজা, তাঁর প্রীতি, তাঁর প্রতিষ্ঠা এই ছাড়া তার সময় কাটে না। আর-সব তার কাছে নিরর্থক ও অবান্তর মনে হয়। যা'-কিছু তাঁকে পরিপূরণ করে, প্রীত করে, তা, হাজার কষ্টকর হ'লেও সেখানে সে এক পায়ে খাড়া। আবার, ঐ ঠাকুরের পরিপন্থী যা', তা' লাখ সুখের, আরামের ও আকর্ষণের হ'লেও, সেখানে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে কাঠ হ'য়ে, এক পা-ও এগোয় না সেদিকে।

কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-অভিমুখে রওনা হলেন। চোখ-মুখ তাঁর আনন্দে ফেটে পড়ছে, কথার মধ্যে ঈশ্বর-মত্ততার একটা অনির্ব্বচনীয় অনুরণন, যা' প্রাণকে পাগল ক'রে তোলে, আকুল ক'রে তোলে শ্রীভগবানের জন্য।

হাঁটতে-হাঁটতে থমকে দাঁড়িয়ে সুধামাখা দৃষ্টি মেলে এক-একজনের পানে চেয়ে এক-একটা কথা তার মনে খোদাই ক'রে দিচ্ছেন।

বলছেন—শালা! দুনিয়ার সবাই পাগল। মেয়েমানুষ, নাম-কাম, টাকা-পয়সা, পাণ্ডিত্য কতকিছুর জন্যই মানুষ পাগল হয়, কিন্তু আদত জিনিসের জন্য মানুষ পাগল হ'তে চায় না। তাঁকে পেলে কিছুই অ-পাওয়া থাকে না। আর, পাওয়া মানে হওয়া। ইষ্টকে তোমার মধ্যে বসিয়ে দিলে তোমার বৈশিষ্ট্যমত তুমি যা' হও, সেইটেই হ'লো তোমার ইষ্টপ্রাপ্তি। আর, এই ইষ্টের জন্য মানুষ যখন পাগল হয়, তখনই হয় সে প্রকৃতিস্থ। তার আগ-পর্য্যন্ত মানুষ অল্পবিস্তর অপ্রকৃতিস্থ জীবন যাপন করে। প্রবৃত্তির অধীন যেখানে যে যতটুকু, অপ্রকৃতিস্থও সেখানে সে ততটুকু তেমনি। আবার, এই অসঙ্গতি সে নিজে কিন্তু ধরতে পারে

না, আবার, কেউ বললেও কার্য্য-কারণ দেখিয়ে সেইটেই support (সমর্থন) করে। তবে যারা সদ্‌গুরু গ্রহণ ক'রে খানিকটা সেইপথে চলতে চেষ্টা করে, তাদের একটা মস্ত লাভ হয় এই যে, তারা নিজের ভুল কিছু-কিছু ধরতে পারে। ভুলকে ভুল ব'লে যে ধরতে পারে, তার পক্ষে তা' শোধরান অনেক সহজ।

উমেশদা (বহিরাগত সৎসঙ্গী)—ঠাকুর ! ভুল ধরতে পেরেও তো সব সময় শোধরান যায় না, তা'তে ভিতরে একটা কষ্ট থাকে। ওর থেকে তো দেখি, অদীক্ষিত যারা, তারাই ভাল আছে, তাদের একটা আত্মসন্তুষ্টির ভাব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঁঠাকে বলি দেবার আগে যখন ধান-দূর্ব্বা খেতে দেয়, তখন-পর্য্যন্তও তো সে তা' সন্তুষ্ট চিত্তেই খায়। যখন কেউ টোপ ফেলে মাছ ধরে, তখন মাছও তো সন্তুষ্ট চিত্তেই টোপ গেলে। কিন্তু সে-সন্তুষ্টি তাদের সে-সত্তাকে কতখানি পুষ্ট করে, তা' কি তারা ভেবে দেখে ? সদ্‌গুরুকে ধরেনি, কাজকর্ম্ম করে, খায়-দায় বেশ আছে, তাদের বেলাও তেমনি। যে ভুল তার বিনষ্টির পথকেই উন্মুক্ত করছে, তাকেই হয়তো সে মহা পুণ্যকর্ম্ম ব'লে আঁকড়ে ধ'রে থাকে। ঐ ভুলের জমায়েৎ কর্ম্মফল যখন হুড়মুড় ক'রে তার ঘাড়ের উপর নামে, তখন হয়তো সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না।

উমেশদা—অপকর্ম্ম ক'রেও তো বহু মানুষ বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটিয়ে দেয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মের ফল সব সময় হাতে-হাতে বোঝা যায় না। পূর্ব্বে হয়তো তার কিছু ভাল করা আছে, তার ফলে এখন হয়তো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে, আবার এখনকার অপকর্ম্মের ফল হয়তো পরে দেখা দেবে। মোটের পর কর্ম্মানুযায়ী ফল ফলবেই, সে আজই হোক আর কালই হোক। তবে মানুষ ইষ্টার্থী হ'লে, তার ভালমন্দ সব-কিছুকেই ইষ্টার্থপূরণী ক'রে তুলতে চায়, আর ঐ মহড়ায় প'ড়ে তার সব-কিছুর একটা শুভ-নিয়ন্ত্রণ হ'তে থাকে। তাই বলে, সদ্‌গুরু লাভ হ'লে কর্ম্মফল বদলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে-বলতে আশ্রমে এসে পৌঁছেছেন। বাঁধের ধারে তাসুতে এইবার তক্তপোষের উপর পাতা বিছানায় বসেছেন। ব'সে একবার তামাক খেলেন। কাজল কেমন আছেন খোঁজ নিতে বললেন। কাজলের খবর পূজনীয়া ছোটমার কাছ থেকে শুনে এসে বলা হ'লো। উমেশদা প্রভৃতি বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়াসূনে। ভিতরে এসে বয়।

যে কয়জন ছিলেন ভিতরে এসে বসলেন।

উমেশদা—আপনি বলছিলেন, সদ্‌গুরু লাভ হ'লে কর্ম্মফল বদলে যায়। কেমন ক'রে সেটা সম্ভব হয়, যদি বুঝিয়ে বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তোমার কর্ম্মফল এমন আছে যে একটা সময় তোমাকে বাড়ীছাড়া হ'য়ে পথে-পথে ঘুরতে হবে। ধর, তোমার স্ত্রী তোমাকে এতই উত্যক্ত করছে যে বাড়ীতে টেকা তোমার দায়—তোমার তখন পথে-পথে ঘোরা ছাড়া উপায় নাই। তুমি হয়তো সদ্‌গুরু গ্রহণ করেছ এবং যাজনশীল। তখন হয়তো তুমি বাড়ীর এই অবস্থায় কিছুদিন আলগা থেকে কোন ঋত্বিকের সঙ্গে যাজন-ব্যপদেশে গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে বেড়ালে। তুমি যাজনে এমন মগ্ন হ'য়ে আছ যে, সেই আনন্দে তোমার শরীর-মন ভাল হ'য়ে গেল। যে-সময়টা খুব দুঃখে কাটা উচিত ছিল, ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার হিল্লেয় প'ড়ে সেইটে পরম আনন্দের হ'য়ে উঠলো। এইরকম হয়।

উমেশদার মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তিনি হেসে বললেন—আপনি আমার খবর জানলেন কি ক'রে? আমি তো আপনাকে বলিনি। যে উপমা দিয়ে বোঝালেন, সেটা যে আমার নিজের জীবনেরই ঘটনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ক'লাম কি? তুই-ই তো কওয়ালি। বস্তু, ব্যক্তি বা পরিস্থিতি যখন যে-বোধ জাগায় মাথায় তখন তাই কই। আমি যে শালা কিছুই জানি না।

উমেশদা—মানুষ অপকর্ম্ম ক'রেও যখন দেখি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তখন দুই-এক সময় মনে হয়, ঐ পথেই চলা ভাল। ওতেই বোধ হয় ভগবানের দয়া বেশী পাওয়া যায়, দরিদ্র থাকতে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দয়া তাঁর কখনও ছাড়ে না আমাদের। তবে দয়া কথার মধ্যে আছে রক্ষা। নিজের ও অপরের সত্তা-সংরক্ষণী কর্ম্ম যে যত করে, সে তাঁর দয়াকে তত বেশী আয়ত্ত করে ও অনুভব করে। কর্ম্মের কথা বলছি এইজন্য যে, কর্ম্ম ছাড়া শুধু চিন্তায় কিন্তু হবে না। অপকর্ম্ম ক'রেও সাময়িক ভাল থাকতে পারে কেন, সে তো পূর্ব্বেই বলেছি। তবে এটা ঠিক—অবিবেকী যে, অপকর্ম্ম ক'রেও তার পৈশাচিক উল্লাস ঠিক থাকতে পারে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তার সত্তা দিন-দিন শুকিয়ে যেতে থাকে। অন্তরের এই শূন্যতা ও শুষ্কতার বোধকে এড়িয়ে চলবার জন্য সে হয়তো আরো অপকর্ম্মে গা ঢেলে দেয়। কিন্তু সে যতই খা'ক-পরুক, আরাম করুক, শান্তি বা স্বস্তি-বোধ ব'লে জিনিস তার জীবনে থাকে না। ঐশ্বর্য্যের স্তূপের মধ্যে থেকেও সে মহাদারিদ্রের জীবন যাপন করে। আবার, সুকেন্দ্রিক সৎকর্ম্মশীল যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই তার প্রাণ পুষ্ট হ'তে

থাকে জীবনীয় আনন্দ-রসে। সে ভিক্ষুকের বেশে পথে-পথে ঘুরেও যদি বেড়ায়, তবু তার বুক ভরা থাকে। আবার, তার দরিদ্র থাকাও লাগে না। অবশ্য, কেউ-কেউ স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের জীবন বরণ ক'রে নেয়, তারা ঐশ্বর্য্যের ঝামেলা বাড়ান পছন্দ করে না। তারা নিজেরা যথাসম্ভব স্বল্পে জীবন-ধারণ করে। কিন্তু অন্যকে দেবার বেলায় তারা হয় মুক্তহস্ত। আমাদের বীরেনদাকে দেখলেই হয়। আরো কত এমন আছে। ভোগ-ঐশ্বর্য্যের উপকরণ না-থাকাটা যদি একটা অপরাধের ব্যাপার হ'তো, তা'হলে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের রাজভোগ ছেড়ে বিদুরের খুদকুঁড়ো অতখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন না। শ্মশানবাসী সর্ব্বত্যাগী দিগম্বর শিব আমাদের পূজার পাত্র হতেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি
সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই
তুমি তাই পবিত্র সদাই।'

ফলকথা, রাজা হ'য়েও জীবনের গৌরব নেই যদি সুকেন্দ্রিক চরিত্র না থাকে, আর ফকির হ'য়েও জীবনে অগৌরব নেই যদি ঐ চরিত্র থাকে। সে ফকির থেকেও অন্যকে রাজা বানিয়ে ছেড়ে দেয়। যেমন করেছিলেন চাণক্য। আর, সে চা'ক বা না চা'ক, ঐশ্বর্য্য তাকে দাসীর মত সেবা ক'রে ধন্য হয়। নারায়ণ যেখানে, লক্ষ্মীর আবির্ভাবও সেখানে অবশ্যম্ভাবী।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে মাতৃমন্দিরের দোতলায় শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসর বেজে উঠলো। এখন আশ্রমের মেয়েরা সমবেতভাবে আরতি, বিনতি-প্রার্থনাদি করছেন। আজ সাধনাদি উপস্থিত আছেন, তাই সকলের খুব আনন্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের তাম্বুতে ধূপ-দীপ দেওয়া হয়েছে। ধূপের পবিত্র মিষ্টি গন্ধে ঘরখানি আমোদিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর নির্ব্বাক। কারও মুখে কোন কথা নেই। এই মধুর পরিবেশে প্রত্যেকে প্রাণমন ভ'রে নয়নাভিরামকে দেখছেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বলছেন—যদি কতকগুলি ইষ্টপ্রাণ ভাল scientist (বৈজ্ঞানিক), mechanic (কারিগর) ও artist (শিল্পী) পেতাম, তাহ'লে অনেক কাজ করা যেত।

প্যারীদা—কী কাজ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতরকম তো বলিছি। আরো মনে হয়, মানুষের সূক্ষ্মতর অনুভূতিকে জাগাবার জন্য আরো অনেকরকম নূতন musical instrument

(বাদ্যযন্ত্র), paintings (অঙ্কন) ইত্যাদি করা যায় ; বহু ভাল scent (গন্ধ) বের করা যায়। সাধন-ভজনের সময় রূপ, রস, গন্ধ ও শব্দের নানা রকমারি অনুভূতি হয়। সেই-সব জিনিসকে আমরা যদি বাহ্যিক রূপ দিতে পারি, তবে তা' মানুষের সূক্ষ্মতর তজ্জাতীয় অনুভূতির উদ্বোধনে সহায়তা করবে। খুব মাথাওয়ালা মানুষ চাই। আর তারা এই-ভাবের ভাবুক হওয়া চাই। তারা এই নিয়ে লেগে-প'ড়ে থাকবে। এমন-সব বাদ্যযন্ত্র করা যায় এবং এমন-সব গৎ তা'তে বাজান যায় যে, তা' মানুষের মনকে বিশেষ-বিশেষ ঈপ্সিত স্তরে পৌঁছে দেবেই কি দেবে। রংয়ের এমন সমাবেশ ক'রে এমন-সব ছবি আঁকা যায়, যে-সব ছবি দেখলেই মানুষের মন অন্তর্মুখী হ'য়ে উঠবে। এমন-সব গন্ধ বের করা যায়, যে-গন্ধ মানুষের মনকে অবশ্যই পবিত্রভাবে উদ্দীপ্ত ক'রে কারণ-মুখী ক'রে তুলবে। আশা, উদ্যম, ভরসা যা-ই সঞ্চারিত করতে চাই, তাই-ই তৎক্ষণাৎ সঞ্চারিত করতে পারব, এমন শব্দ, গন্ধ ও রূপের সৃষ্টি করা অসম্ভব কিছু নয়। পুরো scientific accuracy (বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য) নিয়ে আমরা এটা করতে পারি। শুনেছি, যা'-কিছুরই একটা wave (তরঙ্গ) আছে, এই wave-এর (তরঙ্গের) আবার একটা specific (বিশিষ্ট) চেহারা আছে। রকমারি জিনিসের রকমারি wave-এর (তরঙ্গের) আবার একটা সম্পর্ক আছে। একজনের mental wave-এর (মানসিক তরঙ্গে) হয়তো deficiency (খাঁকতি) আছে ; শব্দ, গন্ধ ও রূপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় wave (তরঙ্গ) impart (সঞ্চারিত) ক'রে আমরা হয়তো তার ঐ mental deficiency (মানসিক ন্যূনতা) cure (আরোগ্য) করতে পারি। শরীরের ব্যাধি, মনের ব্যাধি সারাবার ব্যাপারে গভীরতর শক্তি ও বোধের জাগরণে এগুলি কাজে লাগান যেতে পারে। তেমন মানুষ পেলে আমি অনেকখানি ধরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এর পেছনে আদাজল খেয়ে খাটা লাগবে।

প্রফুল্ল—তাহ'লে তো মানুষের জন্মগত সম্পদ্ কম হ'লেও আটকাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাদ্য, ওষুধপত্র, নামধ্যান, উন্নত-স্তরের শব্দ, গন্ধ, দৃশ্য, পরিবেশ, পুঁথিপত্র ইত্যাদির সাহায্য পেলেই সবাই যে সমানভাবে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, তা' কিন্তু নয়। যার গ্রহণক্ষমতা যেমন, সে উপকৃত হবে তেমনি ততটুকু। সেটা আবার নির্ভর করে জন্মগত সংস্কারের উপর। একটা ঘটির পরিমাপ বা পরিমাণ যতটুকু, ততটুকু জিনিসই এ ঘটিতে ধরবে, এখন ঐ ঘটিতে তুমি যা-ই রাখ। তুমি ইচ্ছা করলে সোনাও রাখতে পার, আবার ছাইও রাখতে পার। তোমার ঘটিটা যতটুকুই হোক, তা' যদি মূল্যবান জিনিসে ভরা থাকে, তাহ'লেই

হ'লো। ঘটি ছোট ব'লে তোমার দুঃখ করবার দরকার নেই। কোন্‌টা মূল্যবান জিনিস, কোন্‌টা বাজে জিনিস তার একমাত্র মানদণ্ড হ'লো, সেটা ইষ্টের কাজে লাগে কেমন, কতটুকু। ঘটির কথা বললাম, এটা কিন্তু নিতান্ত উপমাচ্ছলে, তীব্র ইষ্টানুরাগে মানুষের আধারও যে বড় হ'য়ে না যায়, তা' নয়। তবে একটা মানুষ যদি তার জন্মগত সম্ভাব্যতার মধ্যে চরম যতখানি, অনুশীলনের সাহায্যে ততখানিই বাস্তবায়িত ক'রে তোলে সে-ই যথেষ্ট। প্রতিলোম যদি না হয়, কোন মানুষের মধ্যে সম্ভাব্যতা যে নিতান্ত কম থাকে, তা' আমার মনে হয় না।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় কালীষষ্ঠীমা এসে হাজির হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন ক'রে হাসিখুশি হ'য়ে বললেন—এই দেখ, পয়মন্ত মানুষ আ'সে গেছে। দেখলিই শালা পরাণ ঠাণ্ডা।

কালীষষ্ঠীমা—যারে দেখলি পরাণ ঠাণ্ডা হয়, তার কাছেই তো মানুষ আসে। আমিও তো ঠাণ্ডা হবার জন্যি আপনার কাছে ছুটে-ছুটে আসি। সংসারের যে ঝামেলা!

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমি কালীষষ্ঠী, কালীষষ্ঠী ক'রে হা-পিত্তেশ ক'রে ব'সে থাকি, কালীষষ্ঠীর কি সময় আছে, সে আমার কাছে এসে ব'সে থাকবে? তার কত কাজ!

কালীষষ্ঠীমা—না ঠাকুর! মস্করার কথা না। যখনই রাগ-ধাগ ক'রে আপনার কাছে কিছু বলতি আসি, আপনি হাসায়ে-রসায়ে ভুলায়ে দেন। কিন্তু সংসারে বড় জ্বালা। যতই করা যাক, খুশি করা যায় না কাউকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজনের খুশির জন্য সব না করলি কি জনে-জনে খুশি করা যায়? আমি কালীষষ্ঠী, কালীষষ্ঠী করি, কালীষষ্ঠীর পাত্তা পাই না, কালীষষ্ঠী ছাওয়াল-ছাওয়াল করে, কলবাড়ী-কলবাড়ী করে, সেগুলি গোছায়ে আওতার মধ্যি আনতি পারে না।............এইতো দেখ দুনিয়ার হাল, এখন কি করবা বল?

কালীষষ্ঠীমা—কতবার শুনিছি আপনার মুখে। বুঝিও সব। কিন্তু আমরা হলাম যে জ্ঞানপাপী। ঘর-সংসারের 'পর-ই তো আমাদের টান বেশী। আপনার উপর সেই টানটা হ'লে তো দুঃখ অনেক কমে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ঘর-সংসার, বিষয়-আশয় কোনটা বাদ দিতে কই না। ওগুলি যদি ইষ্টের জন্য হয়, তাহ'লে কোন ভাবনা নেই। তোমার মধ্যে যদি সেই ধাঁজ থাকে, তবে ছেলেপেলেদের মধ্যেও তা' ঢুকে যাবে। সংসার ভাল ক'রে করতে পারবা, অথচ জড়ায়ে প'ড়ে হাবুডুবু খাবা না। (একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পরে বললেন)—তুই যদি ভাল গিন্নী না হতিস্‌, তাহ'লে কাচ্চাবাচ্চাদের

নিয়ে সংসারটা কি এইভাবে তুলে ধরতি পারতিস্ ? আর, তোর ছাওয়ালরাও কিন্তু তোকে ভালবাসে খুব। তোর 'পর টান না থাকলি এতখানি পারত না।

কালীষষ্ঠীমা—সবই আপনার দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো হ'লো। আমাকে ভুরে তো দিলি না, আমি পায়েস খাব।

কালীষষ্ঠীমা—ভুরে তো যোগাড় ক'রেই রাখিছি, যেদিন ক'ন, এনে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেদিন আবার কী ? এখনই এনে বড় বৌয়ের কাছে দে। আজ রাত্রেই ভুরের পায়েস খাব। তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। উনোনে আঁচ থাকতি-থাকতি নিয়ে আসা চাই।

কালীষষ্ঠীমা দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

৭ই পৌষ, সোমবার, ১৩৪৮ (ইং ২২।১২।৪১)

শ্রীশ্রীঠাকুর সবেমাত্র সকালে ঘুম থেকে উঠেছেন। আচমকা একটি মা এসে ঠুস হ'য়ে কেঁদে পড়লেন, 'বাবা ! আমার বুক যে জ্বলে যাচ্ছে, আমি যে আর সইতে পারছি না। বাবা ! আমি কী পাপ করেছি ? তুমি আমাকে না নিয়ে খোকাকে নিলে কেন ?............আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না। বুকখানা আমার ঝাঁজরা হ'য়ে গেছে। আমি কী করব বাবা ! কোথায় যাব ? কোথায় গিয়ে জ্বালা জুড়োব ?' প্রৌঢ়া একটি মা (নদীয়া থেকে আজ ভোরে এসেছেন, সঙ্গে পাড়ার একজন সৎসঙ্গী) এইভাবে বিলাপ করছেন, আর হাউ-হাউ ক'রে কাঁদছেন, মাঝে-মাঝে তাম্বুর সানে মাথা খুঁড়তে চাইছেন, আর অন্য সবাই তা' থেকে তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও নির্ব্বাক, তাঁর চোখ দিয়ে টস্-টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখখানা বিষাদ ও করুণায় ভরা, পুত্রশোকাতুরা জননীর থেকেও তাঁর মুখশ্রী বেশী মলিন ও পাণ্ডুর হ'য়ে উঠেছে। তিনিই যেন হারিয়েছেন তাঁর অতি প্রিয়জন কাউকে। অঝোরে ধারা বেয়ে পড়ছে তাঁর দুটি চোখ দিয়ে। কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর চোখ দুটি লাল হ'য়ে উঠেছে। চোখের জল গড়িয়ে প'ড়ে গায়ের কাঁথা ভিজে যাচ্ছে। মা'রও ক্রন্দন ও বিলাপের বিরাম নেই। তিনি এতই অভিভূত যে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চাইবার অবকাশ নেই। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থাও কাহিল। তাঁর চোখ-মুখের দিকে আর চাওয়া যাচ্ছে না, একটা অব্যক্ত বেদনায় তিনি যেন মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা

পাচ্ছেন। বার-বার তাঁর অধর স্ফুরিত হ'য়ে উঠছে, অতি কষ্টে নিজেকে কোনভাবে চেপে আছেন। তাঁর পদ্মপলাশলোচনে যেন নিখিলের বেদনা আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কাছে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে এ দৃশ্য অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে। মা'টি এইবার একবার মুখ তুলে চাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে। চেয়ে তিনি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন—দেখলেন, দয়াল কাঁদছেন আর পলে-পলে মর্ম্মান্তিক বেদনায় তিনি যেন ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছেন। পরক্ষণেই মা'র ভাব বদলে গেল। মা বলতে লাগলেন—'দয়াল! বাবা! তুমি অমন ক'রে কেঁদো না। তুমি কাঁদলে আমি কোথায় গিয়ে সান্ত্বনা পাব!'

শ্রীশ্রীঠাকুর কাঁদতে-কাঁদতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আমি কাঁদব না তো কাঁদবে কে? তোদের সবার কান্না না ঘুচলে আমার কান্না ঘুচবে কী ক'রে? (একটু থেমে পরে আবার বললেন)—আমার দৃঢ় ধারণা অকালমৃত্যুকে নিশ্চয়ই রোধ করা যায়। রামচন্দ্রের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলের অকালমৃত্যু হওয়ায়, সেই ব্রাহ্মণ এসে কৈফিয়ৎ চেয়েছিল রামচন্দ্রের কাছে, 'কেন তোমার রাজ্যে অকালমৃত্যু হয়?' তখন রামচন্দ্র তার অনুসন্ধানে ব্রতী হ'য়ে বিহিত ব্যবস্থা যা' তাই করেছিলেন, যা'তে রাজ্যে অকালমৃত্যুর কারণ না ঘটে। আজ আমাদের দেশে, আরো কত দেশে, ঘরে-ঘরে তোমার খোকার মত কত নধর কচি খোকারা অকালে ম'রে যাচ্ছে, অথচ এর প্রতিকার হ'চ্ছে না, তা' কেন? কেন আমরা এটা ঘটতে দিচ্ছি? আমি যদি বুঝতাম যে এর উপর আমাদের কোন হাত নেই, তাহ'লে তত দুঃখ ছিল না। কিন্তু আমি জানি, এ রোধ করা যায়।

ইতিমধ্যে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনিদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), শরৎদা (হালদার), সতীশদা (দাস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), গুরুদাসদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), অমরভাই (ঘোষ) প্রভৃতি অনেকে এসে হাজির হলেন।

কেষ্টদা ঐ কথার সূত্র ধ'রে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা আশু কী করতে পারি এই অকালমৃত্যু রোধের জন্য?' মা'র ইতিমধ্যে কান্না থেমে গেছে, তিনি গভীর মনোযোগ-সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি যেন গিলছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখও এখন অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করেছে, বরং খানিকটা প্রেরণা-উদ্দীপ্ত। তিনি মা'টিকে বললেন—অমনি ক'রে মাটিতে বসিস্ না বাইরে, একে তো গাড়ীতে ঠাণ্ডা লাগিছে রাত্রে। উপরে উঠে বয়।—ও কালিদাসী! ওকে একটা আসন দে তো।

কালিদাসীমা একখানা আসন এনে দিলেন। মা সেই আসন পেতে বসলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে চেয়ে মৃদু, ম্লান হাসি হেসে বললেন—কী করতে হবে সে তো ঢের শুনিছেন। যা' শুনিছেন, তাই এখন করেন।

কেষ্টদা—আমি অকালমৃত্যু-রোধে specific (বিশিষ্ট) করণীয় কী তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি problem (সমস্যা)-গুলি singly (একক) দেখি না, দেখি সবগুলিই inter-connected অর্থাৎ জড়িয়ে আছে। তাই মোকথা করণীয় হিসাবে আপনাদের কাছে যা' কইছি, তা' যদি করেন, তাহ'লে সব অমঙ্গলই রোধ করতে পারবেন। আপনাদের প্রধান কাজ হ'লো দীক্ষাদান। যত মানুষকে দীক্ষিত ক'রে তুলতে পারবেন,—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচারে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে পারবেন, জানবেন, ততগুলি মানুষকে জীবনের পথে টেনে আনা হ'লো, মঙ্গলের পথে টেনে আনা হ'লো, কারণ, ইষ্ট হলেন মূর্ত্ত মঙ্গল। এই দীক্ষা আনবে আবার পারস্পরিকতা ও সংহতি। তা'তে পরস্পর পরস্পরের বৈষয়িক উন্নতিরও সহায়ক হ'য়ে উঠবে। তারপর বিয়েটা খুব দেখে-শুনে দিতে হয়, সমাজে প্রতিলোম বিয়ে যেন একটাও না হয়। ছেলে যেন সব দিক দিয়ে উন্নত হয়, শ্রেয় হয় মেয়ের চাইতে। আবার, ছেলেমেয়ের মধ্যে temperamental affinity (মানসিক সঙ্গতি) থাকা চাই। বয়স্ক মেয়েদের বিয়ে দিতে গেলে সাক্ষাৎ সংস্রবের সুযোগ না দিয়ে ছেলের বংশ, অভ্যাস, ব্যবহার, চরিত্র, গুণপনা, স্বাস্থ্য, চেহারা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি বিষয় তাকে জানিয়ে তার মত নিয়ে তবে বিয়ে দেওয়া ভাল। স্ত্রী যদি স্বামীকে শ্রদ্ধা করে, তার জন্য কষ্ট স'য়েও নিজেকে সুখী ও সার্থক মনে করে, তাহ'লেই সেই বিয়ে সফল হয়। আয়ুর একটা বংশগত ধারা থাকে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেখানে গভীর পবিত্র প্রণয় আছে, স্ত্রী যেখানে স্বামীকে নিজের সত্তাজ্ঞানে ভালবাসে, স্বামী যেখানে স্ত্রীকে নিবিড় স্নেহের চক্ষে দেখে, সেখানে সন্তানের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, আয়ু ইত্যাদির উৎকর্ষ হবেই। অবশ্য, স্বামীর ইষ্টমুখী হওয়াই চাই। স্বামী যদি স্ত্রীমুখী হয়, সেখানে স্ত্রী ঐ স্বামীকে বেশীদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে না। তা'ছাড়া, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই তখন প্রবৃত্তিরই প্রাধান্য দেখা যায়। এইভাবে মানুষ যদি ইষ্টকৃষ্টি ও সদাচারপরায়ণ হয়, বিয়ে যদি ঠিকমত হয়, শিক্ষা ও পরিবেশকে যদি খানিকটা সুগঠিত ক'রে তোলা যায়, পুরুষের ও মেয়ের অবশ্যজ্ঞাতব্য যা', অবশ্য করণীয় যা', সেগুলিতে যদি তাদের সড়গড় ও সক্রিয় ক'রে তোলেন, দেখবেন, দেশের লোকের স্বাস্থ্য,

আয়ু, কর্ম্মক্ষমতা কতখানি বেড়ে যাবে। আর, সুজনন ও সুযোগ্যতার জন্য চাই বর্ণাশ্রমসম্মত চলন। এগুলি সোজাসুজি বিজ্ঞানের কথা। আমাদের হাতের মধ্যের ব্যাপার।

কেষ্টদা—আপনি এই যা' বললেন, এই ক'টা কথা মাথায় রেখে চলতে পারলে তো অনেক কিছু হ'য়ে যায়। কিন্তু দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে এইটে চারাতে গেলে যে বহু কাঠখড়ি খরচ করা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তো আমি বার-বার আপনাদের কই কর্ম্মীসংগ্রহের কথা। চরিত্রবান আচরণবান কর্ম্মী ছাড়া হবে না। আর পুঁথিপত্র, বক্তৃতা, রেডিও, সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার, নাটক, নভেল, গল্প, শিল্পকলা, সঙ্গীত, আমোদ, উৎসব, মেলা, কথকতা, কবি, জারি, খবরের কাগজ, চিঠিপত্র, পত্রিকা, খেলাধূলো, প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা, পোষ্টার, প্যাম্ফলেট, ছবি, মটো, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি যতভাবে পারেন সব-কিছুর মধ্য-দিয়ে মানুষকে ভগবদ্‌মুখী ক'রে তুলতে, কর্ম্মঠ দক্ষ ক'রে তুলতে, সুসংহত ও সেবাপ্রাণ ক'রে তুলতে প্রেরণা যোগান। লাগেন শালা যা' থাকে কপালে। দুনিয়ায় আইছি তো সুখ ক'রে নিই। (চকিতে ডান হাতখানি ঊর্দ্ধে উত্তোলন ক'রে)—'হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি হাতে লয়ে জয়তূরী, জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে, রাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে, অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ম ছুরি।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে প্রচণ্ড উদ্দীপনার স্থির বিজলী-দীপ্তি। অগ্নিময় উদ্দীপনায় এত শীতের মধ্যেও যেন সকলে গরম হ'য়ে উঠেছেন। উপস্থিত সবার চোখ-মুখ আনন্দে জ্বলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে এইবার তামাক সেজে দেওয়া হ'লো। তিনি আস্তে-আস্তে তামাক খাচ্ছেন। দৃষ্টি ফ্যালফেলে—যেন অন্য কোন রাজ্যে আছেন। আয়ত আঁখিযুগলে স্নেহ, প্রেম, করুণা ও প্রেরণা এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের সৃষ্টি করেছে, সেই অমিয়-দৃষ্টি মেলে দয়া-বৃষ্টি করছেন সবার উপর। প্রত্যেকের বুক কানায়-কানায় ভ রে গেছে সুধাসিক্ত আনন্দ-সম্ভারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে, অনুপম ললিত-ভঙ্গিমায়, লীলায়িত অনিন্দ্য-কণ্ঠে প্রাণকাড়া মূর্চ্ছনা তুলে আবৃত্তি সুরু করলেন—

'কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এসো মোর পিছে,

গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ ॥

নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়,
নাহি আর আগু-পিছু।
পেয়েছি সত্য, লভিয়াছি পথ,
সরিয়া দাঁড়ায় সকল জগৎ,
নাই তার কাছে জীবন-মরণ
নাই নাই আর কিছু ॥

হৃদয়ের মাঝে পেতেছি শুনিতে
দৈববাণীর মতো—
উঠিয়া দাঁড়াও আপন আলোতে,
ওই চেয়ে দেখো কতদূর হ'তে
তোমার কাছেতে ধরা দিবে ব'লে
আসে লোক কত শত ॥

ওই শোনো শোনো কল্লোল-ধ্বনি
ছুটে হৃদয়ের ধারা।
স্থির থাকো তুমি থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি
এ নিশীথ-মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা ॥

কেষ্টদা, শরৎদা প্রভৃতি এক-একজনের চোখে চোখ রেখে চাপ দিয়ে-দিয়ে বলতে লাগলেন—

"স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি,
এ নিশীথ-মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা ॥"

—এমন ক'রে একটা আকুল-কঠোর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুলছেন সবার মধ্যে।

তখন রোদ উঠে গেছে। চরের দিক থেকে ঝিরঝির হাওয়া দিচ্ছে। ধীরে-

ধীরে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। এই আসরের একটা মাদকতা আছে। আছে একটা মৌতাত। নেশার মত পেয়ে বসে। একটুক্ষণ বসলে আর উঠতে ইচ্ছা করে না। একদিন আসলে রোজ আসতে ইচ্ছা করে। না আসলে ভাল লাগে না, মন খুঁত-খুঁত করে। তাই ছোট-বড়, নারী-পুরুষ অনেকেই আসছেন, আসছেন আর প্রণাম ক'রে ব'সে যাচ্ছেন, কেউ বা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পুলকবিভোর প্রাণে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাঁকে দেখছেন। দেখছেন দেবদেহের সুঠাম সৌন্দর্য্য, আর শুনছেন তাঁর অমিয়-মধুর বাণী। দেখছেন, শুনছেন আর তাদের হৃদয় আনন্দে আকুল হ'য়ে উঠছে, একটা অতৃপ্ত তৃপণ তৃষা লেগে আছে তাদের চোখে। লোকেশ যিনি, প্রাণেশ যিনি, জীবজীবন যিনি তিনি যখন দেহধারণ করেন, তিনি এমনি ক'রেই প্রতিনিয়ত প্রতিটি প্রাণে সুখ বিতরণ করেন।

নগেনদা (বসু) একটু খক্-খক্ ক'রে কাশছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাশী হইছে, ওষুধ-টষুধ খান না ?

নগেনদা—খাইছি, কমছে না। শীতকালে আমার একটু গোলমাল লেগেই থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল ক'রে তেল মাখবেন। আর মধু খাবেন। বাসক-ছালের রস যদি মধু দিয়ে খান, ভাল হয়। রোজ নিয়মিত খাবেন। আর পারলে খাবার পাতে মধু খাবেন। এটা বরাবর খেয়ে যাবেন। মধু খাওয়া খুব ভাল।............ও প্যারী! কার্ত্তিক বোসের বই বা নাদকারণির 'ইণ্ডিয়ান মেটিরিয়া মেডিকা' এনে মধুর গুণ কী নগেনদার কাছে প'ড়ে শোনা তো।

নগেনদা—আপনার মুখে শুনলাম, সেই যথেষ্ট, আর বই আনা লাগবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিস্মিত হ'য়ে)—ও মা গো! সে কি কথা ? আমি কলাম, সেইজন্য আর বই দেখা লাগবে না, সে কেমন কথা ? আর বই দেখার কথাও তো আমি কচ্ছি। যা' জানবেন, তা' thoroughly (পুরোপুরি) জানবেন। মধু কেন ভাল ? কোন্-কোন্ অবস্থায় এটা কার্য্যকরী, নতুন টাটকা মধুরই বা গুণ কী, পুরোন মধুরই বা গুণ কী, খেলে কোন্ মাত্রায় খাওয়া দরকার, এসব জেনে নেবেন না ? অলস আন্দাজী জ্ঞান ভাল না। অনুসন্ধিৎসা নিয়ে খুটিয়ে-খুটিয়ে জানবেন। তখন সেই জ্ঞান দিয়ে মানুষেরও উপকার করতে পারবেন। আপনি না মাষ্টারমানুষ, ছেলেমেয়েদের পড়ান, আপনার মধ্যে এসব অভ্যাস খুব তুখোড় ক'রে রাখা লাগে। মুখে-মুখে লাখ শেখান, তার কোন দাম হবে না, যদি ভাল অভ্যাসের ভিত গেড়ে দিতে না পারেন তাদের ভিতর। আর, সদভ্যাস আপনার যদি আয়ত্ত না হয়, স্বভাবগত না হয়, তবে তার ভিত গাড়তেও পারবেন না

অন্যের ভিতরে। শিক্ষকের প্রতি সাধারণতঃ ছাত্রদের কিছু-কিছু শ্রদ্ধা থাকেই, ঐ শ্রদ্ধার দরুন শিক্ষকদের চরিত্র অলক্ষিতে ছাত্রদের ভিতর চারিয়ে যায়। তাই শিক্ষকদের খুব সাবধানে চলা লাগে। শুধু ক্লাসে সাবধান হ'য়ে চললে চলবে না, সর্ব্বক্ষণ সাবধান হ'য়ে চলা লাগবে, হিসেব ক'রে চলা লাগবে, ভাবা লাগবে আমি এমন-কিছু করছি কি-না, যা' অনুসরণ বা অনুকরণ ক'রে আমার কোন ছাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। আপনি হয়তো সাহিত্য পড়াবার সময় উদারতা, দানধ্যান সম্বন্ধে খুব লম্বা-লম্বা কথা ব'লে এলেন। আপনার সেই কথা শুনে ছাত্র বা ছাত্রীরা হয়তো খুব অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠলো। তার একঘণ্টা বাদে আপনাকে হয়তো দেখা গেল, আপনি রাস্তায় দাঁড়ায়ে ঈষদাদার সঙ্গে একটা টিউশনির জন্য খেয়োখেয়ি করতিছেন। আপনার অগোচরে দেখে গেল, ক্লাসে আপনার কথা যে-সম্বেগ সৃষ্টি করিছিল ছাত্রের মনে, তার উপর জল ঢেলে দিল আপনার রাস্তার ঐ আচরণ। তার শ্রদ্ধা ও সম্বেগ যা' তাকে মহান ক'রে তুলতে পারতো, তার উপর মারলেন আপনি এক কুড়োলের কোপ, এরপর আপনার মুখে যখনই কোন ভাল কথা শুনবে, সে মনে করবে, ঐগুলি লোক ঠকানর জন্য বলতে হয়, করতে হয় না। আপনার ভণ্ডামী, আপনার মন-মুখ ও আচরণের ফারাক, তাকেও অমনতর হ'তে প্রেরণা জোগাবে। বুঝলেন তো ব্যাপার কত গুরুতর। খুব সাবধান। আর, এটা শুধু আপনাকে ব'লে বলছি না, ঋত্বিক্‌দের ব্যাপারে এটা ঢের বেশী সত্যি। পিতা-মাতার বেলায়ও এ-কথা খাটে। এমন মানুষ খুব কমই আছে যাকে কেউ-না-কেউ শ্রদ্ধা না করে। তাই পরিবেশের দিকে চেয়েও প্রত্যেকের সুনিয়ন্ত্রিত চলনায় চলা লাগে।

ইতিমধ্যে প্যারীদা বই এনে বই থেকে মধুর গুণাগুণ শোনালেন।

আগের কথার সূত্রে নগেনদা বললেন—যা' হ'য়ে আছে, এই বয়সে শোধরান বড় মুশকিল। এ জীবন বোধহয় এইভাবেই যাবে, আর তো একরকম পাড়ি দিয়ে আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর (দৃপ্ত ভঙ্গীতে)—

এক ঝাঁকিতে মোড় ফিরিয়ে
অভ্যাস ব্যবহার প্রত্যয়ের—

কি তো কেষ্টদা ?

কেষ্টদা—

আদর্শতে অবাধ চ'লে
বর্দ্ধনে হ' অঢেল ঢের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কথা ! এক লহমায় ভোল বদলে দিতে পারেন আপনি। (উল্লসিত ভঙ্গীতে) ঝেড়ে দাঁড়ালে আপনাকে রোখে কে ? 'রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে।' শালাগুষ্ঠির নে কিছু বুলিছে। অকাম যা' করিছি, করিছি ; এইবার তাকে ঝাড়েমূলে নিকেশ করব। নিকেশ করব মানে আর সে পথে হাঁটবো না, যা'তে আমার ইষ্টের সুখ-সুবিধা বা সন্তোষ না হয়।

আর, জীবন পাড়ি দেবার কথা যে কচ্ছেন, জীবন পাড়ি দেওয়া অতো সোজা না। এখনও আরো কতদিন বেঁচে থাকবেন ;—নীরোগ, দীর্ঘায়ু হ'য়ে বেঁচেবর্ত্তে থাকেন সেই তো আমি চাই। তবে মনে রাখবেন, আপনার জীবন এইখানেই শেষ হ'য়ে যাবে না। যা' নিয়ে যাবেন, তাই নিয়েই আবার আসতি হবে। যে-রাস্তা হাঁটবার সে-রাস্তা হাঁটতিই হবে। সময় থাকতি হাঁটে নেন, এখন সামনে পথ দেখায়ে দেবার লোক আছে, আপনি ইচ্ছুক হলি আপনার হাত ধ'রে এগিয়ে নিয়ে যেতেও সে রাজি আছে, রোজ-রোজ এ সুযোগ মিলবি নানে, পরমপিতার মর্জিতে সুবাতাস এসেছে, এই ফাঁকে পাল তুলে দেন।

এই ব'লে নগেনদার দিকে চেয়ে ফিক ক'রে একটু হাসলেন, স্নিগ্ধ-স্মিত দৃষ্টিতে বললেন—কপা'লে আছেন কিন্তু আপনি খুব। (মাথাটা একটু দুলিয়ে বললেন)—হিঁ।

নগেনদা—সব বুঝি। কিন্তু করার সম্বেগ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোকাকে যেমন ভালবাসেন, আমাকে যদি তেমনি আপনি আপনার খোকার মত ক'রে ভাবেন, তাহলিই হয়। পরজীবন না মানেন, খোকার জীবন তো প্রত্যক্ষ। ওর ভিতর-দিয়ে বাঁচবেন। আপনার আচরণ দিয়ে ওকে, ওর পরিবেশকে যত উন্নত ক'রে যাবেন, খোকা, খোকার ছেলেপেলের ভিতর-দিয়ে আপনিই তা' উপভোগ করতে থাকবেন।

এইবার শ্রীশ্রীঠাকুর পায়খানায় যাবেন। সবাই প্রণাম ক'রে গাত্রোত্থান করলেন। পুত্রহারা জননী ব'সে আছেন, তাঁর মুখের চেহারা এতক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শোনার পর এখন অনেকটা স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমরভাইকে ডেকে বলছেন—মাকে সঙ্গে ক'রে গেষ্টহাউসে নিয়ে যা। দেখিস্ যেন কোন অসুবিধা না হয়। খাওয়া-থাকার যত্ন নিবি। কত পাগল আছে এখানে, কেউ যেন বিরক্ত না করে ওকে। কত ব্যথা নিয়ে এসেছে।

উক্ত মা—আমি আর কোথাও যাব না বাবা। আমার খাওয়া-দাওয়া লাগবে না। আপনার মুখখানা দেখে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়েছে। আমি আপনার কাছাকাছি এই দিকেই থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বেশ। তুই হাত-মুখ ধুয়ে আয়। আমিও হাগেমুতে আসি। ইচ্ছে হ'লি এই দিকে থাকবি, আর বড়বৌয়ের ওখানে প্রসাদ পাবি।

মা—বড়মা প্রসাদ দিলে খেতেই হবে, কিন্তু বাবা! আমার মুখে আর দানা তুলে দিতে ইচ্ছে করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখ্‌, তোকে বাঁচতে হবে আমার জন্য। না খেলে বাঁচবি কি ক'রে? যতদিন বেঁচে থাকবি, তোর সাধ্যমত ইষ্ট ও সুনীতি চারিয়ে দিবি সবার মধ্যে, তোর বুদ্ধি থাকবে, তোর আশপাশের কেউ যেন তোর মত অজ্ঞতার দরুন সন্তানের অকালমৃত্যুতে কষ্ট না পায়।

মা সম্মতি জানালেন। চোখ তাঁর ছল-ছল ক'রে উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে মাতৃমন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় চৌকিতে বিছানায় এসে বসেছেন। বেশ শীত পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা পাতলা চাদর গায় দিয়ে আছেন। চারিদিকে বেশ রোদ উঠে গেছে। আশ্রমের সামনের দূরবিস্তৃত প্রান্তর যেন গা এলিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। তা' ছাড়া চতুর্দ্দিকে একটা শান্ত কর্ম্মতন্ময়তার উদ্যোগ। আশ্রম-প্রাঙ্গণে কয়েকজন তরকারিওয়ালা এসে বসেছে, এখন কেনাবেচা শুরু হবে। কারখানায় ইঞ্জিন চালিয়ে কাজ হচ্ছে, তার ঘটঘট শব্দ আসছে। বাদলদার বাড়ীতে কয়েকজন কামলা কাজ করছে, মাঝে-মাঝে তাদের এক-একজন আবার মিঠে গলায় সুন্দর গানের তান খুলছে। সঙ্গে-সঙ্গে আছে নানারকম গ্রাম্য পাখীর কলরব। ভগীরথদা ডিস্‌পেন্সারী খুলেছেন, ওখানেও লোকের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে। ফিলান্‌থ্রপি অফিসের কর্ম্মীরা একে-একে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে যা'চ্ছেন। প্রফুল্লদা (বাগচী) এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—এ টার্ম্মে কাজকর্ম্ম কেমন হ'লো?

প্রফুল্লদা বললেন—কাগজ-পত্র সব এসে পৌঁছায়নি, এবং সব রেকর্ড করাও হয়নি। তবে যতদূর জানা গেছে, কাজ ভালই হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি কাম সা'রে ফেলা।

প্রফুল্লদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব সময় লক্ষ্য রাখবি, কাজ যা'তে up-to-date (আজ পর্য্যন্ত) হয়। কাজের সুবিধার জন্য যখনই যে-খবরের প্রয়োজন হয়, তা' ঠিক-ঠিক দিতে পারা চাই। তোদের অফিসের কাজে যদি কোন ঢিলেমি থাকে, তাহ'লে সেই ঢিলেমিই কিন্তু চারিয়ে যাবে কর্ম্মীদের মধ্যে। যে-কাজ করবি, ব্রত হিসাবে করবি, thoroughly (সম্পূর্ণভাবে) করবি। কাজের মধ্যে

চাই একটা আগ্রহমদির নিষ্ঠা। তোমার থেকে অন্যের মধ্যেও ঐ নিষ্ঠা ছড়িয়ে পড়বে। আর, কাজ করতে গিয়ে পয়সার কথা, অভাবের কথা ভাববি না। ইষ্টের প্রীত্যর্থে কর্ম্মমাতাল যত হবি, অভাববোধের বালাই যত থাকবে না অন্তরে, ততই দেখবি প্রকৃতিই তোকে ভরপুর ক'রে দেবে।

প্রফুল্লদা—আমি করণীয় যা' তা' নিয়মিত ক'রে যাই, কিন্তু অভাবের চিন্তাটা ছাড়তে পারি না। তবে জানি, পরমপিতার দয়ায় না খেয়ে মরব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ঠাকুরের টানে তোমার মন যদি ভরা থাকে, আবার অন্যের মন যদি ভ'রে তুলতে পার তোমার সেবা, সাহচর্য্য ও কর্ম্ম দিয়ে, তাহ'লে তোমার পেট কখনও খালি থাকবে না—এ ঠিক জেনো। স্বভাব গুণে অভাব নষ্ট—এ-কথা সব সময় স্মরণ রেখো। না ক'রে ফাঁকি-ফুঁকি দিয়ে যদি কিছু পাও-ও, তা'তে কিন্তু অভাব ঘুচবে না। স্বভাবে দৈন্য থাকলে অভাববোধ ক্রমাগত বেড়ে চলবে। তাই, যতই পাও অভাব ছাড়বে না। আবার, তোমার স্বভাব যদি সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে, সেই স্বভাবই তোমাকে সৎ-ক্রিয় ও সুখী ক'রে তুলবে। তোমার চলনই হ'য়ে উঠবে আর্থিক ও মানসিক সম্পদের জনয়িতা। অভাব-অভিযোগ কিছু-কিছু থাকলেও সেই চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে থাকবার অবকাশ থাকবে না। আবার, আদর্শের জন্য, কৃষ্টির জন্য কষ্টও যদি সইতে হয় তোমাকে, সেই কষ্টও তোমার কাছে কত সুখকর মনে হবে। যা' কও মণি! ভালবাসাই একমাত্র মাল, যা' মানুষকে খাওয়ায়, পরায়, উৎসাহ-উদ্দীপনায় পাগল ক'রে রাখে।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সেই দীপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রফুল্লদার দিকে চেয়ে রইলেন। প্রফুল্লদারও চোখ ছলছল করতে লাগল। তিনি আর একবার প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

ইতিমধ্যেও আরও অনেকে এসে উপবেশন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তরকারিওয়ালা মজিরদ্দিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—মা'টে আলু খাওয়াবার পারিস্, ও মজিরদ্দি!

মজিরদ্দি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে এগিয়ে এসে বলল—আপনার ইচ্ছে হইছে যখন, ঠিক মিলে যাবিনি, চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমার ইচ্ছে হলি কি হবি? তোর ইচ্ছে হলি যে হয়।

মজিরদ্দি—আপনি খাতি চাইছেন, আর আমার ইচ্ছে হবি না, কন কি? ঠিক জুটায়ে ফেলবোনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সেন কথা !·········তা' কবে দিবু ?

মজিরদ্দি—আজই খোঁজ করবো নে।

একটা ছাগল বকুল-গাছের পাতা খেতে চেষ্টা করছে, কিন্তু গাছে পা দিয়ে গলা উঁচু ক'রেও পাতার নাগাল পাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন—ওরে দুটো পাতা পেড়ে দে তো লক্ষ্মী। দ্যাখ্ তো পাতা খাবে ক'রে কি করছে!

ভগীরথদা তাড়াতাড়ি কিছু বকুলপাতা পেড়ে দিলেন। ছাগলটা তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে, আর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নেহাতুর দৃষ্টিতে পরম তৃপ্তিভরে তাই দেখছেন। সে-দৃষ্টি যেন মায়ের দৃষ্টি,—মা যেন নিজের নাড়ী-ছেঁড়া ধনকে সামনে ব'সে ভাল জিনিসটা খাইয়ে তৃপ্তিসিক্ত হ'য়ে উঠছেন।

পাতা-টাতা খেয়ে ছাগলটা গলা বাড়িয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বল্ তো ও এখন কী চায় ?

মঙ্গলদা—বোধহয় জল খেতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (প্যারীদার দিকে চেয়ে)—তুই বল্ তো ?

প্যারীদা—আরো পাতা খেতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (প্রবোধ বাগচীদার দিকে চেয়ে)—তুই বল্ তো ?

প্রবোধদা—ও আদর চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিখুশি হ'য়ে)—ঠিক ধরিছিস্। তাহ'লে তুই যা, ওকে একটু আদর কর্ গিয়ে। (প্রবোধদা গিয়ে ছাগলটার গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ছাগলটা আরাম পেয়ে গলাটা আরো বাড়িয়ে দিল)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখো, দ্যাখো, সোহাগ পেয়ে ওর চেহারাটা কেমন খোলতাই হয়েছে। কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। ভালবাসা হ'লো স্বর্ণ-সিন্দূরের মত। স্বর্ণ-সিন্দূর যেমন মধু-দিয়ে মেড়ে খাওয়াতে-না-খাওয়াতে গায় বল হতে শুরু করে, আন্তরিক ভালবাসার ছোঁয়াও তেমনি যেখানে লাগে, সেখানেই তখনই সত্তাটা নাড়া দিয়ে ওঠে। কত অসৎ-বজ্জাত আছে, যারা স্বভাবের দোষে ভালবাসা পেয়েও কৃতঘ্ন হয়, ক্ষতি করে। কিন্তু ভালবাসা তাদেরও ভাল লাগে। কেউ তাদের প্রতি কৃতঘ্ন হোক—এ কিন্তু তারা চায় না।

প্রবোধদাকে পরে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কী ক'রে বুঝলি ?

প্রবোধদা—আমার এমনিই মনে হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে পশুপক্ষীদের ভাষা শিক্ষার রীতি ছিল আমাদের

দেশে। সে-সব এখন উঠে গেছে। ও খুব ভাল জিনিস ছিল।·········আমরা আজকাল মানুষকেই ভাল ক'রে দেখি না, আর পশুপাখী তো দূরের কথা। বড়খোকার এ-সব ব্যাপারে খুব interest (অন্তরাস) ও observation (পর্য্যবেক্ষণ) আছে। কুকুর, গরু, বিড়াল, পাখী, সাপ, ব্যাং, বাঘ সব জন্তুরই আচার-আচরণ কায়দা-করণ সম্বন্ধে ও অনেক কথা জানে। আর সে ফাঁকা কথা নয়। বাস্তবের সঙ্গে তার খুব মিল আছে। আবার, কোন্ মানুষটার চলা-চলতি, রকম ও প্রকৃতি কেমন, সে-সম্বন্ধেও ওর খুব সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা আছে। Observation (পর্য্যবেক্ষণ) যদি না থাকে, তাহ'লে আমাদের common sense (সহজ জ্ঞান) বাড়ে না। বই প'ড়ে যে জ্ঞান হয়, সে অতি সামান্য। মানুষের চোখ, মুখ, নাক, কান, যদি খোলা থাকে, চোখের সামনে প্রত্যক্ষ অনন্ত বৈচিত্র্যময় যে দুনিয়া তা' যদি সে ভাল ক'রে পড়ে—নিজের ইন্দ্রিয় ও মননকে সজাগ রেখে,—তাহ'লে সে যে শিক্ষা লাভ করে তার তুলনা হয় না। আবার, সঙ্গে-সঙ্গে হাতে-কলমে কর্ম্ম ও সেবাময় সম্পর্ক যত বেশীর সঙ্গে পাতাতে পার, ততই তোমার বোধ প্রখর হবে। ধর, তুমি বাড়ীতে একটা গরু পুষছ, তাকে খাওয়াচ্ছ, যত্ন করছ, তার মধ্য-দিয়ে তোমার প্রভূত বাস্তব জ্ঞান গজিয়ে উঠবে। কোন্ ঘাস গরুর পক্ষে ভাল, কোন্ ঘাস খেলে গরু দুধ বেশী দেয়, গরুর শরীর খারাপ করে কখন, শরীর খারাপ করলে সারে কি ক'রে, কখন তার জলের প্রয়োজন, শীততাপ সে কতটুকু সহ্য করতে পারে, গাই দোয়াবার সময় কী করলে সে দুধ ছাড়ে, কখনই বা দুধ চুরি করে, গরুর মেজাজ কখন কেমন থাকে, মেজাজ গরম হ'লে তাকে তখন ঠাণ্ডা করতে হয় কি-ভাবে, ইত্যাদি কত বিষয়েই তোমার জ্ঞান গজিয়ে ওঠে বাস্তব পরিচর্য্যার মধ্য-দিয়ে। সব ব্যাপারেই এমনি। শিক্ষা যত বাস্তব—ব্যবহার, পরিচর্য্যা ও কর্ম্ম ঘেঁসে হবে, ততই ভাল। শিক্ষার পটভূমি artificial (কৃত্রিম) হওয়া ভাল নয়। বিদ্যালয়টা হবে একটা বাস্তব সমাজের মত। সংসারে চলতে গেলে মানুষকে যতরকম কাজ-কাম, দায়-দায়িত্ব নিয়ে চলতে হয়, সেই সব কাজ-কাম ও দায়-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করবার উপযোগী শিক্ষালাভের অবকাশ রাখতে হয় বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়, গৃহ, সামাজিক পরিবেশ—সবটা জুড়ে হবে যেন শিক্ষাক্ষেত্র। ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ—সবার মধ্যে থাকবে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ। এরা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হ'য়ে ছাত্রের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার ভিত্তিভূমি রচনা করবে। আর, সবটা নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই জীবনবৃদ্ধিদায়ক আদর্শ-অনুপূরণী উদ্দেশ্য নিয়ে। শিক্ষার এই গন্তব্য যদি ঠিক না থাকে, তাহ'লে

ছাত্রেরা নানা শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সঙ্গতির সূত্র খুঁজে পাবে না, এবং অনেক জেনে-শুনেও তাদের ব্যক্তিত্ব দানা বেঁধে উঠবে না। কি বলিস্ রাজেন ?—এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসলেন।

রাজেনদা (মজুমদার)—সে তো ঠিকই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তারপর সহজভাবে রত্নেশ্বরদাকে বললেন—রত্নেশ্বরদা! আজকাল গানটান করেন না ?

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) একটু বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত হ'য়েছিলেন, ম্লান-মুখে উত্তর দিলেন—কখনও-কখনও করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাগান একটা।

রত্নেশ্বরদা হারমনিয়ম খোঁজ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খালি গলায়ই লাগান শালা।

রত্নেশ্বরদা গাইছেন—

"মেঘের ডাকে ডাক দিয়েছে আমারে
এই তো আমি দিলেম সাঁতার পথের পাথারে।
আকাশের হাতছানি আর বাদল-বাঁশরী
উঠছে ফুটে ডাকের মাঝে, তাই তো কি করি,
এই তো আমি দিলেম সাঁতার পথের পাথারে!
বাজের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বুকের পাঁজরে
চলতে হবে চলার নেশায় পাগল হব রে,
কাল-বোশেখীর নিকষ-কালো কাজল আঁধারে,
এই তো আমি দিলেম সাঁতার পথের পাথারে।"

গানের শব্দ শুনে আশ্রম-প্রাঙ্গণ থেকে একদল ছেলে ছুটে আসলো। তারা মাতৃমন্দিরে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে ওঠার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—দেখে উঠিস্। প'ড়ে যাস্ না যেন।

গান হচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুর দূর আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। এক দল সাদা পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশে। নীল আকাশের অন্তহীন বিস্তারের কোলে শুভ্র-সুন্দর পক্ষীদলের এই অবাধ স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁর চোখে এনে দিয়েছে সুদূরের স্বপ্ন-জড়িমা। মুখে তাঁর চেতন-সমাহিতির আনন্দদ্যুতি, দৃষ্টিতে তাঁর মধুক্ষরা অমৃত-আবেশ। ভক্তবৃন্দ অনন্যমনা হ'য়ে তাঁর দিব্যরূপ দেখছেন। দেখতে-দেখতে তাদের চেতনাও স্ফীত ও উন্নীত হ'য়ে উঠছে উদার আনন্দের উর্দ্ধলোকে। এই-ভাবে কিছুসময় কাটলো।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর অমরভাইকে বললেন—অটলের বৌদিকে ডাক তো।

অমরভাই ডেকে আনলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন—এইসান্ বড়-বড় রসগোল্লা করতে পারবি না? তোফা মাল হওয়া চাই। মানুষ এক-এক কামড় খাবে আর প্রাণ জুড়োয়ে যাবে।

সত্যমা—হ্যাঁ পারবো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তৈরী থাকবি। আমি কওয়ামাত্র আ'নে হাজির করা চাই।

সত্যমা—কবে দরকার? একটু আগে থাকতে খবর না পেলে তো মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজ লাগতে পারে, কাল লাগতে পারে, যে-কোন দিন লাগতে পারে, রোজ লাগতে পারে। মোটকথা, যখনই চাব, তখনই পাওয়া চাই। আমি একজনকে খাওয়াব।

সত্যমা—কবে, কখন দরকার নির্দ্দিষ্টভাবে জানতে না পারলে কিভাবে করব? বেশী আগে ক'রে রাখলে তো টাটকা থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—যখনই চাব, তখনই যদি টাটকা জিনিস দিতে না পারিস্, তাহ'লে কী হ'লো? মন্তরের মত ক'রে ফেলবি। তুই পারবি ব'লেই তো তোকে ক'য়ে রাখছি, নইলে তো যাকে-তাকে কইলেই হ'তো।

সত্যমা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—ক্ষিতীশবাবু এসে কন্‌ফারেন্সের কয়দিন যদি থাকেন, আপনি বিছানা-পত্র, লেপ-কাঁথা সব ঠিক রাখবেন। আপনার কাছে-কাছে রাখবেন, আর গপ্পসপ্প করবেন। আপনার উপর খুব শ্রদ্ধা, বলেন—এতবড় পণ্ডিত লোক আমি জীবনে দেখিনি। ভদ্রলোকের common sense (সহজ জ্ঞান)-ও বেশ।

কেষ্টদা—হ্যাঁ, আর কথারও বাঁধুনি খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আছে। ইচ্ছা করলে কাজ করার ক্ষমতা আছে।

এবার কন্‌ফারেন্স-উপলক্ষে 'কারাগার' নাটক অভিনীত হবে। সেই প্রসঙ্গে কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—পৌরাণিক বিষয় নিয়ে যে-সব নাটক দেখা যায়, তার মধ্যে বেশীর ভাগ বইতেই শত্রুভাবে সাধনাটাই বড় ক'রে দেখান আছে। ভগবানকে শত্রুভাবে উপাসনাটা কিরকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর (একটু উত্তেজিত কণ্ঠে)—শত্রুভাবে আবার সাধনা হয় নাকি? ও-সব inferiority (হীনম্মন্যতা)-র কথা। লেখকদের ভিতরে inferiority

(হীনম্মন্যতা) থাকলে, তা' কলমের ভিতর-দিয়েও বেরোয়। কল্যাণকামী সৎ ও শক্তিমান যাঁরা, তাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ দক্ষ যারা তাদের দুর্নীতিকে নিরোধ করতে নিশ্চেষ্ট থাকেন না। দুর্নীতিপরায়ণ দক্ষ ও রাবণের মত যারা, তারা যদি তখন নিজেদের সংশোধন করে, তাহ'লে হয়তো বাঁচতে পারে, কিন্তু তা' যদি না করে, তবে সৎ ও শুভ-শক্তির কাছে তারা পরাভূত হয়ই। যেমন হয়েছিল দক্ষের পতন, রাবণের পতন, কংসের পতন। এটা হ'লো বিধির বিধান। এর মধ্যে ভক্ত-ভগবানের কথা আসে কি ক'রে? ঐ ধরণের পরিবেষণ মানুষের প্রবৃত্তিকেই পুষ্ট ক'রে তোলে। আপনারা নতুন ক'রে বই লিখে ঐ সব ভুল ভাঙ্গিয়ে দেবেন। অসৎ যে তাকে অসৎ ব'লে দেখানই যুক্তিযুক্ত। ওর উপর রঙ চড়িয়ে অবান্তর তাত্ত্বিকতার অবতারণা করার মানে হয় না। মানুষ ওতে বিভ্রান্ত হয়, ভাবের ঘুঘু ব'নে যায়, অপকর্ম্ম ক'রে আবার মুখে কয়—এও তাঁর ইচ্ছা। মঙ্গল-স্বরূপ যিনি, স্বেচ্ছায় অমঙ্গলের পথে চ'লে তাঁর দিকে এগুনো যায় না। তবে পরমপিতার রাজ্যে একটা সুবিধা আছে। যে যত অপকর্ম্মই করুক, সত্তার অবলুপ্তি কেউ চায় না। তাই, অপকর্ম্ম যখন নিধন ডেকে আনতে চায়, তখন সত্তা তার আত্মরক্ষার তাগিদে অপকর্ম্ম থেকে নিবৃত্ত হবার প্রেরণা জোগায় মানুষকে। তখনও যদি মানুষ ফেরে, তাহ'লেও পথ থাকে।

প্যারীদা (নন্দী)—লোকে বলে, শত্রুভাবে ডাকলে শত্রুর ধ্যান সর্ব্বদা হ'তে থাকে, তাই সহজে পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অপকর্ম্ম যে করে, পুলিশের ধ্যান তো তার লেগেই থাকে। সে-অবস্থায় সে পুলিশের কাছে এগুতে চায়, না পুলিশের কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে চায়?

নগেনদা অজামিলের গল্প ব'লে জিজ্ঞাসা করলেন—অজামিল কত পাপ করেছিল, কিন্তু তার ছেলের নাম ছিল নারায়ণ। মরবার আগে তাকে ডাকার দরুন যমদূত যখন এসে তাকে নিয়ে যেতে চাইলো, বিষ্ণুদূত এসে বাধা দিল, সে মুক্ত হ'য়ে গেল। এত পাপ সত্ত্বেও মুক্ত হ'লো কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যমদূত মানে আমি বুঝি self-centric (স্বার্থপর) ভাব, প্রবৃত্তিমূঢ়তা, যা' কিনা মানুষকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে, আর বিষ্ণুদূত মানে ব্যাপ্তি বা বিস্তারের ভাব। আর, মুক্তি মানে passion-prominent move (প্রবৃত্তি-প্রধান চলন)-এর পরিবর্ত্তে Ideal prominent move with all one's passions (সব প্রবৃত্তিসহ ইষ্টপ্রধান চলন)। অজামিল যখন নারায়ণ-নারায়ণ ক'রে ডাকতো, তখন হয়তো 'নারায়ণ' কথাটার বোধ তার মধ্যে

খানিকটা জেগে উঠতো। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে যখন 'নারায়ণ' কথা উচ্চারণ করেছিল, তখন হয়তো সে সত্যই নারায়ণের ভাবে ভাবিত হ'য়ে উঠেছিল। আর, সেইভাবে ভাবিত হ'য়ে যদি তার জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে যে পরবর্ত্তী অবস্থায় সে নারায়ণ-মুখী গতি প্রাপ্ত হবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি? বৈষ্ণব-শাস্ত্রে আছে—'একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে, জীবের নাহিক সাধ্য তত পাপ করে।' আবার এও আছে—'কোটি জন্ম করে যদি নাম-সঙ্কীর্ত্তন, তথাপি না পায় কেহ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।' আমরা ডাকার মত ডাকতে পারি কই? (সুর ক'রে)—'ডাক দেখি মন কালী ব'লে, কেমন শ্যামা থাকতে পারে?' ভালবাসার আকুল ডাকে তিনি নিমেষেই হৃদয়ে এসে ধরা দেন। একটা কথা আমাদের দেশে খুব চলতি আছে—জপ-তপ যতই কর, মরণে হুঁশিয়ার। মৃত্যুকালে যদি ইষ্টচিন্তা ও ইষ্টনাম প্রবল না হয়, তবে হাজার জপ-তপ করলেও পরবর্ত্তী জীবন উন্নততর নাও হ'তে পারে। তবে অভ্যাস ও অনুশীলন করা খুবই ভাল। নাম করতে-করতে নামীর প্রতি অহৈতুক অনুরাগ যদি একবার জন্মায় তাহ'লে আর ভাবনা নেই। তখন আমাদের সত্তাটাই নামময় হ'য়ে ওঠে, নামীময় হ'য়ে ওঠে। আমরা ভালবাসা ও অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে যা' হ'য়ে উঠি, সেই আমাদের পরম সম্পদ্, তারই ক্রমাগতি চলে জন্ম-জন্মান্তর। এই হওয়াটাই পাওয়া। আর, দেহ-ধারণ যদি নাও করি, তবে বিদেহ অবস্থায়ও ঐ নামময়তা ও নামীময়তা পেয়ে থাকে আমাদের। যেখানেই থাকি, তাঁকে নিয়েই থাকি। সত্তাটাই ঐ হ'য়ে যায় কিনা। কর্ম্মময় ভালবাসায় এই হওয়াটা বেমালুম হ'য়ে ওঠে। যা' নিয়ে আমরা বাস্তবভাবে যত লিপ্ত থাকি, তা' আমাদের তত আপন হ'য়ে ওঠে, সত্তাগত হ'য়ে ওঠে। তাই, কিছুর জন্য ইষ্টকে ভালবাসতে নেই, ইষ্টের জন্য ইষ্টকে ভালবাসব যখন, তখনই রস পাব জীবনে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ আমাদের করতলগত হ'য়ে যাবে।

নগেনদা—ভাল কিছুর জন্য তাঁকে যদি ভালবাসি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টেতর অন্য-কিছু নিয়ে যদি লিপ্ত হন আপনি, আপনি যা'তে লিপ্ত হন, বড় জোর তাই আপনি পেতে পারেন। যা'তে আপনি লিপ্ত নন, যা' আপনার কাছে মুখ্য নয়, গৌণ, তার থেকে আপনার সত্তাও ততখানি দূরে থাকবে। যে শুধু তামাক খাবার লোভে ঘুরে-ঘুরে আপনার বাড়ীতে যায়, সে বড় জোর আপনার তামাক পেতে পারে, কিন্তু আপনাকে পাবে কি ক'রে? আপনি যদি নিজেকে ঢেলেও দেন তার কাছে, তাহ'লেও তো আপনাকে পাবার জো নেই তার। কারণ, তার তো কোন লোভ নেই আপনার উপর, তাই আপনি

নিজেকে দিতে চাইলেও সে আপনাকে পায়ও না, উপভোগও করতে পারে না। আবার, আপনি বিরক্ত হ'য়ে একদিন তামাক দেওয়াও বন্ধ করতে পারেন অমনতর ক্ষেত্রে। তাই, লোভ করতে হ'লে তাঁর উপর লোভ করাই ভাল। বেকায়দা আবোল-তাবোল চাইতে যাব কেন ?

নগেনদা—আমাদের প্রবৃত্তিগুলিই তো আমাদের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জিনিসে আবদ্ধ ক'রে রাখে, এর উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের প্রবৃত্তিগুলি, রিপুগুলি যখন ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয়, তখন আর রিপু থাকে না, রিপুই বন্ধু হয়। রিপুগুলিকে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্ন ক'রে তোলাই জীবন্মুক্ত হওয়া।

নগেনদা—মানুষ হঠাৎ জীবন্মুক্ত হ'তে পারে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্ফূর্ত্তি-সহকারে হাত নেড়ে)—বোঝামাত্র ঝম ক'রে চলনার মোড় ফিরিয়ে দিলেই পারে। আস্তে-আস্তে একটু-একটু ক'রে হয় না, এক ঝাঁকিতেই হয়। হেমকবি কেমনভাবে পট ক'রে মদ ছেড়ে দিল। মানুষ আগে যাই করুক, পথ পেয়ে এক মুহূর্ত্তেই যদি স্থির ক'রে ফেলে—'ঢের হয়েছে, আর নয়, এখন থেকে আমি নূতনভাবে জীবন সুরু করব', তখন তার conviction (প্রত্যয়), urge (আকূতি), gaits (চলন), attitude (ভঙ্গী), morale (মানসিক অবস্থা) বদলে যায়। James-ও (জেম্স্ও) habit (অভ্যাস)-এর chapter (অধ্যায়)-এ এই ধরণের কথা বলেছেন।

এমন সময় প্রফুল্লদার (বাগ্চী) মাকে দেখে বললেন—আমি তোকে মনে-মনে খুঁজতিছিলাম। তুই এসে পড়িছিস্, ভালই হইছে। (পূর্ব্ববর্ণিত পুত্রহারা শোকাতুরা মায়ের কথা উল্লেখ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন)—তুই নিজে তার খোঁজ-খবর নিস্। সময়মত তার নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করিস্। সে কিছুতেই খাবে না, তাই আমি বড় বৌয়ের প্রসাদ খাবার কথা বলিছি। তুই বড় বৌকে ব'লে রাখিস্। আমি আবার যদি ভুলে যাই। তুই মানুষের ব্যথা বুঝিস্, মাথায় বুদ্ধি আছে। তোর উপর ওর দেখাশোনার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। বিছানা যদি না নিয়ে এসে থাকে, তোর কাছে এনে শোয়াস্।

উক্ত মা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, শান্তি দিয়ে দেওয়া চাই।

উক্ত মা—সে আপনার দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার উঠে একবার বেড়িয়ে আসলেন। একবার ডিস্পেনসারীর দিকে আসলেন, ডিস্পেনসারীর বারান্দায় উঠে বললেন—ঐ কোণায় অতো ঝুল

জমেছে, তোদের চোখে পড়ে না ? মনে করিস্ না শুধু ওষুধ খাইয়েই মানুষের রোগ সারাতে পারবি, যদি তাদের সদাচারী ক'রে না তুলিস্। সদাচারের মধ্যে আছে পরিচ্ছন্নতা। এসব দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তোরা নিজেরা যদি না করিস্, অন্যকে করাবি কি ক'রে ? ডাক্তারখানা হবে স্বাস্থ্য ও সদাচার সম্বন্ধীয় নীতিশিক্ষার একটা ঘাঁটি-বিশেষ। এখানে কতকগুলি ভাল-ভাল মটো টানিয়ে রাখতে হয়, যা' দৈনন্দিন জীবনে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য পালনীয়। আর, এখানটা হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম।

ভগীরথদা লজ্জিত হ'য়ে বললেন—ওদিকে আমার নজর পড়েনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে থাক, তার চারিদিকে কোথায় কী আছে, কোথায় কী হ'চ্ছে—তা' যদি নজরে না থাকে, নজরে না পড়ে, তবে দিন-দিন dull (বোকা) হ'য়ে যাবে। ওতে মনে মরচে প'ড়ে যাবে। তোমার ভাল অভ্যাস অনেকগুলি আছে, তাই নিয়েই যদি খুশি থাক, মাথা যদি না খাটাও, আরো সদভ্যাস যদি অর্জ্জন না কর, দিনের পর দিন গতানুগতিকভাবে যদি চল, তবে জীবনটা স্থূল ও স্থবির হ'য়ে উঠবে, অগ্রগতি আর হবে না, প্রাণের উৎসাহ-উল্লাসও ক'মে যাবে।

ভগীরথদা—ঝুলটা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে ফেলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফেলব কি ? এখনই কাউকে দিয়ে ক'রে ফেলা। ও হেমগোবিন্দ !

হেমগোবিন্দদা কলে জল তুলছিলেন। তাঁকে ডাকা হ'লো। তিনি ছুটে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই ঝুলটা এখনই ঝেড়ে ফেল্ তো !

হেমগোবিন্দদা একটা লাঠির মাথায় ঝাঁটা বেঁধে ঝুলটা ঝাড়তে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিস্, চোখ সাবধান। আর নাকে যেন বেশি ধূলো না যায়।

ওখান থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ীর দিকে গেলেন। জ্ঞান চৌধুরীমহাশয়কে ডেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই তাঁর বাড়ীর সবাই কে কেমন আছেন খোঁজ-খবর নিলেন। একজনের অসুখ শুনে প্যারীদাকে দেখাতে বললেন। বললেন—তুমি খবর দিও, আমার মনে থাকলে আমিও কবোনে।

ওখান থেকে বাগানের পাশ দিয়ে বড়দার বাড়ীর সামনে আসলেন।

বড়দার বাড়ীর সামনে অশোককে দেখে বললেন—দাদু ! শীতকালে এত সকালে খালি গায় বের হওয়া কিন্তু ভাল না। ঠাণ্ডা লাগতি পারে। যাও ! মার কাছে যেয়ে গেঞ্জীটা প'রে নাও গিয়ে। গেঞ্জী প'রে খেলা কর। আর, রাস্তার মধ্যে খেলার থেকে একপাশে খেলা করা ভাল, ওতে তোমাদেরও সুবিধা

হবে, যারা রাস্তা দিয়ে যাবে তাদেরও অসুবিধা হবে না। আবার, রাস্তার 'পর খেললে কেউ হঠাৎ সাইকেল ক'রে যাবার সময় চাপা পড়ার ভয় থাকে।

অশোক খুশি হ'য়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদা, বীরেনদা প্রভৃতির দিকে চেয়ে মধুর হাস্যে বললেন—ওদের মধ্যে যেন আমি আমাকে খুঁজে পাই। ছাওয়াল খুব তুখোড় ছাওয়াল। যেমন মিষ্টি, তেমনি তেজী, আবার বুদ্ধিও রাখে খুব।

বঙ্কিমদা—হ্যাঁ।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—অতি সুন্দর স্বভাব। ভালবাসা যেন কেড়ে নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Third generation (তৃতীয় পুরুষ) কিনা, (শ্রীশ্রীঠাকুর থেকে সুরু ক'রে)। আচ্ছা বঙ্কিম! শুনেছি যে third generation (তৃতীয় পুরুষ) অনেকখানি inherit করে (গুণাবলীর অধিকারী হয়), কোন পুঁথিপত্রে তার নজির আছে কিনা দেখিস্ তো।

বঙ্কিমদা—ঠিক ঐ ভাবের কথা কোন বইয়ে দেখিনি। খুঁজে দেখব।

এইভাবে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর খেপুদার বাড়ীর কাছে এসে পড়লেন। ওখানে এসে খেপুদার বারান্দায় একটা হাতলওয়ালা বেঞ্চে দক্ষিণাস্য হ'য়ে বসলেন।

ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন—আকু কাল এসেছিল, চ'লে গেছে নাকি?

খেপুদা—হ্যাঁ। আজ কাছারী আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকু আস্‌লে ওকে দিয়ে একখানা কোষ্ঠী বিচার করাতাম।

খেপুদা—আমার তো কোষ্ঠীতে বড় বিশ্বাস হয় না। প্রায়ই মেলে না। তা'ছাড়া মানুষ ওতে বড় অদৃষ্টবাদী হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মা'র ঐ কথা মনে পড়ে। মা খুব বলতেন—

"যেখানে দেখিবে ছাই,
উড়াইয়া দেখো তাই,
পাইলেও পাইতে পার
অমূল্য রতন।"

কোন্‌টার মধ্যে কী আছে, না দেখে-শুনে বিদায় দেওয়া ভাল না। জ্যোতিষকে শাস্ত্র হিসাবেই দেখ, আর বিজ্ঞান হিসাবেই দেখ, (অবশ্য শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলাদা ব'লে আমি মনে করি না), এটা যখন আবহমানকাল ধ'রে চ'লে আসছে, এর মধ্যে যে কোন মাল নেই, একেবারেই যে গাঁজাখুরী, তা' আমার মন কখনও মেনে নিতে চায় না। প্রাচীনের তফিলে যা'-কিছু ছিল প্রায় সবই

গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না ব'লে আমাদের ভাল লাগে না, কিন্তু বুঝতে গেলেও তার পিছনে সাধনা চাই। আমাদের এমনতর ধারণা থাকা ভাল না যে, আমরা একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারব না ; বিহিতভাবে চেষ্টা করলে বোঝার সম্ভাবনাই বেশী। আবার, এমনতর দম্ভও ভাল নয় যে, আমার এই মস্তিষ্ক নিয়ে সহজে যা' বুঝতে পারি না, তা' কিছুই নয় বা তার মধ্যে কোন মালই নেই। বুঝতে গেলে শ্রদ্ধা চাই, চেষ্টা চাই, অনুশীলন চাই, বিনীত মনোভাব চাই। ভৃগুর কোষ্ঠীর মধ্যে আমরা যে সম্পদ্ পাই, তা'তে তো জিনিসটাকে ভুয়ো ব'লেও উড়িয়ে দিতে পারি না। আমার মনে হয়, সবগুলি factor (উপাদান) ঠিকমত consider (বিবেচনা) করতে পারলে mathematical accuracy (গাণিতিক যথার্থতা) নিয়ে সব জিনিস বের করা যায়। তবে অদৃষ্টবাদী ও নিষ্ক্রিয় হওয়ার কথা যে বলছ, সেটা আমাদের উপর নির্ভর করে। পুরুষকার তো চাই-ই। পুরুষকার না হ'লে অদৃষ্টকে খণ্ডন করব কী দিয়ে ? অদৃষ্ট যেটা সৃষ্টি ক'রে রেখেছি, সেও তো পুরুষকার ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে। পূর্ব্বের কর্ম্ম ফল প্রসব করবে আর বর্ত্তমানের কর্ম্ম কোন ফল প্রসব করবে না, এর কি কোন মানে হয় ? কর্ম্মই মানুষের ভাগ্যবিধাতা। তবে আমাদের সঞ্চিত শুভ-অশুভ কী আছে, আমাদের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি কিভাবে আমাদের চালিত করছে, বিশ্ব-প্রবাহ আমাদের ব্যক্তি-জীবনের উপর কী প্রভাব বিস্তার করছে, এগুলি যদি আমাদের জানা থাকে তবে দৈব ও পুরুষকার উভয়কে উভয়ের অনুকূল ক'রে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে পারি, এবং দৈবের মধ্যে জীবনের প্রতিকূল যা' আছে তাকেও প্রয়োজনমত প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারি।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—দৈব ও পুরুষকার উভয়কে উভয়ের সহায়ক ক'রে তোলা মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, আপনি আপনার profession (জীবিকা) choose (নির্ব্বাচন) করবেন। আপনার সামনে অনেকগুলি পথ খোলা আছে। এখন কোন্‌টা নেবেন সেইটে নিয়ে আপনার সমস্যা। সাধারণতঃ আপনার রুচি, পছন্দ ও সংস্কার যে-দিকে, সেই কাজ বেছে নেওয়াই আপনার পক্ষে ভাল। আপনার হয়তো অনেক কিছুই ভাল লাগে। ঠিক হয়তো ঠাওর পান না, কোন্‌টা আপনার বিশিষ্ট পথ, কোন্ পথে আপনি উন্নতি করতে পারবেন। তখন যদি বৈজ্ঞানিকভাবে কেউ নির্দ্ধারণ ক'রে দেয় যে ডাক্তারীই আপনার নিজস্ব লাইন, তখন তো আপনি অন্য দিকে শক্তির অপচয় না ক'রে ডাক্তারীর দিকে

যেতে পারেন, এবং একদিন হয়তো এতে বিশেষ কৃতিত্বও লাভ করতে পারেন। এখন ধরুন, ডাক্তারীতে ভাল করার সম্ভাব্যতাটা আপনার দৈব, দৈব মানে তা' আপনার চরিত্রে দেদীপ্যমান। এই দেদীপ্যমান সম্ভাব্যতার ভিতের উপর আপনি আপনার পুরুষকারের খুঁটি যদি গাড়েন, অর্থাৎ ঐ পথে আপনার প্রচেষ্টাকে পরিচালিত যদি করেন, তাহ'লে আপনার কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনাই বেশী। একেই বলে দৈব ও পুরুষকারকে পরস্পরের সহায়ক ক'রে তোলা। আজ বিলেতে psychological test (মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা) নানারকম ক'রে মানুষের বুদ্ধি, কর্ম্মক্ষমতা, বিশিষ্ট রুচি ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা ও পরিমাপ করে। আমরা যদি astrologically (জ্যোতিষসম্মত পথে) সেটা নিখুঁতভাবে নির্দ্ধারণ করতে পারি, তাহ'লেই বা তা' মেনে নেওয়ায় আপত্তি কী? এটা শুধু এক দিক দিয়ে বললাম। তা'ছাড়া আরো অনেক দিক আছে। বিশ্ব-জীবনের প্রবাহের সঙ্গে আমাদের একটা গভীর যোগ আছে। সুদূর গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা, নক্ষত্র, কাছের ও দূরের বিরাট পরিবেশ, জলবায়ু, আবহাওয়া, বিশ্বের যত-কিছু ঘটনা-প্রবাহ, আমার অতীত, সবার অতীত—সবই কিন্তু জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে আমার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। আমার উপর কী কী প্রভাব ক্রিয়া করছে, তার কোন্‌টাই বা ভাল, কোন্‌টাই বা মন্দ, তা' জেনে তার প্রতিবিধান ও বিন্যাস যদি না করি, তবে তো অন্ধকারে পথ হাতড়ানর মত হবে। আমি যে অনন্ত বাঁধনে জড়িয়ে আছি জগতের সঙ্গে, প্রতিকূল শক্তিরও অভাব নেই, এর ভিতর-দিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে চলা চারটিখানি কথা নয়। জ্যোতিষ-শাস্ত্র যদি analytically (বিশ্লেষণাত্মক) ও synthetically (সংশ্লেষণাত্মকভাবে) চর্চ্চা ও প্রয়োগ করা যায়, তবে এ-সব সম্বন্ধে অনেক হদিশ মিলতে পারে। জ্যোতিষের সবকিছুর একটা সুসঙ্গত, rational (যুক্তিযুক্ত) ও common-sense (সহজবুদ্ধি-সম্মত) inter pretation (ব্যাখ্যা) বের করা দরকার। এ-সম্বন্ধে অনেক কিছু করবার আছে। শুধু গতানুগতিক মামুলিভাবে এর চর্চ্চা করলে হবে না। আমার মনে হয়, গ্রহ-সংস্থানের সঙ্গে আমাদের জীবনে আমাদের প্রবৃত্তি-সংস্থানের একটা সম্পর্ক আছে। তবে প্রবৃত্তি একাধারে আমাদের বন্ধু, একাধারে আমাদের শত্রু। প্রবৃত্তি যখন ইষ্টের সেবায় লাগাই, তখন সেগুলি হয় বন্ধু, আবার সেগুলি যখন নিজেদের খেয়াল-খুশির সেবায় লাগাই, তখনই হয় শত্রু। আমাদের প্রবৃত্তি যদি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা না করে বা বাইরের শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তাহ'লে কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা আমাদের কমই থাকে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের প্রবৃত্তি-চলনাই ক্ষয়, ক্ষতি ও বিপদ-আপদকে আমন্ত্রণ ক'রে আনে। ইষ্টীচলন আবার তেমনি বহু ক্ষয়, ক্ষতি ও বিপদ-আপদের সম্ভাব্যতাকে নাকচ ক'রে দিয়ে জীবনের পথ কণ্টকমুক্ত ক'রে তোলে। তাই বলে—'কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ'।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার একবার তামাক খেলেন। একটি দাদা এসে তার অভাবের কথা জানালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—দ্যাখ্, অভাব হ'লেই যে আমার কাছে এসে হাত পাতিস্, ও কিন্তু ভাল না। তা'ছাড়া, মিতব্যয়িতা জিনিসটা শিখতে হয়। তোর যা' সংসার, তাতে তুই যা' পাস্, তা'তে তো তোর কষ্ট হবার কথা নয়। অথচ নিত্যই তুই অভাবে পড়িস্। তার মানে, তোর চলনায় গোল আছে। আর, অভাব যদি হয়ই, পরিবেশের জন্য এতখানি করা লাগে, যাতে পরিবেশ থেকে আহরণ ক'রে নিতে পারিস্। অবশ্য, পাবার বুদ্ধি থেকে করা ভাল না। স্বভাবটাকেই সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন ক'রে তুলতে হয়। তাহ'লে আর কষ্ট থাকে না। আমি তো টাকার পরোয়া করি না। আর টাকার মানুষও আমি না। আমি মানুষের, মানুষ আমার। তাই আমার যারা, তাদের যা' আছে তা' আমারই নিজস্ব সম্পদ্ ব'লে আমি মনে করি। আমি ভাবি, কেমন ক'রে তাদের দক্ষ ক'রে তুলতে পারি, উচ্ছল ক'রে তুলতে পারি। নইলে আমিই যে নিঃস্ব হ'য়ে রইলাম। তোরা কেউ যদি হীন-সামর্থ্য হ'য়ে থাকিস্, তাহ'লে আমার কাছে সেটা বড় insulting (অপমানজনক) লাগে, আমার আপসোস হয়, দুঃখ হয়। অনেক সময় নিজের গায়ের মাংস নিজে কামড়ে তুলে ফেলতে ইচ্ছা করে। (শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে-মুখে একটা তীব্র বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো)। মাঝে-মাঝে মনে হয়, তোদের চাবকে ঠিক করি। পথ পেলি, বুঝলি, শুনলি অথচ চললি না, করলি না, এ দুঃখ আমি রাখব কোথায়? এক-একজন শুধু কথার সাগর হ'য়ে থাকলি। চরিত্র গঠন করলি না। ও-কথা তোদের পোছে কে রে? তাই কই, আর শয়তানী করিস্ না, মানুষ হ! দেখে আমার প্রাণ জুড়োক। দ্যাখ্, জন্মে অবধি আমি আর কিছু চাইনি—আমি কেবল চেয়েছি, প্রত্যেককেই যেন বড় ক'রে তুলতে পারি, প্রত্যেককেই যেন সার্থকজন্মা ক'রে তুলতে পারি। তোরা এক-একজন অন্তরে-বাইরে রাজরাজেশ্বরের মত সুখী হ, তা'তেই আমার সুখ। তোরা নিজেরাও সুখী হলি না, আমাকেও সুখ পেতে দিলি না। আমার ভাগ্যিই খারাপ।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর ছল-ছল করুণ নেত্রে চেয়ে রইলেন দাদাটির দিকে।

দাদাটি বললেন—আমি যা' পারি, তা' তো সাধ্যমত করি। আর কী করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর গুরু-গম্ভীর স্বরে, ধীরে উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা ।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ।।

স্বার্থবুদ্ধি ছেড়ে দাও, প্রত্যাশাপরায়ণতা ছেড়ে দাও, ইষ্টৈকশরণ হও, নইলে বিগতজ্বর হ'তে পারবে না। আর, ঐ জ্বরের ঘোরে যাই কর না, তা' সফল হবে না। মূলে হাত দাও। তাঁকে ভালবাস, আর যা' করবে তাঁর জন্যই কর। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির নোঙর ফেলে যতই দাঁড় টান না, এগুতে পারবে না। তা'তে কারও অন্তরকে স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি যদি বাস্তবে সক্রিয়ভাবে ইষ্ট-সর্ব্বস্ব হও, তাহ'লেই মানুষকে তেমন ক'রে তুলতে পারবে। নিজেকে ও অন্যকে অমন ক'রে তোলাটাই, সবাই মিলে অমন হ'য়ে ওঠাটাই হ'লো কাজ। তা'ছাড়া আর সব ফক্কাবাজী। ফক্কাবাজী, ফাঁকিবাজীতে তোমারও কিছু হবে না, কারো কিছু হবে না। তোমার ফাঁকি ধরা প'ড়ে যাবে মানুষের কাছে। যে পেল না তোমার কাছ থেকে কিছু, যাকে দিতে পারলে না কিছু তোমার চরিত্র দিয়ে, সে তোমার সম্পদ্ হবে কি ক'রে ? মনে রেখো—যাজন মানে, তোতাপাখীর মত কথা কওয়া নয়। যাজন মানে, তোমার সুকেন্দ্রিক, সুগঠিত চরিত্রটাকে মানুষের সামনে তুলে ধ'রে সুযুক্ত, সক্রিয় সেবা-সম্পোষণায় ও নিয়ন্ত্রণে তাকে সুকেন্দ্রিক ও সুগঠিত ক'রে তোলা। নিজে হবে না, কথার কারসাজিতে বাজীমাৎ করবে, প্রকৃতির রাজ্যে তেমন অঘটন ঘটে না। তুমি যেমনতর প্রকৃত হবে, প্রকৃতিও পুরস্কৃত করবে তোমাকে তেমনতর।

কথা হ'চ্ছে, বহুলোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছেন। কথাগুলির তীব্র অনুরণন সবার অন্তরে শাণিত ফলকের মত বিঁধছে। মনে হ'চ্ছে, দেওয়ালগুলিও যেন সেই মর্ম্মভেদী বাণী-মন্ত্রের প্রতিধ্বনিতে ঝন্ঝন্ ক'রে উঠছে। চতুর্দ্দিকে একটা থমথমে আবহাওয়া। সবাই নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ।

একটু আগেই শৈলমা এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার শৈলমার দিকে চেয়ে আদরের সুরে সোহাগ ক'রে টেনে-টেনে বার-বার বলতে লাগলেন—ঘুটুন, ঘুটুন, ঘুটুন, ঘুটুন, ঘুটুন, ঘুটুন।

শৈলমা হেসে কুটিপাটি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকালে কিছু খাইছিস্ ?

শৈলমা—খাবার সময় পেলাম কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সে তো ঠিক কথা! কাজের লোক আবার খায়

নাকি ? তার খাবার সময় কোথায় ?……যাক, এখন কি কিছু খাবার সময় হবে ? অবশ্যি যদি কাজের ক্ষতি না হয়।

শৈলমা—এখন এত বেলায় আর কী খাব ? আর একটু পরেই তো চান ক'রে ভাত খাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কষ্ট হ'লে খেয়ে কাজ নেই। আমি ভাবছিলাম কয়েকখানা ভাল বিস্কুট যদি খেতিস্।

শৈলমা—এখন থাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গান্তরে মন দিলেন। কিন্তু শৈলমা উসখুস ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসী-মাকে ইঙ্গিত করলেন। সেই সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজনের দৃষ্টি পড়লো শৈলমার উপর। তাঁরা শৈলমার ভাবভঙ্গী দেখে মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলেন।

কালিদাসীমা রহস্য ক'রে বললেন—কি গো ডাক্তার! অমন ক'রে গা-মোড়া কাটছ কেন ? ঘুম পাচ্ছে নাকি ?

শৈলমা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন—আহ্লাদীর মত ঠাকুরের কাছে ব'সে থাক, টের তো পাও না ঠেলাটা কি! আমার মত এইরকম service (সেবা) দিতে হ'তো মানুষকে, তাহ'লে ঠিক পেতে। রুগী, গু, মুত, আতুড়—ঠেলতে হয় কি কম ? তারপর সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, অনেক সময় সকালে 'চা'-টুকু পর্য্যন্ত জোটে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ও, তুই 'চা' বিস্কুট দুই-ই খাবি, শুধু বিস্কুট খাবি না, তা' সে-কথা সোজা ক'রে বললেই তো হ'তো। সোজা কথা অতো ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলছিস্ কেন ?

শৈলমা খানিকটা কান্নার সুরে—আপনি তো সব সময় আমাকে ঐ রকম ভাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতো ভাবা-ভাবির কি আছে এতে ? ক্ষিদে পেয়েছে, খাবি। এর মধ্যে অসম্মানের ব্যাপার কী হ'লো ? আমার তো ক্ষিদে পেলে তখনই চেয়ে খাই। 'পেটে ক্ষিদে, মুখে লাজ'—এতে লাভ কি ? দ্যাখ্,—সহজ হ'তে না পারলে কিন্তু সুখ নেই। যত চাল দিয়ে চলতে যাবি, ততই চলন বেচাল হ'য়ে যাবে, এমন-কি বানচালও হ'য়ে যেতে পারে। খুব সাবধান।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইতিমধ্যে সতীশদাকে দিয়ে চা ও বিস্কুট আনতে পাঠিয়ে দিলেন।

সতীশদা (দাস) একটু পরেই চা ও বিস্কুট নিয়ে আসলেন, নিয়ে আসামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর পরম উল্লাসভরে বললেন—লাগাও!

শৈলমা চায়ের বড় গ্লাসটা মাথায় ঠেকিয়ে এক ঢোক খেলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে মুচমুচ ক'রে বিস্কুট খেতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহাতৃপ্তিভরে শৈলমার চা ও বিস্কুট খাওয়া দেখছেন। চোখে তাঁর স্নেহ-বিলোল দৃষ্টি। এমন সময় কয়েকটা বিভিন্নজাতীয় পাখী বাবলা-গাছের ডালে ব'সে রীতিমত মারামারি সুরু ক'রে দিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চানন (বিশ্বাস)-দাকে বললেন—ওদের সরিয়ে দে তো। এখন একত্র থাকলেই ঝগড়া করবে। এখন ঝগড়ার বাতিক চেপেছে। এই ভাবটা কেটে গেলে পরে আবার বন্ধুভাবে থাকতে পারবে। আমি আবার এইসব পাখীগুলির মধ্যে দেখেছি খুব ভাব। কিন্তু ওদের দেখে মনে হয়, মানুষের যেমন মাঝে-মাঝে মেজাজ খারাপ ও খিটখিটে হয়, ওদেরও তেমনি হয়। ঐ ঝোঁকটাকে প্রশ্রয় দিতে নেই, বার-বার অভিব্যক্তি দিতে-দিতে, ওইটে পেয়ে বসে। সেইজন্য খারাপ যা'-কিছু থেকে নিজেকে প্রত্যাহৃত করাই শ্রেয়। তোমাদের মুখে যদি কুবাক্য আসে, আমি বলি, তখন বরং চুপ ক'রে যেও, বা মানুষের সংসর্গ থেকে দূরে স'রে যেও। কিন্তু কু-বাক্য বলতে যেও না। কয়েকবার যদি বল, তখন সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন তার উপর তোমার দখল থাকবে না। অবশ্য, মুখে যখন কু-বাক্য আসছে, তখন-তখনই যদি মন ও জিহ্বার মোড় ফিরিয়ে শুভ-সম্বেগে হিতকর প্রিয়-বাক্য বলতে পার তাহ'লে তো কথাই নেই। সাধারণভাবে এই কথাটা খেয়াল রাখবে যে, ভাল যা'-কিছু তার অনুষ্ঠান, আচরণ ও অভিব্যক্তি যত বেশী ও যত ত্বরিত পার, করবে, আর খারাপ যা'-কিছু তার অনুষ্ঠান, আচরণ ও অভিব্যক্তি না ক'রে পারলে আর করবে না। ওতে দেখবে তোমার শরীরবিধান, স্নায়ু, শিরা, উপশিরা, প্রত্যেকটি মস্তিষ্ক-কোষ সৎ-চলনে অভ্যস্ত ও মন্দ থেকে বিরত হ'য়ে তোমার সাধনার পথকে কত সহজ ক'রে তুলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইতিমধ্যে ভবানীদাকে ডেকে অভাবগ্রস্ত দাদাটিকে কিছু টাকা দিতে ব'লে দিলেন। তখন আবার বললেন—আমার কথায় ব্যথা-ট্যথা পাস্‌নি তো? তোর যা' দরকার ভবানীর কাছ থেকে নিয়ে যাস্‌। তোদের যা'তে ভাল হবে তাই কিন্তু কই। তোরা কষ্ট পাস্‌ তা' কিন্তু আমার ইচ্ছে নয়।

আবেগে দাদাটির যেন বাক্‌রোধ হ'য়ে আসলো, কী বলতে গিয়ে বলতে পারলেন না, গলাটা ধ'রে আসলো, মুখটা নীচু ক'রে চাদর দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।

* * * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর খাবার পর মাতৃমন্দিরের ঘরে এসে চৌকিতে বসলেন, একটা

দরজা দিয়ে ঢুকতে যেয়ে পরক্ষণেই আবার সে-দরজা ত্যাগ ক'রে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকলেন, যে-দরজা দিয়ে কিনা রোজ ঢোকেন। মায়েদের মধ্যে অনেকে আসলেন। যশোহরের একটি মা তীর্থ-পর্য্যটনান্তে বাড়ী ফেরার পথে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন করতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঔৎসুক্য সহকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্-কোন্ জায়গায় গিয়েছিলি? কী কী দেখলি? কেমন লাগলো?

উক্ত মা—গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, ফেরবার পথে বৈদ্যনাথও দেখে এসেছি।

—কেমন দেখলি?

—ভাল। হরিদ্বারের দৃশ্য বড় সুন্দর। আর, বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরে আরতির সময় দেখতে বড় ভাল লাগে। আর, এমনি অনেকে ভক্তিভরে স্তব-স্তোত্র পাঠ করে, বেশ লাগে। তবে প্রায় জায়গায়ই পাণ্ডাদের বড় অর্থলোভ, ভিতরে কোন ভাব নেই, পয়সা আদায় করার জন্য নানা কথা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের স্বার্থই বোঝে না। মানুষ তো দেবার আগ্রহ নিয়েই যায়, দিতেই তো চায়। নিজেদের হ্যাংলামী দেখিয়ে মানুষের দেবার প্রাণটাকেই ছোট ক'রে দেয়। তবে ওদের দেওয়া ভাল। যা'হোক ঠাকুর-দেবতার সেবা নিয়ে আছে তো। এইসব পাণ্ডা যারা, তীর্থগুরু যারা, তারা যদি সুসংস্কৃত হয়, সদাচার-পরায়ণ হয়, যাজনমুখর হয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে যত্নবান হয়, তাহ'লে তারা কিন্তু ঢের করতে পারে। এরা জেগে উঠলে প্রত্যেকটা তীর্থ লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হ'তে পারে। আমাদের প্রাচীন কৃষ্টির ভিতর, ইতিহাসের ভিতর, শাস্ত্রের ভিতর কী আছে, তা' তো আমরা ভুলতেই বসেছি। এইগুলির চর্চ্চা, আলোচনা ও প্রচার যত হয়, ততই ভাল। তীর্থক্ষেত্রগুলির ভিতর-দিয়ে এ-সব হ'তে পারে। তাই, আমার মনে হয়—কুলগুরু, পুরোহিত, পাণ্ডা—এদের মুক্ত হস্তে দেওয়াই ভাল। হাজার হ'লেও তারা বামনাই ব্যবসা নিয়ে আছে। তাদের যেমন দিতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয়, সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মাথায় ধরিয়ে দিতে হয়, ব্রাহ্মণ হিসাবে তাদের করণীয় কী। এদের রক্তের মধ্যেই ও জিনিসটা থাকাই বেশী সম্ভব। একবার মাথায় ধরলে আর কথা নেই। শিক্ষার ও প্রেরণার প্রয়োজন সকলেরই আছে। এদের আমরা কেবল দোষ দিই, দোষ না দিয়ে যদি উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করি, তাহ'লেই হয়।

—আমরা মেয়েমানুষ, আমরা কা'র কী করতে পারি?

—মেয়েমানুষ হো'ক, ব্যাটাছাওয়াল হো'ক প্রত্যেকে যদি বিহিত আচরণশীল

হয়, এবং ইষ্টের ভাবে অন্যকে ভাবিত ক'রে তোলার বুদ্ধি ও চেষ্টা যদি সর্ব্বক্ষণ থাকে, কে যে কী করতে পারে, আর না পারে, তার কোন লেখাজোখা নেই। তোমার ঐ নাংলা কথায় কতজনের হয়তো চৈতন্যের উদয় হ'য়ে যেতে পারে। সব সময় ঐ ধান্ধায় থাকা লাগে। পরমপিতার দয়ায় তোমরা কিন্তু কেউ কম নও।

পরক্ষণেই শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—বদ্যিনাথের প্যাড়া আনিসনি ?

মা'টি খুশি হ'য়ে বললেন—হ্যাঁ, এনেছি, বড়মার কাছে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভাল। তীর্থ ক'রে আস্‌লি, বেশী থাকে তো এদের সবাইকে একখানা ক'রে দে। (মা'টি তাড়াতাড়ি গেষ্টহাউসে দৌড়ে গিয়ে সেখান থেকে কিছু প্যাড়া এনে উপস্থিত সকলের হাতে একখানা ক'রে দিলেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—তীর্থের প্রসাদ, সশ্রদ্ধ যারা, তাদের বিতরণ করা ভাল।

মা'টি বললেন—বেশী ক'রে এনেছি, দেশে গিয়েও অনেককে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। তীর্থের পুণ্যে তোর প্রাণ খুলে গেছে।

উক্ত মা—তীর্থ করার বাসনা ছিল অনেক দিন থেকে। অনেক তীর্থ ঘুরে এসে আজ মনে হ'চ্ছে, এই তীর্থের মত আর তীর্থ নেই। অন্য কোথাও যাওয়া মিছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিছে কেন ? এ তীর্থ যদি তোমার কাছে সত্য হয়, তবে অন্য তীর্থও তোমার কাছে সত্য। যুগে-যুগে তিনি আসেন, তাঁর লীলার অন্ত নেই। পূর্ব্বতনদের লীলাস্থলগুলি যদি আমরা দেখি, তাঁদের কথা যদি আমরা পড়ি, স্মরণ করি, আলোচনা করি, তবে বর্ত্তমানকেই আরো ক'রে বোধ করতে পারি। তাই জীবন্তের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হ'লে কিছুই মিছে নয়। তখন তোমার ভিটেমাটি, পথঘাট সবই তীর্থের অনুরঞ্জনা লাভ করে, আর তীর্থ-ক্ষেত্র ব'লে প্রখ্যাত যে-গুলি, সে-গুলি সম্বন্ধে তো কথাই নাই। আমাদের পূজা-পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ-তর্পণ, ব্রত-উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, দানধ্যান, অনুষ্ঠান, দশবিধ সংস্কার, কুলাচার, শাস্ত্রপুরাণ, দেবদ্বিজ, তীর্থ সবই গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। সদ্‌গুরুনিষ্ঠ হ'য়ে, আচারবান হ'য়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমরা যদি এগুলি বুঝতে চেষ্টা করি, তাহ'লেই বুঝতে পারি। কোনোটা উড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। তবে মূল ছেড়ে, ডালপালায় ঘুরে বেড়িয়ে লাভ নেই। সেইজন্য শাস্ত্রে আছে—'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। গুরু ধরব না, ছাপ্পান্ন রকম করব—তা'তে কিছু হয় না, ওতে মানুষ আস্তে-আস্তে পাগলাটে হ'য়ে যায়! (এই সব কথাবার্ত্তার পর শ্রীশ্রীঠাকুর খানিকটা সময় বিশ্রাম নিলেন।)

* * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, রাত্রের অন্ধকারে আশ্রমের সম্মুখের দিগন্তবিস্তৃত

প্রান্তর এক রহস্যময় নীরবতায় নিথর হ'য়ে আছে, উপরের তারাভরা আকাশ হাতছানি দিয়ে অনন্তের পানে ডাকছে মানুষকে, আর তারই পটভূমিকায় সান্ত ও অনন্তের মূর্ত্ত মিলনবেদী পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর মানুষকে ইঙ্গিত করছেন, সীমার মধ্য-দিয়ে কেমন ক'রে অসীমকে স্পর্শ করতে হয়।

কেষ্টদা শিক্ষা-সম্বন্ধে কথা তুললেন। তপোবনের শিক্ষকও কয়েকজন আছেন।

কেষ্টদা—ত্বরিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষমতা শিক্ষার মধ্য-দিয়ে সঞ্চারিত করা যায় না? এবং তা' কেমন ক'রেই বা করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, শিক্ষকের প্রতি টান থাকলে টক-টক ক'রে হ'য়ে যায়। শিক্ষকের চলনাও আবার টান উদ্রেক করার মত হওয়া চাই। শিক্ষক হবে loving (প্রীতিময়) অথচ ছেলেদের সঙ্গে honourable distance (সম্মান-যোগ্য দূরত্ব) রেখে চলবে, তার ইষ্টমুখীনতা এতখানি normal (সহজ), active (সক্রিয়) ও মুখর হওয়া চাই যা' ছেলেরা সবসময় feel (বোধ) করতে পারে। এমনতর চরিত্র ছেলেদের আকৃষ্ট করবেই, তখন সেই শিক্ষককে খুশি করবার জন্য ছেলেরাও পাগল হ'য়ে ওঠে। এই রকমটা থাকলে, তখন সব কাজই ক্ষিপ্রভাবে ক'রে শিক্ষককে সুখী করবার প্রবৃত্তি হয়। তার থেকে ত্বরিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষমতাও গজায়। শ্রেয়ের প্রতি টান না থাকলে সিদ্ধান্তের একটা দাঁড়া থাকে না, তাই তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। হয়তো জিজ্ঞাসা করছে—এখানে অসুবিধা আছে, এখানটা ছেড়ে বাড়ী চ'লে যাবে কিনা। তার যদি ভাল-লাগা ব'লে কিছু থাকতো তবে সব দিক এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করত, যা'তে এখানে তার থাকাটা হয়। কিন্তু এই যে জিজ্ঞাসা করে, তার মানে, আমার কথামত বাড়ী গেলে বেঘোরে পড়ার ভয় থাকবে না। আদত ইচ্ছা তার বাড়ী যাওয়া, এখানে ভাল-লাগা নেই, অথচ মনে ভয় আছে, আমার মত না নিয়ে গেলে যদি কোন ক্ষতি হয়, কিন্তু এটা হয়তো জানে যে, কেউ এখান থেকে চ'লে যায় সেটা সাধারণতঃ আমি পছন্দ করি না। তাই দো-আঁশলা ভাব থাকে, পট ক'রে স্থির করতে পারে না। মানুষের নেশা যদি একমুখী হয়, তখন তার সিদ্ধান্ত-গ্রহণে দেরী হয় না। বাধাবিঘ্ন-বিরুদ্ধতা যত যাই থাক না কেন, কিছুরই তোয়াক্কা করে না সে তখন। যা' সমীচীন ব'লে বিবেচনা করে, তা' করেই।

কেষ্টদা—অনুসন্ধিৎসা তো ধর্ম্মের একটা প্রধান জিনিস, এর শিক্ষা কেমন ক'রে দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগই মূল বস্তু, ও থাকলে সব আসে। হয়তো পট ক'রে একটা কাজ ক'রে নিয়ে আসতে বললেন, যা'তে মাথা খাটাতে হয়, পারা মাত্র বাহবা দিলেন। আবার যদি নাও পারে, এমনভাবে lead (পরিচালিত) করলেন যে, সে যেন নিজে থেকেই পারলো, এমন বোধটা গজিয়ে দিলেন। এমন ক'রে ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা পুষ্ট হ'তে থাকে। বাস্তব কাজকর্ম্মের মধ্যে ফেলতে হয়। শুধু পড়াশুনার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে নেই। হয়তো একজনের একটা খবর আনতে পাঠালেন। খবর নিয়ে আসার পর, সেই সম্পর্কে যা'-যা' জ্ঞাতব্য থাকতে পারে, পই-পই ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, যেটা সম্বন্ধে সে খোঁজ নেয়নি, সেটা আবার খোঁজ নিয়ে আসতে বললেন, তখনও আবার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আপনি প্রশ্নগুলি কেন করছেন, তার বাস্তব উপযোগিতা কী, তা'ও আবার বুঝিয়ে দেবেন। এইভাবে এমন ক'রে এক-একটা জিনিস ধরবেন যে, সেই ব্যাপারের দুনিয়ার যা'-কিছু জানবার, যা'-কিছু ভাববার, যা'-কিছু করবার, তা' না জেনে, না ভেবে, না ক'রেই সে পারে না। কাজকর্ম্মে'র মধ্যে ফেলে এইভাবে প্রত্যেকটা জিনিস নিখুঁতভাবে ষোল আনা বুঝবার, জানবার ও করবার প্রেরণা দিয়ে দিবেন। তখন দেখবেন ধীরে-ধীরে একটা ন্যাক আসবে। হয়তো পণ্ডিতকে বললেন—দারোগাদার দোকান থেকে শুনে আয় তো বার্লি কত ক'রে? ও হয়তো এসে আপনাকে বলল—বার্লি পাঁচসিকে ক'রে! আপনি তখন হয়তো জিজ্ঞাসা করলেন—কী বার্লি পাঁচসিকে ক'রে? পাঁচসিকের কৌটায় কতটুকু আছে? আর কী-কী বার্লি ঐ দোকানে আছে? কোন্ বার্লি কেমন? কোন্‌টার দামই বা কত? কয় রকম কৌটা পাওয়া যায়? খোলা বিক্রী করে কিনা? করলেই বা কী দাম? এই প্রসঙ্গে হয়তো জিজ্ঞাসা করলেন—বার্লি কিসের থেকে হয় বল্ তো? পরে আবার দোকান থেকে খবর জেনে আসতে পাঠালেন। জেনে আসলে খুশি হ'য়ে খুব তারিফ করলেন। এইভাবে করিয়ে নিতে হয়। বোধ-বিবেচনার পাল্লা বাড়িয়ে দিতে হয়। আমরা যদি আধখেঁচড়াভাবে চিন্তা করি, আধখেঁচড়াভাবে কাজ করি, আমাদের নিজেদের যদি অনুসন্ধিৎসা না থাকে, চতুর-চলন না থাকে, চার-চোখো দৃষ্টি না থাকে, কোন একটা জিনিসের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুবিধা-অসুবিধা, উপযোগিতা-অনুপযোগিতা, অন্য পাঁচটার সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদি তলিয়ে দেখবার বুদ্ধি ও অভ্যাস যদি আমাদের না থাকে, আমরা যদি প'ড়ো পণ্ডিত হ'য়ে ও প'ড়ো পণ্ডিত তৈরী ক'রে খুশি থাকি, তবে কিন্তু অনুসন্ধিৎসার চাষ দিতে পারব না ছেলেদের মাথায়। হাতে-কলমে কাজ নিজেরা যত করবেন, করাবেন, তত প্রতিপদক্ষেপে অনুসন্ধিৎসার

প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন। শিক্ষিত লোক বলতে আমি বুঝি কৃতিৎকর্ম্মা লোক। তাকে যেখানে ছেড়ে দেন, সেখানেই সে অজেয়। সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধি তার করতলগত। তার জন্য চাই বুদ্ধিমত্তা, অনুসন্ধিৎসা ও ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী প্রত্যেককে নূতন-নূতন পরিস্থিতির মধ্যে নূতন-নূতন দায়িত্বের মধ্যে ফেলে কাজ হাসিল ক'রে আসবার জন্য ক্ষেপিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রের জানা ও অভিজ্ঞতার জগৎ শিক্ষকের নখদর্পণে থাকা চাই। এমন কাজ দিতে হবে যা'তে সে common sense (সহজজ্ঞান)-এর সাহায্যে তার জানাগুলি প্রয়োগ ক'রে সেই কাজ করতে পারে। এইভাবে অজানাকে জানায় উপনীত ক'রে দিতে হবে। এটা শিক্ষার একটা মূলসূত্র। আর, অন্যকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে ছেলেপেলেদের লাগাতে হয়। দুনিয়ায় আমাদের সব চাইতে বড় কারবার মানুষের সঙ্গে। কিন্তু নানা প্রকৃতির মানুষকে কেমন ক'রে সত্তাসম্বর্দ্ধনার সহায়ক ক'রে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, সে-শিক্ষা আমরা ছেলেদের দিই না। ঐ শিক্ষা যদি না হয়, তবে সব শিক্ষাই নিষ্ফল হ'য়ে যায়। তাই একজনের হয়তো খুব রাগ বা অভিমান হয়েছে, তখন আর একটা ছেলের উপর হয়তো আপনি ভার দিলেন, 'যা! ওর সঙ্গে এমন ক'রে মিশবি, যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও হাসিখুশি না হ'য়েই পারবে না। তুই ঠিক পারবি। যা! এখনই যা।' এমনতর কাজ হাসিল করতে-করতে অনেক অনুসন্ধিৎসা, অনেক শুভবুদ্ধি, অনেক চারিত্রিক বল বেড়ে যায়। তখন তার ভাবা লাগে, কোন্ ভাবে কোন্ কথাটা বললে, চোখমুখের চেহারা কেমন করলে, কণ্ঠস্বরটা কেমন হ'লে, হাসিটা কেমন হ'লে তার ভাল লাগে, এতগুলি দিক ভাবা ও কাজে ফুটিয়ে তোলা চারটিখানি কথা নয়। কতকগুলি ক্ষেত্রে এই রকম করতে-করতে দেখবেন—সে কেমন দক্ষকৌশলী হ'য়ে উঠছে। একজন হয়তো কৃপণ মানুষ, ওল্লার পাছা টিপে খায়, আপনি লাগিয়ে দিলেন আর একজনকে—'ওর কাছ থেকে পাঁচ টাকা আদায় করা চাই ঠাকুরের জন্য'। এইগুলি sport-এর (খেলাধূলার) মত চালাতে হয়। এক-একজনকে দিয়ে এক-এক রকম করাতে হয়। তখন দেখবেন অনুসন্ধিৎসা-অনুসন্ধিৎসা ক'রে বক্তৃতা করা লাগবে না, ছেলেরা আপনা থেকেই অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে উঠবে। গরজ বড় বালাই। ছেলেদের অনুসন্ধিৎসু হবার গরজ ও প্রয়োজনের মধ্যে ফেলুন। নিজেদেরও সেই গরজ ও প্রয়োজনের মধ্যে নিরন্তর রাখুন—ইষ্টার্থ-পূরণী স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহমদিরতা নিয়ে, তবেই দেখবেন সহজে হবে। শিক্ষাটাকে আড়ষ্ট ও বই-খাতা-কলমের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে তুলবেন না, শিক্ষাটা জীবনের

গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত জুড়ে। আর, এর ক্ষেত্র শুধু class-room (ক্লাসের ঘর) নয়, এর ক্ষেত্র world-room (জগতের ঘর)। তাই, শিক্ষককে একটা ব্যাপক দৃষ্টি নিয়ে নিজেকে নিরন্তর প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতির উপর রাখা লাগে, তবেই তার শিক্ষা ছাত্রকে বৃহত্তর জীবনের উপযুক্ত ক'রে তুলতে পারে। এই শিক্ষাই হয় জীবনীয় ও জীবন্ত। সাধারণভাবে মাঝে-মাঝে অনুসন্ধিৎসা-উদ্দীপী প্রশ্নাদি করতে হয়, আর, ছেলেপেলে যে-কোন প্রশ্নই করুক না কেন, ভালভাবে তাদের বোধগম্য ক'রে উত্তর দিতে হয়। আমি অঙ্কের ক্লাসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এক আর এক দুই হয় কি করে? দুটো এক বরং হ'তে পারে। পৃথিবীতে কোন দুটো জিনিসই তো অবিকল এক দেখা যায় না, সবই তো স্বতন্ত্র, সবই তো বিশিষ্ট।' এখন যেভাবে বলছি, সেভাবে অতো বুঝিয়ে বলতে পারিনি, যাহো'ক তখনকার মত যে ভাষা জুটেছিল, তা' দিয়ে ঐ প্রশ্নই করেছিলাম। আমার প্রশ্ন শুনে মাষ্টার সে কি বেদম মার, আমাকে একেবারে পা'ড়ে ফেলে দিলেন। আমি বুঝতে পারলাম না আমার অপরাধটা কী, কেন এত মারলেন মাষ্টারমশায়। সেই থেকে অঙ্ক শেখা আমার চাঙে উঠে গেল। তাই শিক্ষক যেন কোন ছাত্রের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হন এবং কোন ছাত্রও যেন শিক্ষকের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন না হয়। ভালবাসায় অনুসন্ধিৎসা উৎসারিত ক'রে দেয়, বিদ্বেষ তাকে খর্ব্ব করে। শিক্ষকের নিজে অনুসন্ধিৎসা-প্রবণ হওয়া দরকার, তাহ'লেই তিনি ছাত্রের বাস্তব অনুসন্ধিৎসা-প্রসূত প্রশ্ন অনুধাবন করতে পারবেন, এবং তখন তিনি যদি কোন প্রশ্নের জবাব দিতে না-ও পারেন, তাহ'লেও তার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করবেন না। তাই শিক্ষক স্বয়ং ছাত্র না হ'লে শিক্ষকতা ব্যাপারে তিনি অনুপযুক্ত।

কেষ্টদা—Intuition (অন্তর্দৃষ্টি)-র training (শিক্ষা) তো দরকার ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। যেমন ধরুন, একটা গাছের ডাল ভেঙে আন্দাজ করতে বললেন—'কতগুলি পাতা আছে বল তো ?'—সে একটা বললো, ঠিক হ'লো না। বার-বার এমনি করলে, তখন হয়তো সে ভুল করলেও কাছাকাছি সংখ্যা বলে। এমনি করতে-করতে পরে যেটা ধরছেন, সেইটে নির্ভুলভাবে বলছে। আমি একটা বললাম, এইভাবে নানা এৎফাঁক ক'রে intuition-এর (অন্তর্দৃষ্টির) training (শিক্ষা) দিতে হয়। মাথায় ধ্যান রাখতে হয়, কেমনভাবে কোন্ জিনিসটা ঢোকাব। নানারকম প্রবৃত্তির ধান্ধা থাকলে, সে এসব পারে না।

কেষ্টদা—হিটলারের শিক্ষা-সংস্কারে প্রধান জিনিস দেখতে পাই—শরীর-গঠনে দৃষ্টি। পেশী যদি সবল না হয়, স্নায়ুর সহনক্ষমতা যদি বেশী না হয়,

তাদের দিয়ে কোন কাজ হওয়াই তো সম্ভব নয়, গুরুতর চাপ পড়লেই এলিয়ে পড়বে। এ-বিষয়ে শিক্ষার মধ্যে আমরা কী করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেপেলেদের কর্ম্মঠ ক'রে তুলতে হবে—খেলাধূলো, ক্ষেত-বোনা, কারখানার কাজ, বাজার-হাট করা, বিক্রি করা ইত্যাদি নানা কাজের ভিতর-দিয়ে। বিশ-পঞ্চাশ মাইল হাঁটতে হয়, এমন কাজ দিলেন। আস্তে-আস্তে চাপ দিয়ে সইয়ে নিলেন। আবার, শরীর ভেঙ্গে না পড়ে সে-দিকে লক্ষ্য রাখলেন। যে-কাজটা করতে পনর মিনিট লাগে, পাঁচ মিনিটে তা' ক'রে ফেলতে বললেন, এইভাবে তাদের muscle (পেশী) adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে হয়। শীঘ্র, সুবিধায়, সুন্দরভাবে কাজটা যে কাবেজে আনতে পারলো, তাকে বাহাদুরী দিলেন। বাহাদুরী এমনভাবে দেবেন, যা'তে যারা তা' পারলো না তারা যেন মুসড়ে না যায়। সবাইকে আশা দিতে হবে, বলবেন, 'তোরও হবে, তুইও পারবি, এইভাবে করলে এখনই পারতিস্, প্রায় হ'য়ে এসেছিল।' Appreciation (গুণগ্রহণ)-টা বড় জিনিস, appreciation (গুণগ্রহণ) rightly adjusted (যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত) হ'লে প্রত্যেকটি ছেলেরই evolve (বিকাশলাভ) করবার সুবিধা। Ego (অহং) প্রত্যেকেরই আছে, তাই appreciation (গুণগ্রহণ) দিয়ে elate (উদ্দীপ্ত) করতে হয়। কাউকে দমিয়ে দিতে নেই, ওতে খুব ক্ষতি হয়। আর, ছেলেরা বাড়ীতে কে কী খায় সে-সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হয়। কম খরচের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার ভিতর পুষ্টির দিক দিয়ে আর কী-কী জিনিস ব্যবহার করা যায়, বাড়ীতে মায়েদের শিখিয়ে দিতে হয়। আর, ছেলেপেলেরা যা'তে সদাচারে অভ্যস্ত হয়, বাড়ীতে ও স্কুলে তেমনতর শিক্ষা দিতে হয়।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় প্যাণ্ডেলের ওখানে নাটকের মহড়া উপলক্ষে কে একজন চড়াসুরে গান ধরেছে, সঙ্গে সুর-তাল-লয়-সমন্বিত নানা বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গত চলছে, নিস্তব্ধ রজনীতে সঙ্গীতের এই উদাত্ত সুর বড় মধুর লাগছে। শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছেন। একটু পরে কেষ্টদার দিকে চেয়ে মধুরহাস্যে বললেন—ওরা বেশ আছে স্ফূর্ত্তিতে।

কেষ্টদা হেসে বললেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের পয়সাকড়ি থাক্ বা না-থাক্, সুখী আপনাদের মত কেউ নয়।

কেষ্টদা—পয়সাকড়ি মোটে যখন ছিল না, সবাই মিলে আনন্দবাজারে একবেলা যখন খেতাম, তখন মনে হয় সুখ আরো বেশী ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক কইছেন।

সরোজিনীমা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খাচ্ছেন আর কথা বলছেন। কেষ্টদা পূর্ব্বপ্রসঙ্গে আবার প্রশ্ন করলেন—আমরা ছেলেদের কর্ম্মঠ করার পরিবর্ত্তে, পরীক্ষা-পাশ করাতেই তো ব্যস্ত, আর তারই তারিফ করি বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের motor nerve (কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু) active (সক্রিয়), যাদের co-ordination (সঙ্গতি) বেশী, তারা পরীক্ষার পড়াও পট ক'রে আয়ত্ত করতে পারে। ওতে বরং তাদের সুবিধাই হয়। সবটার সঙ্গে সবটা co-related (জড়িত)। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী এক-একজনের এক-একভাবে বোধ খোলে। এক-একটা মানুষ এক-একটা জীবন্ত যন্ত্র, তাকে fully (পুরোপুরি) study (অনুধাবন) করা চাই, তবেই তাকে evolve (বিকশিত) করানো সম্ভব হবে। একজন হয়তো মূলতঃ mechanic (কারিগর), সে হয়তো অঙ্ক বোঝে না, কিন্তু mechanical line-এ (কারিগরির দিকে) সুযোগ দিয়ে তার মাথাটা যদি খুলে দিতে পারেন, তখন হয়তো দেখবেন সেই মাথা নিয়ে অঙ্কও সে ভাল বুঝবে।

কেষ্টদা—ছেলেদের মধ্যে স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্ববোধ গজাবে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষকের nerve (স্নায়ু), brain (মস্তিষ্ক), muscle (পেশী) যদি তেমনভাবে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, তবে তা' ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। আর, পড়ায় সবসময় করা খুঁজে বের করতে হবে, প্রত্যেকটা theoretical (তত্ত্বগত) জিনিসকে ছাত্রদের দিয়ে practical shape (বাস্তব রূপ) দেওয়াতে হবে, এবং তা' দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে—সে কাঁপির ক্ষেতেই পার, আর হাতুড়ি-বাটাল নিয়েই পার! আমার ইচ্ছা আছে, শিক্ষকদের কারখানা, কেমিক্যাল, প্রেস, কাঠের কাজ ইত্যাদি সব কাজই শেখাব। আরো ভাবি, নতুন ক'রে সব বিষয়ে বই লেখাব, যা'তে সহজে ছেলেরা মূল জিনিসটা ধরতে পারে, এবং তার বাস্তব প্রয়োগ শেখে। কত কথাই মনে হয়—ভাবি তপোবনের একটা নিজস্ব কারখানা থাকবে, সেখানে master-machines (মূল যন্ত্রপাতি) সব থাকবে, লেদ, মিলিং, প্লেইনিং সব কাজ ছেলেদের শেখান হবে, প্রেসের মেসিন থাকবে, সে-কাজ শিখবে, আর শিখবে কামারশালার কাজ, কাঠের মিস্ত্রীর কাজ, কৃষি, বাঁশ ও বেতের কাজ, ঘর বাঁধা, রাজমিস্ত্রীর কাজ, কাপড়-বোনার কাজ, টাইপ রাইটিং ;—না কি ? একেবারে চৌকশ হ'য়ে বেরুবে। যে-অবস্থায় ফেলে দেবে, সেখান থেকেই কেটে

বেরুবে, পেটের ভাতের জন্য আর ভাবতে হবে না। তা'ছাড়া তারা এক-একজন নেতৃস্থানীয় হ'য়ে উঠবে। 'অর্জ্জনে পটু, সাশ্রয়ী কাজে, সুন্দরে সমাপন'—এই হবে কাজের মানদণ্ড। আর, ক্ষিপ্রতা এত বাড়াতে হবে, motor apparatus (কর্ম্মযন্ত্র) এতখানি efficient (দক্ষ) ও active (কর্ম্মঠ) ক'রে তুলতে হবে, যা'তে দেখতে না দেখতে কাজ হ'য়ে যায়, যেন miracle (অলৌকিক ঘটনা)—'Let there be light and there was light'. 'আলো জ্বলুক বলিতে না বলিতে আলো জ্বলিয়া উঠিল'—এই ভাব, যাকে বলে Blitzcrieg action (বিদ্যুদ্বেগে কাজ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার ঈষদা-দাকে উদ্দেশ্য ক'রে সস্নেহে বলছেন—ঈষদা-দার সব গুণ আছে, একটা দিক একটু ঠিক ক'রে নিলে হয়। Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি)-টা ছেড়ে দিতে হয়। প্রথমটা একটু কষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু ক'দিন কষ্ট। কিছুদিনের কষ্টের পরই একেবারে line clear (রাস্তা পরিষ্কার), ছয় মাস কষ্ট ক'রে যদি চিরদিন princely way-তে (রাজার ছেলের মত) থাকা যায়, তবে সারাজীবন কে pauper (দৈন্যগ্রস্ত) হ'য়ে থাকতে চায় ?

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যাজন অনেকে করে, কিন্তু যাজন কা'কে বলে তা' বলতে পারে না, জানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না জেনেও আরম্ভ করা ভাল। পড়ার সময় 'কোকিল'-কে যদি 'কুকিল' উচ্চারণ করতে থাকে, ধমক দিয়ে সঠিক উচ্চারণ যদি ব'লে দেওয়া যায়, সে তখন ১০।২০ বার তা' উচ্চারণ ক'রে ঠিক ক'রে নেয়। কারও হয়তো একটু বেশী সময় লাগতে পারে, এই যা'। পড়ার অভ্যাসটা আয়ত্ত করাও কম কথা নয়, ভুল পড়তে লাগলে, যারা জানে তাদের কথায় সারে।

কেষ্টদা—যাজন তো সব ব্যাপারের মধ্যেই হবে, ধরুন, grammar (ব্যাকরণ) পড়াচ্ছি, সেখানে যাজন কেমনভাবে করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Grammar (ব্যাকরণ) পড়ানোর সময় কেইসান যাজন করেছি দেখেননি ? সব জিনিস বোঝানোর জন্য টুক ক'রে নূতন-নূতন ছোট-খাট word (শব্দ) ও example (দৃষ্টান্ত) indent (আমদানী) করতে হয়। Grammar (ব্যাকরণ) পড়াতে-পড়াতে হয়তো 'Grammar of language, grammar of life' (ভাষার ব্যাকরণ, জীবনের ব্যকরণ) এই ব'লে আরম্ভ করলেন। Principles of being and becoming (বাঁচা-বাড়ার নীতি)-কে আদর্শ-সার্থকতায় সার্থক ক'রে তোলাই যাজন। যাই করাই, যাই শিখাই, being and becoming-এর (জীবন ও বৃদ্ধির) সঙ্গে তার co-ordinated

relation (জড়িত সম্পর্ক) demonstrate (প্রদর্শন) করতে হয়। Grammar (ব্যাকরণ)-ই পড়াই, আর যাই পড়াই, সব বিষয়ের ভিতর-দিয়ে যদি যাজন না হয়, তবে সে পড়ান ব্যর্থ।

এইবার রাত বেড়ে উঠেছে, শীতের রাত, আসর ভাঙ্গার উপক্রম হ'চ্ছে। প্রফুল্লর মা প্রফুল্লর জন্য তাসুর এক কোণায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তাই লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মায়ের মত বস্তু নেই, কত লোক আগেভাগে চ'লে গেছে। ও ছাওয়ালকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ব'লে এই শীতের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। (পাশ ফিরে ব'সে খোঁজ নিলেন)—প্যারী কোথায়? সেই ছাওয়ালটার (একটি ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার রোগী) খবর তো আর পেলাম না।

বিদ্যামা প্যারীদাকে ডাকতে গেলেন।

৮ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৪৮ (ইং ২৩।১২।৪১)

একে শীতের দিন, তায় আবার টিপ-টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, আশ্রমের সামনের দিকে দুরন্ত ঠাণ্ডা হাওয়া, তাই ভোরে লোক-সমাগম কমই হয়েছে। প্যারীদা (নন্দী) ও সেবকবৃন্দের মধ্যে কতিপয় আছেন। পদ্মাপাড়ের তাসুর দরজা-জানালার বেশীর ভাগ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে করুণভাবে বলছেন, আজ কেবল ৮ই পৌষ, এখনও পৌষ মাসের কতদিন বাকী, তারপরে আছে মাঘ, এই শীত পাড়ি দেব কি-ভাবে তাই তো ভাবি।

সরোজিনীমা—আজ মেঘলা দিন ব'লে এত ঠাণ্ডা, রোজ তো এত ঠাণ্ডা পড়বে না। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেটে তো যাবে, কিন্তু সামাল দিতে পারলে সে হয়। যাক্, তুই ভাল ক'রে এক কলকি তামুক খাওয়া, দেখি তা'তে একটু গরম হ'তে পারি কি না।

সরোজিনীমা—হ্যাঁ। তামাক দিয়ে তারপর আপনার পা'টা ভাল ক'রে ঘষে দিচ্ছি। দেখবেন তা'তে একটু আরাম পাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু টেনে বললেন—তাই-ই দাও।

আশ্রমের স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে প্যারীদাকে বললেন—দ্যাখ্ প্যারী! ভাল ডাক্তার

হ'তে গেলে অনেক কিছু করা চাই। রোগ হ'লে চিকিৎসা ক'রে আরাম করাটাই ডাক্তারীর সব নয়। যা'তে অসুখবিসুখ না হয় এবং লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে ও উন্নত হয়, সে-দিক দিয়েও ডাক্তারের অনেক কিছু করবার আছে। এ-সব বিষয়ে মানুষের জ্ঞান অতি সীমাবদ্ধ। তাই তোমরা সচেতন হ'য়ে সবাইকে বার-বার বলবে এবং তাদের দিয়ে যা' করবার করিয়ে নেবে।

প্যারীদা—কোন্-কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, ব'লে যদি দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতবার কতভাবে বলেছি।

প্যারীদা—আর একবার গুছিয়ে যদি বলেন, ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভাবতে গেলে, তার মার পেটে আসার আগে থেকে ভাবতে হবে। প্রথম চাই উপযুক্ত বিবাহ, উপযুক্ত দাম্পত্য জীবন। পিতা-মাতার বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনে যদি অসঙ্গতি থাকে, তবে ছেলেমেয়ে শরীর-মনে সুস্থ হ'তে পারে না। তারপর, মেয়েদের জানা চাই, ঋতুকালে ও গর্ভাবস্থায় কিভাবে চলতে হয়। সহবাস কা'কে বলে—পুরুষ, মেয়ে কেউই জানে ব'লে মনে হয় না। ক্ষণিক উত্তেজনার বশে মিলনটাই সহবাস নয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে গভীর আদর্শপরায়ণতা, গভীর অনুরাগই এর মূল জিনিস। তখন উভয়েরই থাকে প্রীত ক'রে প্রীত হওয়ার বুদ্ধি, তা'তে লাগে অনেকখানি সংযম ও সাধনা, নিজের সুখের কথা সেখানে গৌণ, অপরের সুখই মুখ্য। এইটে হ'লো প্রেমের রীতি। আর, স্বামী-স্ত্রী যেখানে আদর্শপরায়ণ, তাদের যৌন-মিলনের পিছনেও বুদ্ধি থাকে—এর মধ্য-দিয়ে যদি সন্তানের আবির্ভাব হয়, সে-সন্তানও যেন ইষ্টের পূজায় লাগে। স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনের পটভূমি যদি সহজভাবে এমনতর হয়, ইষ্টের স্মৃতি, কৃষ্টির স্মৃতি, ধর্ম্মের স্মৃতি, পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি যদি জাগ্রত থাকে, আত্মসুখস্পৃহার থেকে প্রীণন-স্পৃহা যদি প্রত্যেকের মধ্যে প্রবল থাকে, তবে সেখানে সন্তান দেহ-মনে বলিষ্ঠ হবেই। পুরুষ যদি ইষ্টনিষ্ঠ হয়, স্ত্রী যদি হয় স্বামীপ্রাণ, ইষ্টপ্রাণ, তথা সহধর্ম্মিণী ; ইষ্টপ্রসঙ্গ, ধর্ম্মচর্য্যা, পরিবার ও পরিবেশের ইষ্টানুগ সেবা, সর্ব্বপ্রকার উন্নয়নী আনন্দদায়ক অনুশীলন—এইগুলি যদি তারা যৌথভাবে করতে অভ্যস্ত হয়,—প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্যমত,—তবে তাদের কামকলার ক্ষেত্রও অনেকখানি সুস্থ, উন্নত ও পবিত্র হয়। পিতা-মাতার এই এমনতর শ্রদ্ধানুগ অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে যে বৈধী মিলন সংঘটিত হয়, তার ভিতর-দিয়ে সন্তান সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতির অধিকারী হ'য়ে ওঠে। ঐ জৈবী-সংস্থিতিই হ'চ্ছে জীবনের আকর। জাতকের রোগ-নিরোধ-ক্ষমতা, আয়ু ও বর্দ্ধন-তৎপরতা

ঐ জৈবী-সংস্থিতির উপরই নির্ভর করে। আর, অমনতর যৌনচর্য্যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর শরীর-মনও সুস্থ ও দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। রুগ্ন কাম অনেক বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে।

প্যারীদা—এ বিষয়ে ডাক্তার হিসাবে আমরা কী করতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের সুবিধা অনেক। বিপদে প'ড়ে তোমাদের কাছে মানুষ আসে। তাদের যেমন সেবা দাও, সঙ্গে-সঙ্গে তাদের মাথায় যদি ঢুকিয়ে দাও—তাদের প্রাণে ব্যথা না লাগে,—এমনতরভাবে, তাহ'লে তারা উপকৃত হবে। বিশেষ-বিশেষ মুহূর্ত্ত আছে, যখন কায়দামত কথা বলতে পারলে, মানুষের মাথায় ধরে। তোমাদের জীবনে সেই সুযোগ বেশী আসে। উপদেষ্টার মত বলতে নেই, বলতে হয় দরদীর মত। আর, যে-কথা গোপনে বলবার, সে-কথা গোপনেই বলতে হয়। এ ছাড়া মানুষের খাদ্য, কাজকর্ম্ম, আমোদ-প্রমোদ, খেলা-ধূলা, ঘুম, বিশ্রাম ইত্যাদির সুষ্ঠু রকম-সম্বন্ধেও বুঝিয়ে দিতে হয়। খাদ্যের গুণাগুণ খুব কম মায়েরাই জানে, শরীরের কখন কোন্ অবস্থায় কোন্ খাদ্য উপযোগী, সে-সম্বন্ধে মায়েদের মুখে-মুখে ওয়াকিবহাল ক'রে দিতে হয়। যখনই কোন বাড়ীতে কোন রোগী দেখতে যাও, ব্যাপক দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করতে হয়, জানতে হয়, তাদের খাওয়া-দাওয়া, রান্নাবান্না, চলাফেরা, সদাচার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি কেমন। কোন-কোন বাড়ীতে হয়তো পেট খারাপ অথচ খুব তেল, মসলা ও ঝাল দেয়। এটা যদি তুমি নিবারণ না কর, তবে শুধু ওষুধ দিয়ে রোগ সারাতে পারবে না। বাড়ীঘর করার সময় অনেকে টাকা-পয়সা যথেষ্ট খরচ করে, কিন্তু আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা কেমন রাখলে, পোতাটা কতটুকু উঁচু হ'লে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তা' হয়তো জানে না, সেগুলি ব'লে দিতে হয়। অনেক বাড়ীতে অন্য ঘর থাকা সত্ত্বেও গাদা দিয়ে একঘরে বহু লোক হয়তো থাকে, তা' ভাল নয়। কোন-কোন বাড়ীতে এমন দেখেছি, রান্নাঘরটা এমনভাবে করে যে, সেখানকার কয়লার ধোঁয়া বাসঘরগুলির মধ্য-দিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, অথচ এতে স্বাস্থ্যের অনেকখানি ক্ষতি করে। পাকা রান্নাঘর করবার সময় একটা চিমনির ব্যবস্থা করা এমন-কিছু কঠিন নয়। জল-নিকাশের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে যতটুকু আমাদের করবার তা' আমরা করি না। ফলে, বাড়ীর কাছে জল জ'মে মশা হয়, ম্যালেরিয়া হয়। এগুলি-সম্বন্ধে তোমরা যদি প্রত্যেককে সাবধান ক'রে না দাও, তবে শুধু কুইনাইন দিয়ে ম্যালেরিয়া কত সারাবে? সকলকেই এগুলি বলতে হয়। অবশ্য রোগ-নিরোধক্ষমতা যত সুন্দর ও শক্ত হয় ততই ভাল। রোগ-সংক্রমণ-সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের তো কোন ধারণাই নেই। বহু শিক্ষিত

লোককে দেখেছি—টলটলে সর্দ্দি নিয়ে বহু লোকের মধ্যে এসে নির্ব্বিবাদে ব'সে যাচ্ছে। এতে যে কত লোকের ক্ষতি করছে, তা' সে বোঝে না, আর, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তারাও বুঝে সাবধান হয় না। আমাদের এখানে টিউবওয়েল থেকে বাঁচোয়া, কিন্তু জল-সম্বন্ধে বহু জায়গায় মানুষের খেয়াল নেই। বাইরে গ্রামে যেখানে রোগী দেখতে যাও, খোঁজ নিও, কোন্ জল খায়, কোন্ জলে রান্না করে। অবশ্য তোমাদের দৌলতে আশেপাশে বহু জায়গাতেই টিউবওয়েল হ'য়ে গেছে। ফলকথা, একটা রোগী দেখতে তার হাঁড়ি-হেঁসেল থেকে পায়খানা-প্রস্রাবের জায়গা, গোয়াল পর্য্যন্ত দেখবে। প্রত্যেকের বাড়ীর আশেপাশের জঙ্গল যা'তে সাফসাফাই ক'রে রাখে, সে-বিষয়েও মানুষকে বলবে। প্রতিষেধক হিসাবে যখন যে ইনজেক্সন, টিকে ইত্যাদি নেওয়া দরকার, সে-সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করবে। আর স্বাস্থ্য, সদাচার ইত্যাদির বিষয়ে আমি যেগুলি বলছি সেগুলি ভাল ক'রে প'ড়ে রাখবে, এবং প্রত্যেকে যা'তে পালন ক'রে চলে, সে-বিষয়ে তাদের বুঝিয়ে দেবে। কোন্ রোগে কোন্ বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়, শুশ্রূষাকারীকে কেমনভাবে চলতে হয়, সব পই-পই ক'রে শিখিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেক গৃহস্থ-ঘরে এ্যাজামঞ্জিট, প্রিভেণ্টিনা, অইিডিন, ফেনাইল, কার্ব্বলিক সাবান ইত্যাদি কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস রাখার কথা ব'লে দিতে হয়। আমি যে এত কথা তোকে বলছি তার কারণ, তোর বাড়ীতে-বাড়ীতে যাওয়া পড়ে। তোর মানুষের জন্য করা আছে ঢের, তোকে মানুষ ভালবাসে। তুই অন্যান্য ডাক্তারদের নিয়ে যদি চেষ্টা করিস্, হাওয়া ফিরিয়ে দিতে পারিস্। ধর্ম্ম কা'কে কয়, ধার্ম্মিক কা'কে কয়, তোদের মধ্য-দিয়ে আমার সবাইকে দেখাতে ইচ্ছা করে। ধার্ম্মিক বলতে আমি বুঝি সেই মানুষ, যে নিজের ও আশপাশের সবার বাঁচা-বাড়ার জন্য যা'-যা' করণীয় তা' করে ও করায়—সুকেন্দ্রিক সার্থক-তৎপরতায়। অনেকে জানে না, বাঁচা-বাড়ার জন্য কতখানি করতে হয়, আবার জেনেও অনেকে করে না, করায় না। তোমরা যদি সবদিক খেয়াল রেখে কঠোর পরিশ্রম না কর, তাহ'লে আমার সব চেষ্টা অরণ্যে রোদন হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েক মিনিট চুপ ক'রে রইলেন। তারপর হঠাৎ বললেন—এমন দিনে পিঠে-পায়েস, না হয় খিচুড়ি, এইসব খেতে হয়।

কালিদাসীমা—খাবেন? বড়মাকে ব'লে আসি?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—সে-কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন?

কালিদাসীমা—কী করতে বলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কী আমি বলতে পারি? সে বড়বৌ জানে। আমি তো

পেলেই মেরে দেব। কী খাওয়া উচিত, কী খেলে সহ্য হবে, সে বড়বৌ জানে। আমার পছন্দ কী তাও তার জানা আছে। আমার পেটের অভিভাবক বড়বৌ।

এরপর নানারকম পিঠে-সম্বন্ধে গল্প উঠলো, কোন্ পিঠে কেমন ক'রে করে, কোন্‌টার আস্বাদ কেমন ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিলেন। পরে আবার তাম্বুতে এসেই বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রভৃতি অনেকে আসলেন। হিন্দুমহাসভা-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দুমহাসভা যা' করছে ভাল, তবে ব্যক্তিগত চরিত্র-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে কোন আন্দোলনই জয়ী হ'তে পারে না। আচারে, ব্যবহারে প্রত্যেকটি হিন্দুকে খাঁটি হিন্দু ক'রে তুলতে হবে। খাঁটি হিন্দু, খাঁটি মুসলমান, খাঁটি খ্রীষ্টানে কোন বিরোধ নেই। আমরা পূর্ব্বতন মহাপুরুষ প্রত্যেককে মানি, রসুলকেও মানি, যীশুকেও মানি। সে-হিসাবে মুসলমান, খ্রীষ্টান, সবাই আমাদের পরিবারভুক্ত। সবারই উন্নতি যা'তে হয় সেজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সমাজ-ব্যবস্থা, বিবাহ-ব্যবস্থা ইত্যাদি-সম্বন্ধে ঋষিরা সংহিতায় যে বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন, তা' সবার মধ্যে চারিয়ে দিতে হবে। প্রতিলোম-সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার হ'তে হবে, আর, বিধিমাফিক অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ যত হয়, ততই ভাল। পরিপূরণী এক আদর্শের অনুসরণ ও বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ—এই দুটি জিনিস সব সমাজের মধ্যে, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিয়ে দেন, দেখেন কী হয়। সামনে কন্‌ফারেন্স আসছে, প্রত্যেককে এমন ক'রে ক্ষেপিয়ে দেবেন যে, সে যেন তার জায়গায় গিয়ে আর সকলকে মাতিয়ে তোলে, আর যাজনের ঢেউগুলি ক্রমশঃ বিভিন্ন স্থান থেকে বিস্তার লাভ ক'রে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে সারা দেশের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে। কয়েকটা মানুষ মরিয়া হ'য়ে লাগলে সারা দেশকে বাঁচান যায়, সারা পৃথিবীকে বাঁচান যায়। আপনারা তো আমার এত আছেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, গুণী। আমি যা' কই, বোধ-দৃষ্টি নিয়ে যদি ক'রে যান, অন্য কোন ধান্ধা, অন্য কোন ইচ্ছা, অন্য কোন খেয়াল, আরাম, আলস্য ইত্যাদি বুদ্ধি যদি না থাকে, দেখবেন খুব কঠিন কিছু নয়। সময় থাকতে যদি না করেন, পরে অনেক জিনিস হাতের বাইরে চ'লে যাবে। তখন হাজার গুণ পরিশ্রম ক'রেও পেরে উঠবেন না। এখনও সময় আছে, আর দেরী করলে বরাবরের মত পস্তাতে হবে। এই কন্‌ফারেন্সের পর যে বাংলার সব জেলাতে কর্ম্মী পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন, সে খুব ভাল। আপনি এখান থেকে চিঠিপত্র

দিয়ে তাদের সবসময় মাতিয়ে রাখবেন। আর, শরৎদা ও প্রফুল্ল জায়গায়-জায়গায় যেয়ে যাজনের ঢেউ তুলে ওদের কাজে সাহায্য করবে। একটা উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সঙ্কল্পের ভাবকে সবসময় জাগিয়ে রাখতে হয়। ক্রমাগত push (ঠেলা) দেওয়া দরকার, একটা মানুষও যেন ঝিমিয়ে পড়ার অবকাশ না পায়। Take it for granted (এটা ধ'রেই নেবেন) যে-মানুষের জড়তা আছে, fatigue (ক্লান্তি) আছে, কিন্তু আপনাদের এতখানি অতন্দ্র হ'য়ে চলতে হবে যে, আপনাদের স্ফূর্তিদায়ক তাড়না ও প্রবোধনায় সবার সব অবসাদ ছুটে পালায়। কাজ যদি আশানুরূপ না হয়, তবে জানবেন, আপনারা মাথা-মাথা যারা তারাই দায়ী। সৎসঙ্গীদের মত এমন সোনার চাঁদ মানুষ দেখি না। এমন সব মানুষ হাতে পেয়ে এদের দিয়ে যদি করিয়ে না নিতে পারেন, তবে আপসোসের সীমা থাকবে না। আর, এই কন্‌ফারেন্সে ১৩০ টাকার ব্যাপারটা জোরসে চারিয়ে দেন। আস্তে-আস্তে প্রতিষ্ঠানগুলি সব জাঁকিয়ে তুলুন, বইপত্রগুলি ছাপিয়ে ফেলুন, আর জমিটমিও আরো কেনা দরকার, তা' না হ'লে লোকজন আস্‌লে তারা খাবে কী? যুদ্ধের ব্যাপার যেমন ঘোরাল হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে তা'তে কী হয় বলা যায় না।

সবাই স্তব্ধ হ'য়ে শুনছেন।

নগেনদা (বসু) জিজ্ঞাসা করলেন—ছ'বছরে ১৩০ টাকা আমাদেরও কি দিতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টান থাকলে আপনা-থেকেই দান আসে, তখন আর জিজ্ঞাসা করে না।

নগেনদা—যারা এখানে প'ড়ে আছে, টান না থাকলে তারা থাকবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকের hypocrisy of attachment (টানের ভান) আছে, real (সত্যিকার) টান অন্য জিনিস। আপনি যেমন খোকনকে ভালবাসেন, তার আলোয়ানটার উপর পর্য্যন্ত আপনার যতখানি টান, খোকনের জন্য আপনার বুকখানা যেমন করে, তার জন্য যতখানি উদ্ব্যস্ত হ'য়ে ঘোরেন, আমার জন্য কি ততটা হয়? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারেন। আমার এ-সব কথা বলা ভাল না। এগুলি বড় রূঢ় সত্য, মানুষের প্রাণে লাগে। আমারও বলতে ইচ্ছা করে না। তবু বলি আপনাদের আত্মবিশ্লেষণের সুবিধার জন্য। এ-কথা মনে করবেন না যে আপনারা ছেলেপেলেদের ভালবাসেন, তা' আমি পছন্দ করি না। সে আমি ঢের পছন্দ করি। ছেলেপেলের জন্য বাপের প্রাণ কেমন করে, সন্তানের পিতা হিসাবে সে আমি খুব বুঝি। তাদেরটা যদি

আমি না বুঝতাম, তাহ'লে আপনাদেরটাও বুঝতে পারতাম না। আমার কথা হ'চ্ছে, মানুষের জীবনে মুখ্য হওয়া উচিত তার ইষ্ট, তবেই তার মাথা ঠিক থাকে, যার প্রতি যা' করণীয় ঠিকভাবে করতে পারে। আমরা বৌ-ছেলেপেলের পেছনে ছুটি, বৌ-ছেলেপেলে প্রবৃত্তির পেছনে ছোটে, এতে সবারই অশান্তি। বৌ-ছেলেপেলে যদি দেখে যে আমি দেহ-মনে ইষ্টকে নিয়ে ব্যাপৃত এবং তাদের প্রতিও স্নেহশীল, তখন তারাও আমামুখী হয়, ইষ্টমুখী হয়, এতে দুঃখ-কষ্টের মধ্য-দিয়ে চলতে হ'লেও পরিণামে ফল ভালই হয়। আর, কেউ যদি উপচয়ী হয়, কৃতী হয়, তার দুঃখ-কষ্ট বেশীদিন ভোগাও লাগে না। ধরেন, এখানকার কোন কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের সংস্রবে থেকে আপনি দু'পয়সা নেন, আপনার যদি ঐ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে আমাকে উচ্ছল ও লাভবান ক'রে তোলার বুদ্ধি থাকে, না চাইতেই আমাকে দেবার বুদ্ধি থাকে, এবং সেই বুদ্ধি থেকে আপনি যদি আরো কর্ম্মঠ হ'য়ে ওঠেন, আর এইরকম যদি বেশীর ভাগ কর্ম্মীই হয়, তাহ'লে আমিও আপনাদের পুরচার ক'রে দিতে পারি, আর অক্ষম, অযোগ্য যারা তেমন বহুকেও টানতে পারি। তাই আমার মনে হয়, আমার প্রতি টান থাকলে, আমার সব-কিছুর পর টান থাকতো, কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলির আজ এই অবস্থা হ'তো না। প্রত্যেকেই আপনার বোধে খাটতো, নিতো, দিতো নিজেরাই লাভবান হ'তো, উচ্ছল হ'তো। মানুষ এই সোজা কথাটাই বোঝে না যে, ইষ্টস্বার্থী হওয়াই আত্মস্বার্থসম্পূরণের শ্রেষ্ঠ পথ। ইষ্টের স্বার্থের মধ্যে সবার স্বার্থই নিহিত আছে। তাঁর সুমহান বিপুল স্বার্থকে যদি আমার স্বার্থ ক'রে নিই এবং তা' পূরণ করার জন্য যদি লাভজনকভাবে খাটি, তবে আমার ভাত মারে কে? আপনারা বড় হন, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন, লোভনীয় দেব-চরিত্রের অধিকারী হ'য়ে ওঠেন—এই আমার স্বার্থ, সেই স্বার্থের খাতিরেই তো আপনাদের পেছনে এমন ক'রে লেগে থাকি।

নগেনদা—আমাদের এই টানটুকু হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন প্রশ্ন নেই, যে করে তার হয়। মানুষ যে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে, ক'দিনেই পরের ছেলে আপন ক'রে নেয়। দারোগাদা যে বিড়েল পোষে, বিড়েলের জন্য কত করে, দারোগাদার কাছে তার কত আদর, সেখানে সেই বিড়েলের ভাগ্য কি আমার আছে?

সকলে হেসে ফেললেন।

এমন সময় ছোট মাসীমা আসলেন,—শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেই উল্লসিত হ'য়ে বললেন—ভেলকুর মা আইছ? আসো, (নিজের পাশে জায়গা দেখিয়ে দিয়ে)—এখানে ব'সো।

মাসীমা—আমার যে এখন কাজকর্ম্ম আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—কাজকর্ম্ম তো নিত্যি আছে। ও কিছু না। তুমি ব'সো মোনে।

মাসীমা হেসে বললেন—তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই।—(এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে বসলেন।)

দুই-এক মিনিট নীরবে কাটলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর (করুণ কণ্ঠে)—মা যেয়ে আমি যেন ডানা-ভাঙ্গা হ'য়ে পড়েছি। দুনিয়াটা যেন মনে হয় ফাঁকা। সবার ব্যথার কথা আমাকে বলে, কিন্তু আমার ব্যথার কথা বলার জায়গা নেই। মা আমাকে অকারণ কত বকতেন, তবু মাকে ভাল লাগতো, আমার একটা আশ্রয় ছিল। এখন যেন মনে হয় নিরাশ্রয়। গোপাল ছিল, সে আমার মনের অবস্থা খুব বুঝতো। আমার যখন মনটন খারাপ দেখতো, আমার কাছ থেকে নড়তে চাইতো না। নানারকম গল্পটল্প ক'রে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতো। হয়তো বিজ্ঞানের কোন নূতন আবিষ্কার-সম্বন্ধে গল্প সুরু ক'রে দিতো, দেশ-বিদেশের কত রকমারি খবর বলতো। ওর ওই প্রচেষ্টা দেখে আমার ভাল লাগতো।

মাসীমা ব্যথিত দৃষ্টি মেলে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে সুধীরদা (দাস) এসে কারখানার কাজকর্ম্ম-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জেনে গেলেন। সুধীরদা একটা কাজে গরমিল ক'রে ফেলেছেন তাই শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—শালা তেইশ মারিছে কামের।

সুধীরদা লজ্জিত হ'য়ে বললেন—এখন গিয়ে ঠিক ক'রে ফেলব। আমি আগে আপনার কথা ভাল ক'রে বুঝতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝে কামে হাত দিতি হয়।

এরপর মাসীমা তখনকার মত বিদায় নিলেন।

কেষ্টদা—Psychology-তে (মনোবিজ্ঞানে) আছে যে ছেলেপেলেদের এক-এক বয়সে, এক-এক instinct (সহজাত সংস্কার)-এর উদয় হয়, সেগুলি আবার বেশী দিন স্থায়ী হয় না, শিক্ষার ক্ষেত্রে সেগুলিকে কেমনভাবে কাজে লাগান যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই যেটা জেগে ওঠে, তখন-তখনই সেটাকে সত্তা-সম্পোষণী রকমে পোষণ দিতে হয়। অনেক সময় জোড়া-জোড়া আসে, যেমন আগে সাহসিকতা, তারপর ভয়। সাহসিকতার সংস্কারকে পোষণ দিলে ভয়ের সংস্কার আর তেমন মাথা-তোলা দিতে পারে না। এক সময় হয়তো গড়ার সংস্কার

জাগলো, তারপর হয়তো ভাঙ্গার সংস্কার জাগে। গঠনপ্রবৃত্তি যখন জাগে, তখন নানারকম সুযোগ দিতে হয়। হয়তো কাঠ এনে দিলেন, হাতুড়ি, বাটাল এনে দিলেন, তাই দিয়ে একটা পিঁড়ি তৈরী করলো। শক্ত কাগজ এনে দিলেন, তাই দিয়ে ঘর বানালো। মাটি দিয়ে একটা পুতুল তৈরী করলো, রং এনে দিলেন, তাই দিয়ে মনোমত ক'রে রং চড়ালো। একটা ছবি কিভাবে বাঁধাতে হয়, শিখিয়ে দিলেন। একটা কলসী ফুটো হ'য়ে গেছে, তা' ঝালাই করতে হয় কিভাবে, কারিগরকে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। বই বাঁধান, জামাকাপড় সেলাই করা, জামায় বোতাম লাগান, ঘড়ি মেরামত করা, টর্চ্চ সারা, বাগানে বেড়া দেওয়া, রাজমিস্ত্রীর কাজ—সুযোগ-সুবিধামত নিত্য প্রয়োজনীয় কত কাজই তখন শেখাতে পারেন। ঐ বিশেষ সংস্কার সজাগ থাকায় তখন গঠনমূলক যে-কোন কাজ শেখাতে গেলে সে গোগ্রাসে তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে চেষ্টা করবে। আর, ঐ কাজগুলি ভাল ক'রে আয়ত্ত করার প্রয়োজনে তাকে পুঁথিগত যা'-কিছু পড়তে বলেন, তা'ও সে আগ্রহের সঙ্গেই পড়বে। আবার, ঐ গঠন-প্রবৃত্তিকে যদি পুষ্ট হ'তে না দেন, পরে হয়তো ভাঙ্গার প্রবৃত্তি প্রবল হ'য়ে উঠবে। ঐ ভাঙ্গন-প্রবৃত্তি যদি প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখনও সেটাকে লাভাবহভাবে কাজে লাগাতে হয়। ধরেন, তাকে দিয়ে জঙ্গল সাফ করালেন, প্রয়োজনীয় জায়গায় একটা গর্ত্ত খোঁড়ালেন, একটা ঘর একভাবে সাজান আছে, জিনিসপত্রগুলি ওলট-পালট ক'রে সুরুচিসম্পন্ন ক'রে অন্যভাবে সাজাতে বললেন, যা'তে জায়গার অনটন না হয়, চলাফেরার অসুবিধা না হয়, অথচ দেখতে সুন্দর হয়। হয়তো দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য আছে, সেই মনোমালিন্য ভেঙ্গে দেবার কাজে তাকে নিযুক্ত করলেন। এইভাবে যা'-কিছু প্রবৃত্তি ও সংস্কারকে জীবনীয় রকমে ব্যবহার করবার কায়দা শিখিয়ে দিতে হয়। এইজন্য শিশু-শিক্ষকদের দায়িত্ব খুব বেশী। তাদের সর্ব্বদা তরতরে, সজাগ ও অনুসন্ধিৎসু থাকতে হয়, অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে চলতে হয়, উপযুক্ত মুহূর্ত্তে profitable instinct (লাভজনক সংস্কার) মাফিক কাজ করিয়ে ছেলেপেলেদের habit (অভ্যাস) form (গঠন) ক'রে দিতে হয়, সেইটে লেখাপড়া শেখানর ব্যাপারে কাজে লাগাতে হয়। যেমন, আরোহণ-আগ্রহের দরুন ছেলে বেড়া বেয়ে উঠতে চাচ্ছে, তখন মারধর ক'রে তাকে থামিয়ে না দিয়ে ধাপে-ধাপে বেড়া বেয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে যদি তাকে ১, ২, ৩, ৪ গোণা শিখিয়ে দেওয়া যায়, একসঙ্গে দুই কাজ হ'য়ে যায়। মা'র উচিত ৫।৭ বছরের মধ্যে ছেলের অভ্যাস, ব্যবহার, ঝোঁকসই ক'রে দেওয়া। মানুষের একটা প্রধান প্রবৃত্তি হ'লো অর্জ্জন-প্রবৃত্তি। এই অর্জ্জন-প্রবৃত্তির দরুনই মানুষ শিখতে পারে, কাজকর্ম্ম করতে পারে, আহরণ

করতে পারে। তাই, আগের কালে যে ছাত্রেরা ভিক্ষা ক'রে, আহরণ ক'রে গুরুকে খাওয়াতো এবং তাঁর প্রসাদ খেয়ে জীবন ধারণ করতো, এ একটা মস্ত জিনিস ছিল। তখন তারা শিখতো, কেমন ক'রে পরিবেশের সেবা করতে হয়, পরিবেশকে জীবনের সহায়ক ক'রে তুলতে হয়। মানুষের বাস্তব অভাব ও প্রয়োজনের সঙ্গে তারা পরিচিত হ'তো এবং তার পূরণে তারা যত্নবান হ'তো, এমনি ক'রে বস্তু ও বিষয়ের সম্পর্কে তাদের কার্য্যকরী জ্ঞানের অধিকারী হ'তে হ'তো। তা'ছাড়া, মানুষকে খুশি ক'রে আহরণ করতে হ'তো ব'লে তারা শিখতো, কেমনভাবে মানুষ নিয়ে চলতে হয়। এর জন্য অনেকখানি আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হ'তো। কারণ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা যার নেই, সে অপরকেও নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিজের অনুকূল ক'রে তুলতে পারে না। এমনি ক'রে তাদের ব্যক্তিত্ব বেড়ে উঠতো। তাই, আপনারা শিক্ষার মধ্যে ইষ্টভৃতি জিনিসটা ভাল ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারেন এবং ইষ্টভৃতি যদি ছেলেমেয়েরা নিজেদের আহরণের উপর দাঁড়িয়ে করতে অভ্যস্ত হয়, তখন দেখবেন তাদের মাথা কতখানি খুলে যায়। শুধু ইষ্টভৃতি নয়, পিতামাতা ও শিক্ষককে দেওয়াবার অভ্যাসও করতে হয়। মা'র বলা উচিত—ছেলে যা'তে বাবাকে কিছু দেয়, বাবার বলা উচিত—ছেলে যা'তে মা'কে কিছু দেয়। আবার, উভয়ের বলা উচিত ইষ্ট ও শিক্ষককে দেবার কথা। প্রত্যেক বাড়ীতে-বাড়ীতে কিছু-কিছু কুটির-শিল্পের ব্যবস্থা রাখাই ভাল। ছেলেপেলেদের বলতে হয়, তোমরা এমনভাবে কাজ কর, যা'তে তোমাদের কাজের আয়ের উপর দাঁড়িয়ে ইষ্টভৃতি করতে পার। একটু বড় যারা তাদের হয়তো এক কাঠা জমিতে আলুর চাষ করতে দিলেন, দিয়ে বললেন—আলু চাষের নিয়ম-কানুন ভালভাবে জেনে নিয়ে ভাল ক'রে চাষ কর, এই জায়গাটুকুর ফসল হবে তোমাদের ঠাকুর-পূজার অর্ঘ্য। এমনিভাবে ছেলেবেলা থেকে দায়িত্ব নিয়ে শ্রেয়ের জন্য যদি পরিশ্রম করতে শেখে, লাভজনকভাবে কাজ সুসম্পন্ন করতে শেখে, তা'তে যে অভিজ্ঞতা জন্মাবে, যে আত্মপ্রত্যয় জন্মাবে, তা' পরীক্ষা পাশের থেকে ঢের দামী।

কেষ্টদা—ছেলেদের মধ্যে পরাক্রম জিনিসটা ফুটবে কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা যা'তে অন্যায় বা ইষ্টবিরোধী কোনকিছুর সঙ্গে আপোষ-রফা না করে, তেমনভাবে তাদের প্রবুদ্ধ করতে হয়। অবশ্য এই প্রতিরোধ জিনিসটা যত হৃদ্য হয়, ততই ভাল। ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক বল, সাহস, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি যা'তে বাড়ে তেমনতর খেলাধূলা ও কাজকর্ম্মের প্রবর্ত্তন করতে হয়। ছেলেরা কিছুতেই যেন না দমে, বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হ'য়ে তাদের সম্বেগ যেন আরো রুদ্রদুর্ব্বার হ'য়ে ওঠে। বেশী কিছু না, কাজ-

কর্ম্মে, কথায়-বার্ত্তায়, ভাবনা-চিন্তায় স্বতঃ-অনুজ্ঞার কথাগুলি যদি অভ্যস্ত ক'রে দিতে পারেন, তাহ'লে দেখবেন, প্রত্যেকের চেহারার মধ্য-দিয়ে জেল্লা ফুটে বেরুবে। আর, military training (সামরিক শিক্ষা) ছেলেদের কিছু-কিছু দেওয়া ভাল।

সবাই এখন আনন্দ-মকরন্দ পানে মত্ত। একটা গভীর ভাবতন্ময়তায় সকলের মন-প্রাণ আচ্ছন্ন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ দ্যুতিদীপ্ত—একটা অমোঘ আকর্ষণে তিনি যেন বিশ্ব-দুনিয়াকে টানছেন শ্রীভগবানের পানে। তাঁর কাছে এসে বসলেই মন সক্রিয় অন্তর্মুখীনতায় নিলীন হ'য়ে উঠতে চায়, অন্তরের সকল জড়তা ভেদ ক'রে নামের প্রবাহ উৎসারিত হ'য়ে চলে লীলায়িত গতিভঙ্গিমায়। এই অমৃতসায়রে অবগাহন ক'রে মানুষের সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়, বাঁচার প্রলোভন বেড়ে ওঠে দুরন্ত বেগে।

আগ্রহমদির হ'য়ে তাই সবাই শুনছেন তাঁর অমিয়-কথন।

কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—গীতায় আছে 'মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখ-দুঃখদাঃ, আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।' এই ধরণের আরো কত শ্লোক আছে। শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, ভাল-মন্দ এ-সবের আলাদা-আলাদা বোধ কি থাকবে না? এর প্রকৃত অর্থ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যোগ হ'লে সত্তা ও বিষয়ের বোধ ফুটে ওঠে। সাধারণতঃ অনুকূলের প্রতি আসে অনুরাগ, প্রতিকূলের প্রতি আসে বিরাগ। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে আমরা চলি। তাই অনুকূলের দিকে ঝুঁকে পড়ি, প্রতিকূলের বিদ্বেষ পোষণ করি। অনেক সময় প্রবৃত্তির অনুকূল ও সত্তার প্রতিকূল যা' তা'তে আকৃষ্ট হই, এবং প্রবৃত্তির প্রতিকূল ও সত্তার অনুকূল যা' তার প্রতি বিদ্বিষ্ট হ'য়ে চলি। এতে ক'রে আমাদের balance (সাম্য) নষ্ট হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—সব দেখে যাও, utilize (সদ্ব্যবহার) কর, ভেসে যেও না, কোনটার সঙ্গে মিশে যেও না, সবটাকে সমানভাবে ইষ্টস্বার্থ-ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিয়ে equally fulfilling to your entity (সমভাবে তোমার সত্তার পরিপূরক) ক'রে তুলতে চেষ্টা কর। যেখানে তা' সম্ভব নয়, সেখানে তাকে বর্জ্জন বা নিরোধ করতে তিনি নিষেধ করেননি। তাহ'লে অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে অত চেষ্টা করবেন কেন? তিনি চান সাম্য-সিদ্ধ চলন, সাম্য মানে অবৈকল্য অবস্থা, অচ্যুত অবস্থা। ইষ্ট থেকে মন বিচ্যুত হ'লে, তখন সে অবস্থার দাস হয়, সুখ-দুঃখ কোনটাকেই সত্তাপরিপোষণী ক'রে তুলতে পারে না। সাম্য মানে এই নয় যে, মানুষ তিতোকে তিতো ব'লে, মিষ্টিকে মিষ্টি ব'লে বোধ করবে না, সেটা তো অসুস্থতার লক্ষণ, যথাযথ বোধ-

শক্তি না থাকলে তো সে submman (অপমানব)। ধর্ম্ম করা মানে ইন্দ্রিয়-গুলিকে, বোধ-বিবেচনাকে নিথর ক'রে তোলা নয়, ধর্ম্মের অনুপালনে সেগুলি বরং তাজা ও তরতরে হ'য়ে ওঠে, কিন্তু বশে থাকে। বিবশ বা বিবোধ হওয়া কথা নয়, তীব্র বোধই চাই, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে চাই সহনশীলতা। স্নায়ুর স্থৈর্য্য যদি না থাকে, তবে আমরা সুখ-দুঃখ সব-কিছুতেই দিশেহারা, আত্মহারা হ'য়ে পড়ি। আর, জীবনধারণ করতে গেলে অনিবার্য্যভাবে কতকগুলি দুঃখ আসবেই। আমাদের সহ্য, ধৈর্য্য যদি না বাড়ে, তবে ঐ দুঃখ দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে। তাই বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সহ্যশক্তি বাড়াবার কথাই বলা হয়েছে।

কেষ্টদা—দুঃখকে অনিবার্য্য ব'লে মেনে নেওয়া তো মানুষের একটা পরাজয়, তাই তো বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ নানাভাবে দুঃখকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মও তো সেই চেষ্টা করছে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সঙ্গে তো কোন বিরোধ নেই। মানুষের অস্তিত্বের ধৃতিকে যা' পুষ্ট করে তাই তো ধর্ম্ম। ধর্ম্মের কাজই হ'ল অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতাকে অতিক্রম করা, কিন্তু মানুষ জ্ঞানের রাজ্যে যতই অগ্রসর হোক, beyond (অজ্ঞাত) চিরকালই থাকবে, এবং তার-জন্য দুঃখও থাকবে। কিন্তু মানুষ যদি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনির্ভরশীল হ'য়ে দুঃখকে এড়াতেই চায়, তবে তার আয়ত্তে আছে বিধাতার দানস্বরূপ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, অর্থাৎ তার প্রাণবন্ত দেহযন্ত্র, সেটারই বা সে সদ্ব্যবহার করবে না কেন? তাই দেহ-মনকে সুস্থ, সাড়াশীল ও সহনপটু ক'রে তোলার অনুশীলন বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন সম্পূর্ণতা লাভ করে না। এক হিসাবে ধর্ম্মকেও আপনি বলতে পারেন বিজ্ঞান।

কেষ্টদা—আপনি সাড়াশীলতার কথা বলছেন, কিন্তু বহুত্বের বোধকে ঐক্যে পর্য্যবসিত করাই নাকি অনুভূতির পরাকাষ্ঠা? সবই যখন এক তখন তা' অনুভব করার জন্য এত মাথা-ঘামান কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর (মাথা দুলিয়ে হেসে বললেন)—তাই তো কথা। সেই এক কোথায়, কী পরিক্রমায়, কী পরিণতি নিয়ে, কী বৈশিষ্ট্যে, কোন্ সংস্থিতিতে, কেমনভাবে বিরাজ করছে, এবং সৃষ্টির বিচিত্র বিকাশের মধ্যে ঐক্য-সঙ্গতির সূত্রটি কী ও কোথায়, তা' বুঝতে গেলে সব একাকার ক'রে ফেললে হবে না। প্রতিটি যা'-কিছুর সংস্থিতি, সংগঠন ও বৈশিষ্ট্য বুঝতে হবে। তা না হ'লে সব এক, এ কথার কোন মানে নেই। বৈশিষ্ট্য-বিবর্জ্জিত পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসাড় ঐক্যবোধ কিন্তু জ্ঞান বা অনুভূতির লক্ষণ নয়।............

শাস্ত্রগুলির সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়ে আপনারা যদি বই-টই লেখেন, তাহ'লে ভাল হয়। এত misconception (ভুল বোধ) চারিয়ে আছে তা' বলবার নয়।

কেষ্টদা—আমরা লিখতে গেলে গোলমাল ক'রে ফেলব। তার চাইতে আপনার কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বন ক'রে প্রশ্নাদি যদি করি এবং আপনি তার উত্তর যদি দেন, সেই ভাল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাও করতে পারেন। তবে আপনারা করলেও লাইন-মতই হবে।

এমন সময় বঙ্কিমদা (রায়) একবার এদিকে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বঙ্কিমদাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে, কী খবর ?

বঙ্কিমদা—ভাল। আপনি যে-কাজের কথা বলেছিলেন, সে-কাজ অনেক-দূর অগ্রসর হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ ঘুরিয়ে কী যেন ইঙ্গিত করলেন।

বঙ্কিমদা হাসতে-হাসতে বললেন—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—বঙ্কিম যদি কারও সঙ্গে সহজভাবে কথা বলে, তাহ'লে সে নতুন লোক হ'লে মনে করবে—ভদ্রলোক আমার উপর চ'টে গেল কেন ? কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা হ'লে মানুষ পরে বোঝে যে, ওর ঐ লাঠেলি ধাঁজের মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা আছে। আমরা অনেক সময় তাই মানুষ চিনতে ভুল করি, মোলায়েম কথা শুনলেই মনে করি ভাল লোক, আর রোখা তীব্র রকম দেখলেই ভাবি খারাপ লোক। এইভাবে ঠ'কে যাই।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—মানুষ চেনার সহজ উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হয়, কথার সঙ্গে কাজ ও ব্যবহারের মিল আছে কিনা। আর দেখতে হয়, কথাবার্ত্তার মধ্য-দিয়ে সে নিষ্ঠাকে অটুট রেখে মানুষকে প্রীত ক'রে প্রীত হ'তে চায়, না, হামবড়ায়ী চালে নিজের প্রাধান্যকে জাহির করতে চায়। ভালমানুষের একটা প্রধান লক্ষণ হ'লো, সে আদর্শে অটুট থেকে, পরিবেশকে আনন্দ দিয়ে আনন্দ পেতে চায়। নিজের অহমিকার বালাই নিয়ে সকলকে আঘাত করে না। একরকম আছে ব্যক্তিত্বহীন বিনয়, সব কথাতেই সায় দিয়ে যায়, সে কিন্তু ভাল নয়। সৎব্যক্তিত্বসম্পন্ন যারা, তারা হৃদ্য ব্যবহার ও সেবানুসন্ধিৎসা নিয়ে চললেও আদর্শকে কখনও বিসর্জ্জন দেয় না বা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফা করে না।

বীরেনদা—যারা আদর্শ গ্রহণ করেনি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ আদর্শ গ্রহণ করুক বা না-করুক, ভাল মানুষ যে, তার

মহতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবেই কি থাকবে। একটা মানুষ যদি শ্রদ্ধাহীন হয়, সে যতই হোমরা-চোমরা হো'ক, ধ'রে নিতে পার, তার ভিতরে গোলমাল আছেই।

কেষ্টদা—মহৎ ব'লে সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাদের কা'রও মধ্যে যদি কৃষ্টিবিরোধী চলন দেখি, তাহ'লেও কি তাঁকে শ্রদ্ধা করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহৎ লোক কখনও কৃষ্টি-বিরোধী হ'তে পারেন না। যাহো'ক, কোন লোক যদি জনচিত্তে শ্রদ্ধার আসন অধিকার ক'রে থাকেন, এবং তাঁর যদি গুরুতর ত্রুটিও থাকে এবং সমাজের হিতের জন্য তাঁর সমালোচনা করা যদি প্রয়োজন হয়, তাও সশ্রদ্ধভাবে করা সমীচীন। শ্রদ্ধা জিনিসটাই মানুষের সম্বল, তাকে কখনও আচমকা থেঁতলে দিতে নেই। তাকে যত সার্থকতায় গতিশীল ক'রে তোলা যায়, ততই ভাল।

একটি মা বাপের বাড়ী যাবার জন্য অনুমতি নিতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিন-টিন দেখেছিস্ তো?

উক্ত মা—না। আপনি বললে আর দিন দেখা লাগবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না! কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে যাবি বিদেশ-বিভুঁইয়ে, ভাল দিন দেখে যাওয়া ভাল। আর, সকাল-সকাল চ'লে আসিস্ কিন্তু।

উক্ত মা—আচ্ছা। মা'র কাছে যেয়ে এক মস্ত অসুবিধা, ছেলেপেলেদের মাছ খাওয়াবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (একটু রাগত কণ্ঠে) বললেন—নাতির যদি ভাল ক'রে কর্ম্ম নিকেশ করতি না পারে, তাহলি দিদিমার আদরের মাহাত্ম্যি কী? তুই ও-সব হুচকিতে ভুলিস্ না কিন্তু, খুব সাবধানে রাখিস্।

মা-টি বললেন—হ্যাঁ। আমি লক্ষ্য রাখব।

শরৎদা—সমাজবাদীরা সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে না, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ততটা মানে না, পরিবেশের প্রভাবের উপরই খুব জোর দেয়, বলে, ব্যষ্টি পরিবেশেরই সৃষ্টি, তা'ছাড়া ব্যক্তি হিসাবে আদর্শ মানে না, রাষ্ট্রের জন্যই যা'-কিছু করতে বলে। তাদের কথা হ'লো—প্রত্যেকেই যদি রাষ্ট্রের জন্য আপ্রাণ খাটে, তাহ'লেই তো রাষ্ট্রের সম্পদ্ বাড়ার দরুন সবার অবস্থা ভাল হ'তে পারে, অথচ ধনতন্ত্রের সৃষ্টি হয় না। এ-সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমি অজান মুখ্যু মানুষ, আমি কি আপনাদের বাদ-টাদ অতো বুঝি? কিন্তু মানুষের সত্তা কি কয়, সত্তাবান আমি সেটা কিছু-কিছু টের পাই। সত্তার আছে বাঁচার ইচ্ছা, উপভোগের ইচ্ছা। জীবনের ধর্ম্ম হ'লো কাউকে উপভোগ করিয়ে উপভোগ করা, এবং এর ভিতর-দিয়েই সে বাড়ার

পথে এগিয়ে যেতে চায়। তা'ছাড়া তার কোন সার্থকতা নেই। তার সব কর্ম্ম ও অর্জ্জন সেইজন্য। যাঁকে উপভোগ করাতে গিয়ে তার এবং তার পারিপার্শ্বিকের বাঁচা-বাড়ার প্রয়োজন পরিপূরিত হয়, সেই মানুষটিই আদর্শ। নচেৎ যাকে-তাকে খুশি করতে গেলে সে প্রবৃত্তির দাস হ'য়ে প'ড়বে, তা'তে তার এবং তার পারিপার্শ্বিকের জীবনবৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হবে। আর, স্বয়ং ও পারিপার্শ্বিক এ দুইয়ের মধ্যে বিভেদ না থাকলে পারিপার্শ্বিকের জন্য করবে কে ও করবে কি ক'রে? অন্যের কথা ভাবি আমার নিজের মাপকাঠি দিয়ে। 'তুমি' বোধ না থাকলে যেমন 'আমি' বোধ থাকে না, 'আমি' বোধ না থাকলেও তেমনি 'তুমি' বোধ থাকে না, সব লেপাপোছা হ'য়ে যায়। আর, বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ যদি না হয়, তবে জাত দেউলে হ'য়ে যায়। ব্যষ্টি নিয়েই তো সমষ্টি। ব্যষ্টিগুলির জীবন যদি সার্থক না হয়, তাহ'লে লাভবান হবে কে? সে বিধান ও ব্যবস্থা তবে কার জন্য? মানুষের জন্য রাষ্ট্র, না, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ? প্রত্যেকটি মানুষ, প্রতিটি তুমি-আমি যা'তে পরিপূরিত হ'তে পারি—অন্যের সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে,—তেমনভাবেই তাই রাষ্ট্রের কাঠামো গ'ড়ে তুলতে হবে। এরই ভিত্তিস্বরূপ ঋষিরা বর্ণাশ্রমের বিধান দিয়েছিলেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ণাশ্রম হ'লো প্রাকৃতিক বিধান, আর সমাজ-জীবনে সেই প্রাকৃতিক বিধানকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন ঋষিরা। বর্ণাশ্রম ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে, জন্মগত বৈশিষ্ট্যানুপাতিক কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন এর একটা প্রধান কথা, তাই বৃত্তি-হরণ সেখানে মহাপাপ, সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকলেও মানুষ উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা'-তা' ক'রে সমাজের ক্ষতি করতে পারে না। তা'তে সে সমাজে পতিত হয়। আবার, এই বৈশিষ্ট্যের ধারা বংশপরম্পরায় যা'তে বজায় থাকে, সেজন্য চাই বিধিমাফিক বিবাহ। আরো বর্ণাশ্রমের একটা মুখ্য জিনিস হ'লো দ্রষ্টাপুরুষের নিকট দীক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক শিক্ষা। এ-সবগুলি যদি ঠিকভাবে চালান যায়, তবে ধন-সম্পদের উপর ব্যক্তিগত অধিকার থাকলে অসুবিধার কারণ কী হ'তে পারে তা' তো বুঝি না। বরং আমার মনে হয়, ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যানুপাতিক স্বাতন্ত্র্য, শিক্ষা, কর্ম্ম, অর্জ্জন, সংগ্রাম ও উপভোগ থাকলেই তার নিজত্ববোধ গজাতে পারে সুষ্ঠুভাবে। সে-বোধই ছড়িয়ে প'ড়ে বিস্তারলাভ করে, চারিয়ে যায় সবার মধ্যে, কিন্তু নিজের জন্য করা না থাকলে অপরের জন্য করারও প্রবৃত্তি থাকে না। নিজের সম্বন্ধে অনুভূতি না গজালে অন্যের সম্বন্ধে অনুভূতি গজাবে কী ক'রে? আর, স্বতঃ-দায়িত্বে নিজের সামর্থ্যের সদ্ব্যবহারে মানুষ যদি শ্রেষ্ঠকে নিত্যনূতন উপঢৌকন দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তবে তার কর্ম্মশক্তি বাড়বে কিসে?

সে ভূতের বেগার খাটতেই বা যাবে কেন ? জনতা, রাষ্ট্র, দেশ, কোন বাদ বা পদ মানুষ বোঝে না, সে চায় একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁকে খুশি করে সে খুশি হ'তে পারে। তাই, সমগ্রের মঙ্গলের মূর্ত্ত প্রতীক রক্তমাংস-সঙ্কুল ইষ্ট বা বাঞ্ছিতের প্রয়োজন। আর, তিনিই আমাদের ইষ্ট বা বাঞ্ছিত—যার দ্বারা আমরা nurture (পোষণ) পাই ও fulfilled (পরিপূরিত) হই towards becoming (বিবর্দ্ধনের দিকে)। ইষ্ট থাকলে মানুষ আর তখন পরিবেশের পুতুল হয় না, সে নিজে ইষ্টের টানে চ'লে সবাইকে সেই টানে তুলে ধরে, Ideal, individual ও environment (ইষ্ট, ব্যষ্টি ও পরিবেশ)-এর মধ্যে concordance (সঙ্গতি) নিয়ে আসে। প্রত্যেকটি individual (ব্যষ্টি) grow করে (বেড়ে ওঠে) according to his instincts in harmony with the environment (তার সহজাত সংস্কারানুপাতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে)। আর এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি যতই হো'ক না, তার অধিকাংশ যদি স্বস্ত্যয়নীর ইষ্টোত্তর রূপে থাকে, তা'তে লাভ বই ক্ষতি নাই। Individual (ব্যক্তিগত) ও social evolution (সমাজগত বিবর্ত্তন)-এর মূল এখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার প্রস্রাব করতে উঠলেন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাদের অনেকেই গাত্রোত্থান করলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার বাড়ীর মধ্যে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গিয়ে বসলেন। সেখানে টুকটাক ঘরসংসারের কথাবার্ত্তা হ'লো। ওখান থেকে এসে মাতৃ-মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় বসলেন।

দোখলকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—লেবু খাবা নাকি পরামাণিক ?

দোখল—তা' খাবার পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি মাকে বললেন—বড়বৌয়ের কাছ থেকে চারটে কমলা নিয়ে আয় তো।

কমলা নিয়ে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলি হরিপদদার হাতে দিতে বললেন। হরিপদদাকে ইঙ্গিত করতেই তিনি সেগুলি দোখলকে দিলেন।

ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী) এসেছেন কলকাতা থেকে, শ্রীশ্রীঠাকুর যুদ্ধের খবর শুনছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ধীরেনদাকে বললেন—তুই আজকাল গানটান করিস্ না ?

ধীরেনদা—বিশেষ না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গানটান করা ভাল।

ধীরেনদা—প্রাণের থেকে গান না আসলে, গাইতে ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাইতে-গাইতে আবার প্রাণ খুলে যায়।

ধীরেনদা—মাঝে-মাঝে অবসন্নতা চেপে ধরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবসন্নতা যতই আসুক, ওকে আমল দিতে নেই। ওতে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। জোর ক'রে ওকে ঝেড়ে ফেলে স্ফূর্ত্তিযুক্ত মেজাজে চলতে হয়। তুমি ঋত্বিক্, তোমার কাজ হ'লো মানুষের প্রাণে আশা, ভরসা, উদ্দীপনা সঞ্চার করা। তুমি নিজেই যদি ঝিমিয়ে পড়, অন্যকে চেতাবে কি ক'রে। তোমার এই পরম দায়িত্বের কথা স্মরণ ক'রে সর্ব্বদা ঐ তালে থাকবে। যাজনের উপর যদি থাক এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে যজন যদি ঠিকমত কর, তাহ'লে দেখবে মন চাঙ্গা থাকবে। আর, শরীরটা যা'তে ভাল থাকে, বিশেষতঃ পেটটা, সেদিকে খুব নজর রাখবে। রোজ খানিকটা বেড়াবে।

ধীরেনদা—ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (দীপ্ত ভঙ্গিমায়)—তোর শালার অতো উদ্বেগ দিয়ে কাম কী? চাকরী-বাকরীর মধ্যে ফাঁকে-ফাঁকে যতখানি পারিস্, পরমপিতার কাজ কর্। নারায়ণের সেবা নিয়ে যে চলে, লক্ষ্মী কি কখনও বেজার হন তার উপর? তুই খাবি-দাবি, স্ফূর্ত্তি করবি, দোয়াড়ে যাজন করবি, নাম দিবি আর যজমান-গুলিকে ঠেলে তুলতে চেষ্টা করবি। যতই কও, এই বামনাই কামের মত কাম নেই। বামুন হ'লো মানুষের রাজা। তুমি ভাবিছ কি? ক'রে দেখ না। তখন রাস্তায় বেরোলে তোমার পা'র ধূলি নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে, যদিও তুমি তা' চাইবা না। পরমপিতা ধ'রে আছেন তোমাদের, ঘিরে আছেন তোমাদের, শতহস্তে আগলে রাখছেন, অবান্তর দুর্ভাবনা না ভেবে, যা' করণীয় অবিচ্ছেদভাবে ক'রে যাও।......পরমপিতা তো দয়া করবার জন্যই ব্যস্ত, তোমাদের কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে তাঁকে সেই সুযোগটুকু দাও, সূত্রটুকু দাও, যার ভিতর-দিয়ে তিনি আশ-মিটিয়ে করতে পারেন তোমাদের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু-একটু থেমে-থেমে জোর দিয়ে-দিয়ে কথাগুলি বলছেন। সাক্ষাৎ লোকত্রাতা যেন বরাভয়-হস্তে আর্ত্ত মানবকুলকে পরম আশ্বাসের বাণী শোনাচ্ছেন। তাঁর বদনমণ্ডল দিব্য বিভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে—তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে আশা, ভরসা, উদ্দীপনা, বল, বীর্য্য, বিশ্বাসের অনির্ব্বাণ ধ্রুবজ্যোতিঃ।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক চেয়ে খেলেন। এরপরে টানটান হ'য়ে চৌকিতে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শুয়ে আপন মনে গুনগুন ক'রে গান গাইতে লাগলেন। চোখে-মুখে তখনও একটা গনগনে ভাবের আবেগ।

এমন সময় বাইরে রোদের ঝলক দেখা দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—এ যেন প্রিয়ার মুখের চপল হাসির মত।

একটি মা তাঁর স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার-সমন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হেসে বললেন—জানিস্‌ই তো ওর স্বভাব। ও রাগী হ'লেও কিন্তু মানুষ ভাল। তোকে ভালও বাসে খুব। তুই যদি তিন দিনের জন্যও কোথাও যাস্, তাহ'লেও কিন্তু ওর ভাল লাগে না। যে সময় চ'টে যায়, তখন তুই কোন কথা কো'স্ না। তোর উপর রাগের ঝাল মিটিয়ে যদি শান্তি পায়—পা'ক, সেই বা মন্দ কী? দোষ-গুণ সবটা নিয়ে মানুষটাকে যদি ভালবাসিস্, সহানুভূতির সঙ্গে স'য়ে-ব'য়ে নিস, তার মেজাজ বুঝে যদি চলিস্, দেখিস্, তোর ভালবাসার দৌলতে আস্তে-আস্তে সে হয়তো শুধরেও যেতে পারে।

আবার, ছেলের ভবিষ্যতের দিকে চেয়েও তোমাকে অনেকখানি হুঁশিয়ার হ'য়ে চলা লাগবে। তোমাদের যদি ঝগড়া করতে দেখে, সেটা তার পক্ষে খুব খারাপ হবে। তোমাকে যদি দেখে যে ওর বাবা তোমাকে গালাগালি করা সত্ত্বেও তুমি খুশি, তাহ'লে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে, আর তোমার স্বামীভক্তি তার মধ্যে পিতৃভক্তি সঞ্চারিত ক'রে দেবে। শ্রদ্ধা জিনিসটাই এমন যে তা'তে দোষদর্শন থাকে না, অনুযোগ থাকে না, প্রত্যাশা থাকে না, অমনতর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সংস্পর্শে কারও বাস্তব দোষ থাকলেও, তা' ছুটে পালায়।

উক্ত মা—আমাকে যখন উনি বকেন, তখন ছেলেটার মুখ কালা হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার মুখ কালা হয় ব'লে তার মুখ কালা হয়। অবশ্য তোমার সঙ্গে ছেলের সামনে অমনতর ব্যবহার তার না করাই ভাল। ওতে ছেলে-পেলেদের অনেক সময় বাপের প্রতি বিদ্বেষভাব জাগে। যেমন ক'রেই হো'ক যেখানে শ্রদ্ধা থাকা উচিৎ সেখানে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, শ্রদ্ধা যদি ব্যাহত হয়, সেটা বড় ক্ষতিকর হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে তুমি যদি আবার তেমন চতুর হও, স্বামীর প্রত্যেকটি কথা ও ব্যবহারের এমন সমর্থনী ব্যাখ্যা দিতে পার ছেলের কাছে যে, ছেলের শ্রদ্ধা আরো উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারে। তাই বলছিলাম, সত্যিকারের শ্রদ্ধা যে কী করতে পারে আর না পারে তার লেখাজোখা নেই।

উক্ত মা—ইষ্ট-বিরোধী চলন যদি দেখি, তাহ'লেও কি সমর্থন করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য যদি ঠিক থাকে, আর সেই সঙ্গে চলায় যদি ভুল থাকে, তবে ঐ ভুল চলনকে কিন্তু ইষ্টবিরোধী চলন বলা ঠিক হবে না। সে ভুল-চুক সবারই আছে। কোন একটা ভুলকে যদি ভুল ব'লেও বলতে হয়, তা'ও বলার এমন কায়দা আছে, যা'তে মানুষটার মহত্ত্ব আরো ফুটে ওঠে।

ও শেখান যায় না, ভিতরে ভাব থাকলে কথা আপনা থেকে জোয়ায়। তোমাদের নামে আমার কাছে যদি কেউ নিন্দা করতে আসে, আর আমি যদি জানি যে সে সত্য কথাই বলছে, তা'ও তখন তোমাদের এমন ক'রে তুলে ধরি যে, ঐ দোষটা যেন নিতান্তই নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর। তাই ব'লে আমি কি দোষকে সমর্থন করি? তোমাদের প্রতি আমার যে স্বার্থবোধ, তাই-ই আমাকে অমন ক'রে বলায়। ভালবাসা থাকলে ভাল যা'তে হয়, তাই-ই করা আসে, বলা আসে। অবান্তর সমালোচনার কণ্ডূয়ন থাকে না তখন।

৯ই পৌষ, বুধবার, ১৩৪৮ (ইং ২৪।১২।৪১)

রাত পোহাতে না পোহাতেই তপোবনের শিক্ষকবৃন্দ এবং আরো অনেকে এসে হাজির হলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে তাসুতে বিছানায় ব'সে আছেন। সবাই আসতেই হাসিমুখে বললেন—আসেন, আপনারা না আসলে যেন নেশা জমে না। ঘুম ভাঙ্গলেই মনে হয়, কখন আপনারা আসবেন।

সবাই একে-একে প্রণাম ক'রে উপবেশন করলেন। শিশুশিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের অবতারণা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক পড়িয়ে শেখান ভাল। খেলার মধ্য-দিয়ে নামতা শেখান যায়। বাস্তব প্রয়োজনের মধ্য-দিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ বোধে এনে দিলে বোধটা এমনভাবে মাথায় গেঁথে যায় যে—কেন, কি জন্য, কোথায় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ-এর কোন্‌টা প্রয়োগ করতে হবে, সহজে বুঝতে পারে। গোড়ায় বুঝটা গজিয়ে দিতে পারলে পরে বাধে না। ধর, কুল নিয়ে বা ফুল নিয়ে আরম্ভ করলে। একজনের হাতে প্রথমে ৫টা দিলে, ৫টা দিয়ে গুণতে বললে, সে গুণে বলল ৫টা পেয়েছে, তারপর আর তিনটে দিলে, দিয়ে একসঙ্গে সব কটা মিলিয়ে ক'টা হ'লো জিজ্ঞাসা করলে, সে গুণে বলল ৮টা। এই জিনিসটা যে যোগ করা হ'লো তাকে বুঝিয়ে দিলে, প্রথমে মুখে-মুখে বললো, তারপর সেইটে লেখায় আনালে। আবার হয়তো ঐ ৮টা থেকে ২টে নিয়ে নিলে, তখন জিজ্ঞাসা করলে—ক'টা আছে বল, সে বলল ৬টা। এই জিনিসটাই যে বিয়োগ বা বাদ দেওয়া, তা' বললে। সেটা আবার লেখায় আনালে। এইভাবে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের বাস্তব প্রয়োজনটা কী, এবং কেমনভাবে তা' করতে হয় ধরিয়ে দিলে সে তা' আর জীবনে ভুলবে না। জীবনের প্রয়োজনগুলি ভাগ ক'রে বিশেষ কয়েক রকম কাজ সৃষ্টি করতে হয়। সেগুলি করতে গিয়ে যে-যে অসুবিধাগুলি আসবে,

সেগুলি কাবেজে আনবার কায়দা ধরিয়ে দিতে হয়, এইভাবে যে-সব ছেলে বেরু ক'রে দেবে, এম-এ পাশরাও তাদের কাছে দাঁড়াতে পারবে না। প্রয়োজনীয় সবরকম কাজ হাতে-কলমে শেখার ব্যবস্থা থাকলে প্রত্যেক ছেলের ঝোঁকই পুষ্ট হবে। একটা দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকলে সেটা যেমন শিখবে, সেই সঙ্গে-সঙ্গে আরো পাঁচ রকম কাজ শিখবে, তা'তে চৌকস হ'য়ে উঠবে, বিভিন্ন রকম জানা তার মূল সহজাত-সংস্কারকে আরো পুষ্ট ক'রে তুলবে। মানুষের সহজাত-সংস্কার-গুলি যথাযথভাবে পুষ্ট হ'লে, সে উপচয়ী, অনুসন্ধিৎসু, উদ্ভাবনী কর্ম্মে আনন্দ পায়, সেবাপ্রাণ হ'য়ে ওঠে, অর্থস্বার্থী না হ'য়ে মানুষ-স্বার্থী হ'য়ে ওঠে। তারা জীবনে কৃতকার্য্য হয়ই। অবশ্য, সবটার ভিত্তি হওয়া চাই শ্রদ্ধা। ছেলেদের শিক্ষা ছেলেদের মত হবে, আর মেয়েদের শিক্ষা মেয়েদের মত হবে। সুজনন-বিজ্ঞানটা মেয়েদের ভালভাবে শেখাতে হয়।

বিমলদা (মুখোপাধ্যায়)—সুজনন-বিজ্ঞান মেয়েদের কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম কথাই হ'লো, তাদের বংশ-মর্য্যাদা ও আভিজাত্য-সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা। ঐ গৌরববোধ তাদের মধ্যে এতখানি তাজা ক'রে তোলা চাই, যা'তে তারা কখনও নিকৃষ্টের কাছে আত্মদান না করে। প্রতিলোম বিয়ের পর মেয়েরা যে মনে-মনে কী নরকযন্ত্রণা ভোগ করে, তার ঢের confession (স্বীকারোক্তি) আমি শুনেছি। প্রথমে মোহের বশে হয়তো আকৃষ্ট হয়, কিন্তু যখনই স্বামী তা'তে উপগত হ'তে যায়, তখনই যেন তার অন্তরাত্মা ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার পূর্ব্বপুরুষরা সবাই একযোগে মিলে তখন যেন গিছি-গিছি ক'রে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে, সে যে কী যন্ত্রণা, তা' ব'লে বোঝাবার নয়। মানুষ আত্ম-হত্যার সময়ও বোধ হয় অতো কষ্ট পায় না। আর, প্রতিলোম সন্তানসন্ততির কী দুর্গতি হয়, তা' তো তোমাদের অজানা নয়। তাই প্রতিলোম-সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড ভীতি গজিয়ে দিতে হয়—বাস্তব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে উদ্ঘাটিত ক'রে। আর, শ্রেয়ের প্রতি সহজ টান যা'তে গজায় তাই করতে হয়। আবার, শ্রেয়কুল-সঞ্জাত উপযুক্ত স্বামী লাভ হ'লেও কেমন ক'রে তাঁর মনোজ্ঞ চলনে চলতে হয়, কেমন ক'রে তাঁর কুল-সংস্কৃতিকে, তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে সশ্রদ্ধ সক্রিয় সেবায় পুষ্ট ক'রে চলতে হয়, সে-সব তার মাথায় ধরিয়ে দিতে হয়। মেয়েদের বিয়ে মানে জন্মান্তর, স্বামীকে নিয়ে, তাঁর সংসারকে নিয়ে সে নতুন মানুষ হ'য়ে উঠবে। নিজেকে যতখানি সে স্বামীতে উৎসর্গ করতে পারবে ইষ্টানুগ রকমে, ততখানিই তার সুসন্তান লাভের সম্ভাবনা। এ উৎসর্গ মানে একটা ভাবালু রকম নয়। তার

প্রতিটি চিন্তা, চলন, বাক্য ও কর্ম্ম পূজারতি হ'য়ে ফুটে উঠবে। এই-ই হবে তার ধ্যান, জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা ; দেহে, মনে, প্রাণে, অন্তরাত্মায় সে নিজেকে যতখানি নিরলসভাবে স্বামী-তপা ক'রে তুলতে পারবে, ততই স্বামীর সদ্‌গুণগুলি সন্তানের মধ্যে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারবে—তা' সন্তানের সহজাত-সংস্কারে ও তার চরিত্রে।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় একজন এসে তার বাড়ীতে অসুখের কথা ব'লে ২৫ টাকার জন্য প্র'র্থনা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে গান ধরলেন—বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?

পরক্ষণেই বীরেনদাকে বললেন—ওঠেন আপনি। কী আর করবেন ? আপনার তো ঐ কাম।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপসোসের সুরে বলছেন—আমি দেখি, মানুষ আমার কাছ থেকে যত নেয়, তত পঙ্গু হ'য়ে পড়ে। তবু কেউ যখন অসুবিধার কথা বলে, তখন না দিয়ে পারি না। ভাবি, যদি বেঘোরে পড়ে। ভিতরে-ভিতরে কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে উঠি। কিন্তু এইভাবে দেওয়ায়-নেওয়ায় যোগ্যতা বাড়ে না, মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। অসময়ে আমার কাছ থেকে যেমন নেয় অন্যের অসময়ে তেমনি যদি স্বতঃ-দায়িত্বে দেয়, দেখে, শোনে, করে, নিজে না পারলে ভিক্ষা ক'রেও যদি করে, তা'তেও মানুষের পারগতা অনেকখানি বজায় থাকে এবং আমারও ভার একটু লাঘব হয়। কিন্তু তা' করবে না। এতে যে নিজেরই ক্ষতি করা হয়, তা' বোঝে না।

নগেনদা (বসু)—আপনি যখন বোঝেন যে, এইভাবে দেওয়ায় আমাদের ক্ষতি হয়, তখন না দেওয়াই তো ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই তো আমার দুর্ব্বলতা। তা'ছাড়া, অসুবিধার সময় নেওয়া তো দোষণীয় নয়। অন্যের অসময়ে করার বুদ্ধি থাকলেই হয়। আমি যে দিই, সেও তো পরিবেশ থেকে নিয়েই দিই, কিন্তু আমার সবসময় বুদ্ধি থাকে, যার কাছ থেকে নিই, তাকে যা'তে তাজা রাখতে পারি। এই চেষ্টা থাকার দরুন পরমপিতার দয়ায় আটকায় না। আপনারা আমার এই রকমটা দেখে এই-ভাবে চললেই পারেন। আমি তো নেংটে, কানাকড়ি বলতেও আমার সম্বল নেই। আমার আছেন আপনারা। আপনারাও তেমনি প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে উঠুন—শুধু কথায় নয়, করায়, তাহ'লে দেখবেন আপনারা প্রত্যেকেই রাজা।

নগেনদা—আপনার সঙ্গে মানুষের তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মধ্যে একটা ফাঁকিদারী বুদ্ধি আছে। আমি কি আজগবী কিছু করি। আমি যা' করি, তা' তো খোলামেলা। এবং আপনাদের প্রত্যেকেই তার মত ক'রে এটা করতে পারেন—যার যেমন সামর্থ্য সেই অনুযায়ী, করতে-করতে আবার করার শক্তি বাড়ে। আর, যতটা করবেন, ততটা হবে। আমার চলনে যদি না চলেন—যার-যার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী,—তাহ'লে আমি আপনাদের কিসের ঠাকুর? আমাকে যদি এতটুকু ভালবাসেন, তাহ'লে তো আমি যে-চলনে চলি, চলতে বলি, সেইভাবে চলার চেষ্টা করা উচিত। এই তো শ্রদ্ধা-ভালবাসার লক্ষণ। আপনারা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ছাড়বেন না, সার্থকতার পথে চলবেন না, অথচ আমাকে ঠাকুর ব'লে ভক্তি দেখাবেন, সে-ভক্তিতে আপনাদেরই বা লাভ কি? আমারই বা তৃপ্তি কোথায়? আমাকে ভালই যদি বেসে থাকেন, আমার পথে চ'লে আপনাদের ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করুন। দেখুন তা'তে কী হয়। কপটতায় কিন্তু ফয়দা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি চোখা-চোখা বাণের মত প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্ধ হ'য়ে গেল।

তপোবন বোর্ডিং-এর একটি ছেলে একখানা ছবি এঁকেছে। সেই ছবি দেখাতে নিয়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন—ও কিরে? কী আনিছিস্?

ছেলেটি বলল—একখানা ছবি এঁকেছি, তাই আপনাকে দেখাতে এনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লাস সহকারে)—দেখা! দেখা!

ছেলেটি বের ক'রে দেখাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ হইছে। আরো ভাল আঁকার অভ্যেস কর্।............ আমার হাতে দে তো!

হাতে নিয়ে চোখের কাছে এনে ও দূরে রেখে, একবার বিছানার উপর যে রোদ এসে পড়েছে, সেই রোদে রেখে আগ্রহভরে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখলেন। দেখে বললেন—বাস্তব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য যে-গুলি দেখবি, সে-গুলি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য ক'রে যদি ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে পারিস্ তাহ'লে ভাল হয়। ধর্, এখানকার সূর্য্যাস্তের দৃশ্য। দৃশ্যটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে মাথায় এঁকে রাখা চাই, পরে তখন তাকে ছবিতে রূপ দিবি। বাস্তবের সঙ্গে মিল ক'রে এইরকম কতকগুলি করা যদি থাকে, তারপর কাল্পনিক দৃশ্য আঁকতে পার। তখন সে কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যেও বাস্তবতার ছাপ থাকবে। গোড়াতেই কাল্পনিক ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক দিও না। আর, গোড়ায় ছবি দেখে ছবি আঁকার অভ্যেস না ক'রে, বস্তু

দেখে যদি ছবি আঁকার অভ্যেস করো, সে-ছবির মধ্যে তোমার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে বেশী। তোমার হাত খুব ভাল, অনুশীলন করলে আরো ভাল হবে।

ছেলেটি বলল—আমার ছবি আঁকতে খুব ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নূতন ছবি আঁকলে আমাকে এনে দেখাবি। আমারও ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছবিখানা নিজের হাতে রেখে চারিদিকে ঘুরিয়ে সকলকে দেখালেন, দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলেন? কেমন হইছে?

সকলে একবাক্যে বললেন—ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ছবিখানা ছেলেটির হাতে দিলেন। সে প্রণাম ক'রে খুশি মনে চ'লে গেল।

একটি দাদা এসেছেন বরিশাল থেকে, তিনি হাই ব্লাডপ্রেসারে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে কাতরভাবে নিবেদন করলেন—দয়াল! ওষুধপত্র তো অনেক কিছুই করলাম, কিছুতেই স্থায়ী ফল হয় না। আপনি নিজ মুখে যদি একটা-কিছু বলেন, তাহ'লে তাই খেয়ে দেখতে পারি। আর আমি পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটুখানি ভাবলেন, ভেবে তারপর বললেন, কেষ্টদাকে একবার একটা পাচন দিয়েছিলাম, তা'তে তার খুব উপকার হয়েছিল। আমার যতদূর মনে হয়, হরীতকী, আলকুশী, শালপানি, অনন্তমূল, বেড়েলা ও অর্জ্জুন এই ক'টা জিনিস ছিল তা'তে। মাত্রা বিষয়ে বীরেনদা বা হরিপদর কাছে শুনে নিতে হয়। পরমপিতার দয়ায় কেষ্টদার কিন্তু ওতেই সেরে গেছে। তুমিও ব্যবহার ক'রে দেখতে পার।

দাদাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছ থেকে বিধান পেয়ে বললেন—আপনার মুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে, এতেই আমার অসুখ সেরে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে পরমপিতার দয়া।

ইন্দুদা (বসু)—ছেলেপেলেদের স্কুলে যেমন শিক্ষা দিতে হবে, বাড়ীতেও তো তেমনি উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই? বাড়ীতে ছেলেপেলেদের শিক্ষার জন্য প্রধান করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলের প্রথম শিক্ষা সুরু হয় তার মা'র কাছে। তাই মা'র অভ্যাস, চাল-চলন খুব নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। মা'র এতটুকু ভুলে ছেলের অনেক ক্ষতি হ'তে পারে। ছেলে হয়তো রোখের সঙ্গে একটা কাজ করতে যাচ্ছে, কাজটাও ভাল, কিন্তু মা মনে করলো—এ তো অনর্থক, তাই ভেবে খুব বাধা দিলো, এতে হয়তো তার কর্ম্ম-সম্বেগই অনেকখানি স্তব্ধ হ'য়ে ওঠে। আবার,

অন্যায়ও যদি কিছু করতে যায়—খুব সম্বেগ নিয়ে,—সেখানেও স্তব্ধ ক'রে দিতে নেই, বরং ঐ সম্বেগটাকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে দিতে হয়। শিশু অনুসন্ধিৎসা নিয়ে মা'র কাছে কতরকম প্রশ্ন ক'রে, মা যদি ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়, তাহ'লে তার অনুসন্ধিৎসার কিন্তু ঐখানেই খতম। আবার, আবোল-তাবোল যা'-তা' উত্তরও দিতে নেই, তার মাথায় ধরে এমন ক'রে বলতে হয়। যেটা জান না, সেটা-সম্বন্ধে বলতে হয়—পরে বলব, পরে জেনে নিয়ে বলতে হয় তাকে। ছেলের স্বভাব, রুচি, পছন্দ, বৈশিষ্ট্য মায়ের নখ-দর্পণে থাকা চাই। প্রত্যেকটা ছেলেকে মানুষ করতে হয় তার নিজস্ব রকমে। শাসন, তোষণ, আদর, সোহাগ প্রত্যেককে ঠিক একই রকমে করলে হয় না, যার যেমন প্রকৃতি, তার সঙ্গে সেই চা'লে চলতে হয়, নইলে তার অন্তরের ক্ষুধা মেটে না। বিশিষ্টতা-সম্বন্ধে এই বোধটা খুব কম মায়েদের আছে, তারা ও-নিয়ে অতো মাথা ঘামায় না। পরিবারের মানুষগুলির সেবা-যত্নের ব্যাপারে যদি ঐ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলার অভ্যাস থাকে, তখন সন্তানপালনের বেলায়ও সে-ধাঁজটা থাকে। সব জিনিসেরই অভ্যাস চাই, শিক্ষা চাই। সেইজন্য মেয়েদের খুব গোড়া থেকে এই সবগুলি খেয়াল ক'রে শেখাতে হয়। তারপর সংসারে গুরুজন কেউ হয়তো ছেলেকে কোন অন্যায়ের জন্য শাসন করেছে, মা তখন-তখনই যদি ছেলের পক্ষ নিয়ে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে যায় তার সঙ্গে, তা'তে কিন্তু সন্তানের মাথা খাওয়াই হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেক সময় এই রকম দেখা যায়। এমন-কি অন্যায়ভাবেও যদি সে শাসন ক'রে থাকে, ছেলের সামনে তা' নিয়ে তাকে কথা শুনান ভাল নয়। বরং শুভবুদ্ধিতে তাকে শাসন করেছেন, সেই কথাটাই বলতে হয়। সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, ছেলেদের জীবনে যা'তে কিছুতেই অশ্রদ্ধা, দোষদৃষ্টি, অনৈক্যবুদ্ধি ইত্যাদি শিকড় গেড়ে না বসে। ছেলেদের সামনে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা যত না করা যায়, ততই ভাল। সুকেন্দ্রিক উদারতা ও সেবা-সহানুভূতির দৃষ্টান্তই যেন তারা মা-বাবার চরিত্রে দেখতে পায়। তারপর, কখনও কোন কারণেই ছেলেপেলেদের এমনভাবে বকা ভাল না, যা'তে তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হ'য়ে যায়। মা হয়তো ছেলেকে পড়াতে গেছে, ছেলে পারলো না, অমনি ব'লে বসলো—লেখাপড়া তোকে দিয়ে হবে না, তোর মাথায় গোবর পোরা। মায়ের মুখ থেকে এমনতর কথা ছেলের জীবনকে সাবাড় ক'রে দিতে পারে। আবার, মা-বাবা ছেলের সামনে নীতি-উপদেশ দিচ্ছে, কিন্তু নিজেরা সেই অনুযায়ী চলে না, এতেও কিন্তু ছেলেদের খুব অসুবিধা হয়। আর, মা-বাবা পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে ছেলেকে।

সঙ্গে-সঙ্গে পিতৃপুরুষের কথা, ইষ্টের কথা মাথায় ঢুকিয়ে দেবে। বাস্তব আচরণের ভিতর-দিয়ে সেটা তাদের ভিতর গেঁথে দেওয়া চাই। ধর, শীতকাল, বাড়ীতে নূতন কমলা এসেছে, দেখে ছেলের খুব খাবার লোভ। তখনই বললে— বেশ তো! চল যাই আগে ঠাকুরবাড়ী দিয়ে আসি গিয়ে, তারপর আমরা খাব। এই ব'লে তার হাত দিয়েই কমলাটা ঠাকুরকে দেওয়ালে। এইভাবে বাস্তব আচরণের মধ্য-দিয়ে দেখাতে হয় যে, ইষ্টই তোমাদের জীবনের মুখ্য। তখন উপদেশ দেওয়া লাগে না। আবার, তোমার বাবা-মা হয়তো বেঁচে নেই, ঘরে হয়তো তাঁদের ফটো আছে, নিত্য সেই ফটোর সামনে প্রণাম কর তোমরা, ধূপধুনো দাও, মালা দিয়ে যত্নের সঙ্গে ফটোটি সাজিয়ে রাখ। ঠাকুর-দেবতাকে যেমন ভাল জিনিসটা নিবেদন করে, মা-বাবার ফটোর সামনেও হয়তো তাই কর তোমরা। এসব যদি ছেলেপেলেরা দেখে তবে পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি তাদের মধ্যেও উছলে উঠবে। পিতা-মাতা যাদের জীয়ন্ত আছেন, তারা তাঁদিগকে জাগ্রত গৃহদেবতার মত ভক্তি ও সেবা যদি করে, ছেলেপেলেরা ওর ভিতর-দিয়েই শিক্ষার মূল মরকোচ ধ'রে নিতে পারবে। একটা জিনিস হামেশাই দেখা যায়। মা-বাবা ছেলেপেলের সামনে নিজেরা অনেক সময় ঝগড়া-বিবাদ করে। এই কাজটি কখনও ভাল নয়। মোকথা কয়েকটা বললাম। আরো কত আছে। ফলকথা, মা-বাবা যদি সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে ছেলেপেলেদের সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলা দুঃসাধ্য।

শরৎদা (হালদার)—নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যের মূল কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা ঢেউ-এর উদ্বেলায়িত অবস্থাটা যেন পুরুষ, অববেলায়িত অবস্থাটা যেন নারী। অববেলায়িতের উপর ভর দিয়ে যেন উদ্বেলায়িত দাঁড়ায়। প্রকৃতি যেন পুরুষের বিশ্রামের ক্ষেত্র। নারী পুরুষের পরিপোষক, পুরুষ নারীর পরিপূরক, উভয়ে মিলে যেন এক, নারী যেন পুরুষের সত্তার বাকীটুকু। তাই মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রীর কথা বলে, আর স্বামী যেন স্ত্রীর সত্তা। পুরুষ-নারীর এই গভীর সম্পর্ক অনেকে বোঝে না। তাই একে অন্যকে তথাকথিত ভোগের উপকরণ মনে করে। কিন্তু প্রকৃত দাম্পত্য মিলন ও প্রণয় যেখানে, সেখানে ঠিক লক্ষ্মী-নারায়ণ বা শিব-দুর্গার আবির্ভাব হয়। পুরুষের এই উদ্বেলায়িত অবস্থাটা অটুট রাখবার জন্য তাকে আবার পুরুষ-শ্রেষ্ঠে সংলগ্ন থাকতে হয়। নচেৎ তার পৌরুষই লোপ পেতে বসে। সে কামমুগ্ধ হ'য়ে ওঠে নারীতে, তার পরিপূরণী প্রতিভাই নষ্ট হ'তে থাকে। নারী তেমনতর পুরুষকে নিয়ে সুখী হ'তে পারে না। Negative (ঋচী) তার counter-self positive (সমবিপরীত ঋজী সত্তাকে)

খুঁজে বের ক'রে, তাকে reinforce (শক্তিসমৃদ্ধ) ক'রে সত্তায় সজাগ ও বৃদ্ধিতে উপভোগ-প্রতুল থাকতে চায়। এ শুধু পুরুষ-প্রকৃতির বেলায় নয়, greater বা greatest positive-এর (বৃহত্তর বা বৃহত্তম ঋজী শক্তির) কাছে lesser positive-এর (ন্যূনতর ঋজী শক্তির)-ও এইরকম হয়, এরা এসে জুটলে তাঁর লীলার আসর জমাট বেঁধে ওঠে। তাই বলে,—'সে তো একলা থাকে না ভাই, যখন যেখানে যায়, তার সঙ্গে থাকে গো রাই।' (ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন)—কি কো'স কালীষষ্ঠী ?

কালীষষ্ঠীমা (সহাস্যে)—একলা থাকলি চলবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্‌ শালা ! দুনিয়ায় কেউই একলা থাকতি চায় না। মানুষ যে-মুহূর্ত্তেই ভাবে যে তার কেউ নেই, সেই মুহূর্ত্তেই তার দম আটকে আসতে চায়। আচ্ছা ! এমন কেন হয় ?

কালীষষ্ঠীমা—কেন হয়, তা' জানি না। কিন্তু হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জারিজুরি যতই কও, তার মূল ঐখানে। এক ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকে, তখন পরাণ ঠাণ্ডা।

ইন্দু মিস্ত্রিদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—টেবিলটা ক'রে দিলি না ?

ইন্দুদা—করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করছি কি রে ? যখন চাই, তখন যদি না পাই তাহলি কি সুখ হয় ? কম খরচে তাড়াতাড়ি সুন্দর ক'রে যদি না করতে পারিস, তাহ'লে কী হ'লো ?

ইন্দুদা—এক হাতে কয়টা করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দশভুজার কথা শুনিস্‌নি ? মা দুর্গাকে কয় দশভুজা। তুমি এত নিপুণ হবা, এত তাড়াতাড়ি কাজ করবা যে, একাই পাঁচজন হ'য়ে উঠবা। তুমি ফিঙ্গে হ'য়ে লেগে দেখ না কেন ? আগের থেকে কতখানি আগাইছ, খেয়াল আছে ? আর দরকার হ'লে আরো লোক জুটিয়ে নিতে হয়।

ইন্দুদা 'আচ্ছা' ব'লে বিদায় নিলেন।

গুরুদাসদা (ব্যানার্জ্জী)—বহু পরিবারে আছে আচার-আচরণগুলি ধরানই যেন যায় না, যেমন ইষ্টভৃতি, নিরামিষ-আহার, সদাচারে চলা ইত্যাদি, ধরলেও আবার ছেড়ে দেয়। এর কী করা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর রকমই থাকে ঢিলে। দৃঢ়তার সঙ্গে নিরন্তরতা নিয়ে সৎ কোন-কিছুতে লেগে-প'ড়ে থাকতে পারে না। তাদের পেছনে লেগে থাকা ছাড়া আর কোন পথ নেই। তবে অধৈর্য্য বা হতাশ হ'লে চলবে

না। তোমাদের কাজ হ'লো অসীম ধৈর্য্যের কাজ। একটা ছোট ছেলেকে যে মা মানুষ করে, সে হাগে, মোতে, বমি করে, অসুখে ভোগে, কত দৌরাত্ম্য করে, তবু মা তাকে কত যত্নে পেলে-পুষে মানুষ ক'রে তোলে। এ-ও সেই রকম। অনেক স'য়ে, অনেক ব'য়ে তবে এক-একজনকে ঠিক করা লাগে। আর, এই ব্যক্তি-চরিত্র-নিয়ন্ত্রণ যদি না হয়, পরিবার-নিয়ন্ত্রণ যদি না হয়, তবে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। শত-শত বছর ধ'রে ঋত্বিক্ তার কাজ করেনি, পুরোহিত তার কাজ করেনি, তাই আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল বহু জমে উঠেছে। তোমাদের এখন খেটেপিটে এগুলি সাফ করা লাগবে। আবার ধাঁজটা একবার এনে যদি ফেলতে পার, তখন দেখবে কত সহজ। আমাদের রক্তের মধ্যেই যে এটা আছে। তবে বহুদিনের অনভ্যাসের ফলে এখন নতুন মনে হয়। এই-ই যে আমাদের নিজস্ব জিনিস তা' ভুলে গেছি।

বেলা হ'য়ে উঠেছে। লোকজনের সমাবেশে আশ্রম-প্রাঙ্গণ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার গাত্রোত্থান করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে খেয়ে-দেয়ে ঘুম থেকে ওঠার পর বঙ্কিমদা (রায়) এসে জানালেন—পাবনা থেকে হক সাহেব ব'লে একজন সরকারী কর্ম্মচারী এবং আরো কয়েকজন ভদ্রলোক বিকালে বেড়াতে আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসলে তোমরা ঘুরিয়ে-টুরিয়ে দেখিয়ে কথাবার্ত্তা ক'য়ে পরে আমার কাছে নিয়ে এসো—যদি তাদের আগ্রহ থাকে।

বঙ্কিমদা—আপনার সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহই তো তাদের বেশি। শুনেছি হক সাহেব বেশ ধর্ম্মপ্রাণ লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাহো'ক, তোমরা আগে কথাবার্ত্তা ক'য়ো, তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে পরে আমার কাছে আসলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু বাদে মাতৃমন্দিরের উত্তর দিকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বকুল গাছতলায় একটা হাতওয়ালা বেঞ্চে এসে বসলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি যথা—গড়গড়া, তামাক, টিকে, জলের ঘটি, সুপারির কৌটা, দাঁতখোটা, পিকদানি প্রভৃতি নিয়ে আসা হ'লো। ঝির-ঝির ক'রে একটু হাওয়া দিচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর চাদরটা চেয়ে নিয়ে গায় দিলেন। বেলা তখন প্রায় চারটে। আশ্রমের দাদারা ও মায়েরা আসছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। প্রত্যেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করছেন, প্রণাম ক'রে কেউ ব'সে, কেউ দাঁড়িয়ে দেখছেন তাঁর কমনীয় মোহন ঠাম। শ্রীশ্রীঠাকুর অমৃতস্রবা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন সবার পানে, কোন কথা নেই মুখে, তবু এই দৃষ্টি যেন অনির্ব্বচনীয়

ভাব, ভাষা ও মমতায় ভরা। এই দৃষ্টিপাতে মানুষের মনের গহনতলে সুখতরঙ্গ স্বতঃই আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই মানুষই তো জীবজগতের আনন্দকন্দ, তাঁর সব চিন্তা, সব করা, সব বলা, মায় অস্তিত্বের প্রতিটি অনুরণন পর্য্যন্ত নিখিলের নিত্য আনন্দবিধায়ক, সর্ব্বথা মঙ্গল-মঙ্গলপ্রদ, তাই তো মানুষ অনিবার্য্য আকর্ষণে ছুটে আসে তাঁর কাছে। শুধু মানুষ নয়, ইতর প্রাণীও তাঁর মমতার আশ্রয় খোঁজে, তাঁর সান্নিধ্য কামনা করে।

কয়েকজন ভদ্রলোক আসবেন ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর সুবোধ-ভাইকে বললেন—কয়েকখানা চেয়ার পেতে রাখ্ তো।

সুবোধভাই (বন্দ্যোপাধ্যায়) কয়েকখানা চেয়ার এনে পেতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাজিয়ে-গুছিয়ে ভাল ক'রে পাত। বিশৃঙ্খল রকমে পাতলে কি ভাল দেখায়? কাজ যা' করবি, এমন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে করবি যে, তা'তে তোর নিজের মনে যেন একটা আত্মপ্রসাদ আসে, আর তোর কাজ দেখে অন্যের প্রাণও যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।

সুবোধভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত চেয়ারগুলি ঠিকভাবে পেতে দিলেন।

প্রফুল্ল—বাইরের কাজের দিকে অতো মন দিতে গেলে তো মানুষের মন বহির্ম্মুখী হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর পাগল! কো'স কি? কাজকর্ম্ম তো আমাদের তপস্যারই অঙ্গ। কাজকর্ম্ম করব তাঁর প্রীতিকামনায়। এই কাজকর্ম্ম ছাড়া কি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ হয়? আমাদের ভিতর যত বিশৃঙ্খলা থাকে, কাজকর্ম্ম তত এলোমেলো ও অবিন্যস্ত হয়। বাইরের কাজকর্ম্ম যদি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে করতে অভ্যস্ত হই, তার মধ্য-দিয়ে আমাদের চিন্তা, চলন ও চরিত্রকেও সুবিন্যস্ত ক'রে তোলার পক্ষে সাহায্য হয়। আমার তো মনে হয়, কাজকর্ম্ম না করলেই মানুষ বহির্ম্মুখী হয় বেশী। কাজকর্ম্ম করতে গেলে তো চিন্তাধারাকে কাজের উপযোগী ক'রে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এমনতর লাভজনক নিয়ন্ত্রণে মনের যে শিক্ষা হয়, নিষ্কর্ম্মা থেকে সে শিক্ষা হয় না, উড়ো-উড়ো ভাব হয়। কাজকর্ম্মের ভিতর-দিয়ে মানুষের যেমন জীবনের প্রয়োজন সমাধা হয়, তেমনি আবার ভিতরের বিন্যাসও হয়, এই তো কাজের প্রধান গুণ। তবে কাজ হওয়া চাই ইষ্টার্থে, আমার বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত তাঁর প্রয়োজনে।

কথা হ'চ্ছে এমন সময় হকসাহেব এবং আরো কয়েকজন বঙ্কিমদা, প্রকাশদা (বসু) প্রভৃতি-সহ আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে তাদিগকে অভ্যর্থনা করলেন।

ওঁরা বললেন—না, আপনি বসুন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বসলেন এবং ওঁরাও বসলেন। হকসাহেব বললেন—আপনার কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলি দেখে আসলাম। বেশ সুন্দর। তবে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে এত কর্ম্মের আয়োজন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে আমি বুঝি তাই করা যা'তে আমাদের বাঁচা-বাড়া অক্ষুণ্ণ থাকে। এর জন্য গোড়ায় চাই ঐ রসুল বা কামেল পীর, তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে অনুসরণ ক'রে আমরা যখন চলি তখন দুনিয়ার হাজারো রকম টান আমাদের আর বিচ্ছিন্ন করতে পারে না, আমরা বিভ্রান্ত হই না। ঐ খোঁটা ঠিক রেখে বাঁচার জন্য, বাড়ার জন্য, যা'-যা' করি, সবই তখন ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়াবে। বরং বাঁচা-বাড়ার জন্য যা'-যা' করণীয়, তার কোনটা যদি বাদ দিই, তাহ'লে আমাদের জীবন ততখানি ধর্ম্মচ্যুত হ'য়ে পড়বে, অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়বে। আবার, পরিবেশকে না বাঁচিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। আমাদের কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে, সেবার ভিতর-দিয়ে পরিবেশকে যতখানি উন্নত ক'রে তুলতে পারব, পরিবেশের উন্নততর কর্ম্ম ও সেবার ভিতর-দিয়ে আমরাও তত সুষ্ঠুভাবে সম্বর্দ্ধিত হব। তাই দেখুন, ধর্ম্মের মধ্যে কর্ম্মের প্রয়োজন কতখানি, তবে সব কর্ম্ম সার্থক হ'য়ে ওঠা চাই খোদাতালায়, রসুলে।

হরিপদদা (সাহা) তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি অনুমতি করেন, একটু তামাক খাই।

ওঁরা একবাক্যে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেশাখোর মানুষ কিনা। নেশার বন্ধু সঙ্গে থাকলে আড্ডাটা জমে ভাল।

ভদ্রলোকেরা একটু হাসলেন।

হকসাহেব—আপনি রসুলের কথা বলছেন, হিন্দুর মুখে রসুলের কথা তো বড় একটা শুনি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোদার প্রেরিত যিনি, তিনি সবারই আপনজন। তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই, সর্ব্বমানবেরই। এই রসুলকে বাদ দিয়ে আমরা খোদা-তালায় পৌঁছাতে পারি না। আবার রসুল বলেছেন—আমরা যদি প্রেরিত পুরুষদের কাউকে স্বীকার করি, কাউকে অস্বীকার করি, কাউকে ছোট ক'রে কাউকে বড় করি, তাহ'লে সেটা কাফেরত্বেরই সামিল। আবার ঈশ্বরবিশ্বাসী, অটুট ইষ্টপ্রাণ কাউকে যদি কেউ কাফের বলে, সেও তার ভিতর-দিয়ে নিজের কাফেরত্বেরই পরিচয় দেয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ধার্ম্মিক কখনও কাফের নয়, আবার

কাফের কখনও ধার্ম্মিক নয়। খাঁটি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টানে কোন প্রভেদ নেই, তারা সবাই একপন্থী। প্রত্যেকেরই উচিত প্রত্যেকটি প্রেরিত-পুরুষকে শ্রদ্ধা করা। এর ভিতর-দিয়েই পারস্পরিক সম্প্রীতি সহজ হ'য়ে ওঠে। ধর্ম্মের বিকৃতি যাতে না হয়, সেদিকে আমাদের সমবেত লক্ষ্য রাখা উচিত। রসুলের কোন বাণীর কদর্থ যা'তে কেউ না করে, সেদিকে আপনারও যেমন লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, আমারও তেমনি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রত্যেক মহাপুরুষ সম্বন্ধে প্রত্যেকের এই মনোভাব থাকা উচিত। আমরা পরস্পরকে যত জানি ও শ্রদ্ধা করি ততই লাভবান হই। যতই অনুধাবন করি ততই বোধ করতে পারি খোদা এক, তাঁর প্রেরিতপুরুষগণ একবার্ত্তাবাহী এবং ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবন-বৃদ্ধির নীতিও একই।

হকসাহেব—ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম্মে তো অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূলগত পার্থক্য কমই পাবেন। তবে দেশ-কাল-পাত্রানুগ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিশেষ-বিশেষ ব্যবস্থার বিধান থাকতে পারে। এবং আমার তো মনে হয় সেটা ঐক্যেরই নিদর্শন। কারণ, প্রত্যেক প্রেরিত-পুরুষই বৈশিষ্ট্যপূরণী। এই বৈশিষ্ট্যপূরণের দিক দিয়ে সবার মধ্যে ঐক্য আছে। বৈশিষ্ট্য যেখানে বিচিত্র, সেখানে বৈশিষ্ট্যপূরণী ব্যাপারে বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি থাকবেই। কিন্তু সবটার মূল লক্ষ্য ঈশ্বরমুখী জীবনবৃদ্ধি। আর, প্রেরিতপুরুষদের মধ্যে পাবেন পূর্ব্বতনের আপূরণ। 'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।' পরবর্ত্তী পূর্ব্বতনদেরই সংহতমূর্ত্তি। পূর্ব্বতনদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নাই বরং তাঁর মধ্যে আছে সবার পরিপূরণ।

হকসাহেব—মূলগত বিষয়ে যে পার্থক্য নেই, তাই বা বলা যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরুন, ইসলাম শব্দের মানে আমি শুনেছি, খোদায় আত্ম-নিবেদন বা শান্তি। সব ধর্ম্মেরই তো মূলকথা এই। সব ধর্ম্ম বললে কথাটা ভুল বলা হয়, কারণ ধর্ম্ম বহু নয়, ধর্ম্ম একই। আর কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এই পাঁচটি অনুষ্ঠান শুনেছি মুসলমানদের অবশ্য করণীয়। প্রত্যেক শাস্ত্রেই তো এই বিধান আছে, তবে হয়তো ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন নামে হ'তে পারে। কলেমা মানে আমি বুঝি খোদাতালায় বিশ্বাস রেখে প্রেরিত-পুরুষকে স্বীকার ক'রে তাঁর অনুশাসনে চলা। এই বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও অনুসরণ ধর্ম্মের প্রথম ভিত্তি। হিন্দুর মধ্যেও আছে যুগপুরুষোত্তম বা সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলার কথা। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও আছে baptism (অভিষেক)-এর প্রথা। বৌদ্ধরাও

আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিশরণ-মন্ত্র গ্রহণ ক'রে থাকে ব'লে শুনেছি। এই স্বীকৃতি, এই পুরুষশ্রেষ্ঠকে আপন ক'রে নেওয়ার মধ্যে-দিয়েই তাঁর অনুবর্ত্তনে চলার পক্ষে সুবিধা হয়। আর, নামাজ মানে সন্ধ্যা, বন্দনা, প্রার্থনা। মানুষ ইষ্টের স্মরণ, মনন যত করে, তত তার মন পবিত্র হ'য়ে ওঠে, প্রবৃত্তিগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার কায়দা পায়, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমীক্ষণে পটু হয়, তা'ছাড়া এতে ক'রে ইষ্টীচলনের সম্বেগ বাড়ে, তাই এ নির্দ্দেশও সর্ব্বত্র আছে। আর, রোজা মানে ইষ্টচিন্তাপরায়ণ হ'য়ে সুনিয়ন্ত্রিত উপবাস, এতে শরীর, মনের অনেক গলদ বেরিয়ে যায়, ইচ্ছাশক্তি প্রবল হ'য়ে ওঠে। শুনেছি, বিধিমাফিক উপবাস কাম-দমনের পক্ষেও সহায়ক। এও সবারই করণীয়, যে যে-পথেই চলুক। হজ মানে তীর্থযাত্রা, ভাবসিক্ত হ'য়ে তীর্থ-দর্শন করলে আমরা সাধু-মহাপুরুষদের ভাবে অনুপ্রাণিত ও অভিষিক্ত হ'য়ে উঠি। এ বিধানও সবার মধ্যে আছে। আর, জাকাত মানে ধর্ম্মার্থে দান, ইষ্টার্থে উৎসর্গ। এই বাস্তব করণের ভিতর-দিয়ে ইষ্টের প্রতি আমাদের অনুরাগ বাড়ে, তা'ছাড়া আমাদের উদরান্ন-আহরণী কর্ম্মও ইষ্টসার্থকতায় সার্থক হ'য়ে উঠতে থাকে। এইভাবে ইষ্ট আমাদের সবকিছুতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে ওঠেন। সংসারে চলতে আমাদের হাজারো তাল নিয়ে চলতে হবে, কিন্তু সবটার মধ্যে যদি ইষ্টকে স্থাপনা করতে পারি, তাহ'লেই আমরা বহু অনিষ্ট, বিপদ, আপদ ও অনর্থের হাত হ'তে রেহাই পেতে পারি। আপনাদের যেমন জাকাত আছে, তেমনি অন্যত্র আছে ইষ্টভৃতি। এই ইষ্টভৃতি যে কতবড় জিনিস, মানুষের কতবড় রক্ষা-কবচ তা' করলেই বোঝা যায়। আবার, এর ভিতর-দিয়ে দুঃস্থ পরিবেশও প্রভূত উপকৃত হয়। তাহ'লেই দেখুন, মূল জিনিসগুলি সর্ব্বত্র সমান কিনা।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— আপনাদের শীত লাগছে না তো ?

হকসাহেব—আমাদের তো শীত লাগার কথা নয়। গরম জামা-কাপড় গায় আছে। আপনার গায় তো সামান্য একটা সুতোর চাদর। আপনারই বরং ঠাণ্ডা লাগছে। চলুন, অন্যত্র গিয়ে বসি, অবশ্য আপনার যদি অসুবিধা না হয়। আপনার কথাগুলি খুব ভাল লাগছে, আরো শুনতে ইচ্ছা করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আবার অসুবিধা কী ? আমার তো মনে হয়, আপনারা সারারাত থাকুন, সারারাত আপনাদের সঙ্গে গল্পে-গুজবে কাটিয়ে দিই। মনের মত মানুষ পেলে দুই-এক রাত না ঘুমোলেই বা কি যায় আসে ?

হকসাহেব এবং ওরা সবাই খুব হাসিখুশি হ'য়ে উঠলেন।

হকসাহেব বললেন—চলুন বারান্দায় গিয়ে বসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওঁরাও উঠলেন। কয়েকজনে মিলে হাতে-হাতে ক'রে চেয়ারগুলি নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন—ওঁদের torch (টর্চ্চ) ধ'রে নিয়ে এসো।

দৌড়ে গিয়ে একজন টর্চ্চ দিয়ে পথ দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় তক্তপোষের উপর পাতা বিছানায় উপবেশন করলেন, ওঁরা চেয়ারে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব'সে বললেন—আলো নিয়ে আয়, মুখ না দেখতে পারলে ভাল লাগে না।

একজন একটা হ্যাজাক নিয়ে এসে একপাশে টানিয়ে দিল।

হকসাহেবের সঙ্গের এক ভদ্রলোক পর-পর দু-তিনবার একটু কাশলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার কাশি হয়েছে?

উক্ত ভদ্রলোক—ফ্যারিঞ্জাইটিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে ডাকতে বললেন।

প্যারীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার জন্য যে বড়ি তৈরী ক'রে রাখছিস্, তার কয়েকটা বড়ি এই দাদাকে দে তো। ওর ফ্যারিঞ্জাইটিস হইছে।

প্যারীদা বড়ি আনতে গেলেন। একটু পরে এনে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ বড়ি এখন একটা মুখে দিয়ে রাখেন। আর, রেখে দেন, পরে ব্যবহার করবেন। আর, মাফলারটা গলায় পেচিয়ে বসেন।

ভদ্রলোক তাই করলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, মাতৃমন্দিরের দোতালায় আশ্রমবালিকাগণের পূজারতি ও স্তবস্তোত্রপাঠ সুরু হয়েছে। বাড়ীতে-বাড়ীতে পরিবারের সকলে মিলে সমবেতভাবে বিনতি-প্রার্থনাদি করছেন। ওদিকে অতিথিশালায় আজ আবার বিশেষ সৎসঙ্গের অধিবেশন। যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও বাণী নিয়ে আজ সেখানে আলোচনা হবে। স্নিগ্ধ, শান্ত পরিবেশ। চতুর্দ্দিক প্রার্থনারত। শ্রীশ্রীঠাকুরও আপনভাবে মগ্ন হ'য়ে আছেন।

স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে হকসাহেব প্রশ্ন করলেন—পুনর্জ্জন্ম জিনিসটা কি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা রোজ-কিয়ামৎ যেটাকে কন, আমার মনে হয়, সেটা পুনর্জ্জন্মেরই নামান্তর। মানুষ যেমনতর ভাব নিয়ে যায়, তেমনতর ভাব নিয়ে স্ত্রী-পুরুষ যেখানে যখন মিলিত হয়, সেখানে তখন তার পুনরাগমনের সম্ভাবনা হয়। পুনরায় শরীরে কায়াম হওয়ার এই যে রীতি, একেই বোধ হয় বলা হ'য়েছে

রোজ-কিয়ামৎ। আমি অবশ্য কোরাণ-টোরাণ পড়িনি, মুখ্যু মানুষ, কী বলতে কী কই। তবে আমার যেমন মাথায় আসে তা' এই। শুনেছি পুনর্জ্জন্মের কথা কোরাণেও আছে।

হকসাহেব—শুনতে পাই আপনি নাকি নূর ও আওয়াজ অনুভব করেছেন, আমাদের পক্ষেও কি তা' অনুভব করা সম্ভব? আর, ঐ অনুভূতিতে লাভ কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাভ-লোকসানের ধারণা নিয়ে আমি কোনদিন কিছু করিনি। নাম করতে খুব ভালই লাগতো, আর আপন আনন্দে নাম করতাম। নাম না ক'রেই যেন পারি না। কী পাব, কী হবে এসব কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু একটা আকুল নেশা ছিল। গভীরে, আরো গভীরে চ'লে যেতাম। এই অনুশীলনের পথে কত কী-ই দেখা যায়, শোনা যায়, সে এক অপরূপ জগৎ। তবে অনুরাগই এর মূল বস্তু। অনুরাগযুক্ত অনুশীলনে আমাদের মস্তিষ্ককোষগুলির মধ্যে যতই দহনতাপের সৃষ্টি হয়, ততই শব্দ ও আলো অনুভব করা যায়, এর মধ্য-দিয়ে আমাদের সাড়াশীলতা ও গ্রহণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জগৎ-এর যা'-কিছুকে তখন তীক্ষ্ণভাবে বোধ করা যায়। এই বোধগুলি যতই আবার ইষ্টসূত্রে গ্রথিত ও সমাহিত হ'য়ে ওঠে, ততই সমাহারী প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়। আমি যা'-কিছু বলি তা' কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ বোধের উপর দাঁড়িয়ে। আমি কোন বই-টই পড়িনি। কিন্তু নিজের জীবনে যা' অনুভব করেছি, সেই দাঁড়ায় ফেলে সব-কিছুর মূল স্পন্দনটা যেন ঠাহর করতে পারি।

আপনি করুন, আপনারও হবে। আমান দেখেছেন, আমান অনুভব করেছেন, রসুল-সেবী, আল্লা-অনুরক্ত এমন একজন পুরুষকে যদি পান তাঁর শরণাপন্ন হন, তাঁকে কেন্দ্র ক'রে রসুল আপনার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে উঠবেন। আপনাদেরও তো শুনেছি, মারেফতী সাধনার কথা আছে।

হকসাহেব—মুসলমানের মধ্যে যদি এমন সিদ্ধ-পুরুষ না পাই, তিনি যদি অন্য সম্প্রদায়ের হন, তাহ'লে তাঁকে কি গ্রহণ করা চলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যে-সম্প্রদায়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁর যদি রসুলে অনুরাগ থাকে এবং রসুলের প্রতি আপনার অনুরাগকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারেন, আপনার ভাবে তিনি যদি ব্যাঘাত না করেন, তাহ'লে আপনার অসুবিধা কোথায়? দীক্ষা এক জিনিস আর ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ অন্য জিনিস। ধর্ম্মজীবন যাপন করতে যেয়ে পিতৃপুরুষকে ও পিতৃকৃষ্টিকে যদি অস্বীকার করতে হয়, তবে সে তো এক রকমের বিশ্বাসঘাতকতা। শুনেছি, বিদায়-হজে রসুল এর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে বলেছেন।

হকসাহেব—কোরাণের মতে রসুল তো শেষ নবী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তদানীন্তন কালের মত তো তিনি সর্ব্বশেষ নবী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? হাদীসে তো শুনেছি, পরবর্ত্তীকে মানার কথা বিশেষভাবে লেখা আছে, এমন-কি তিনি যদি হাবসী ক্রীতদাসও হন। আবার, হাদীসে নাকি এই ধরণের কথা আছে, "প্রেরিত এসেছিলেন, প্রেরিত আসবেন, প্রেরিত জয়যুক্ত হবেন—ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম ও বিধি।" কোরাণে এমনতর কথা আছে যে, ঈশ্বরের নিয়ম ও নীতির পরিবর্ত্তন হয় না। যে-নিয়মের ভিতর-দিয়ে যে-প্রয়োজনে একদিন রসুলের আবির্ভাব হয়েছিল, সেই নিয়মের ভিতর-দিয়ে অনুরূপ প্রয়োজনে আবার যে অনুরূপ আবির্ভাব হ'তে পারে না, তা' মনে হয় না। এগুলি আমার মোটাবুদ্ধির কথা। আমি তো আরবী-টারবী জানি না, যাঁরা আরবী জানেন, তাঁদের কা'রও-কা'রও মুখে শুনেছি, আরবী ভাষার যে কথাটির অর্থ করা হয় শেষ নবী ব'লে, তার আর-একটা পাঠ হ'তে পারে, এবং তার মানে নাকি দাঁড়ায়, তিনি নবীদের মধ্যে মণিস্বরূপ। সে কথা তো ঠিক কথা, রসুলের যে অপূর্ব্ব জীবন, তা'তে তিনি নবীদের মধ্যে মণিস্বরূপ, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কী ? আবার, এও যেন শুনেছি মনে হয়, তিনি নবীদের শীলমোহর-স্বরূপ। অর্থাৎ, তিনি হলেন একজন আদর্শ নবী, তাঁর মানদণ্ডে আমরা বিচার করতে পারি, কেউ প্রকৃত নবী কিনা। এ-সব কিন্তু আমার শোনা কথা, আমি ভুলও শুনে থাকতে পারি। যা'-যা' শুনেছি, তা' যদি সত্য হয়, তার সঙ্গতি কোথায়, যেমনটা ভেবেছি তাই বলছি। যাই কন, রসুল আমাদের অতি প্রিয় এবং রসুল-প্রেমী যে সেও আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। মানুষ যুগে-যুগে এই প্রেমী মানুষকেই খোঁজে। তাঁকে না পেলে মানুষের পেট ভরে না। বই-পুঁথিপত্রে তো কত কথা আছে, কিন্তু তা' তো আমাদের তেমনভাবে নাড়া দিতে পারে না, যেমন ক'রে দেয় ঐ প্রেমীর ব্যক্ত জীবন।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর গান ধরলেন—'মনের মানুষ হয় যে জনা, ও তার চোখ দেখলে যায় চেনা।' শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখের অভিব্যক্তি এবং কণ্ঠস্বরের মধ্য-দিয়ে এমন একটা তীব্র আকুলতা ঝ'রে পড়তে লাগলো যে, অনেকেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠলো।

হকসাহেব—ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে কতখানি, তা' আপনার সান্নিধ্যে এসে বুঝতে পারছি। কত লোকের মুখেই তো কত কথা শুনি, কিন্তু মানুষের কথায় যে এত প্রাণ থাকে, মানুষের কাছে এসে ব'সে যে এত শান্তি পাওয়া যায়, তা' আমি এর আগে কখনও বোধ করিনি। আপনাদের মতন মানুষ আছেন

ব'লেই তো দুনিয়া টিকে আছে, নইলে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, চাল-চলন যেমন তা'তে দুনিয়া রসাতলে যাবার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, আমি কিছু না, আমি একটা ঢাকের বায়া। পরমপিতা যেভাবে চালান সেইভাবে চলি। বিদ্যেবুদ্ধিও নেই যে ভেঙ্গে-গ'ড়ে একটা-কিছু করব। তবে পারিপার্শ্বিকের অবস্থা-সম্বন্ধে আপনারা যে সচেতন, সেইটেই খুব ভরসার কথা। আপনারা যদি লাগেন, দেখতে-দেখতে এ-হাওয়া ফিরে যেতে পারে।

হকসাহেব—ছা-পোষা মানুষ, পরের গোলামী করি, আমরা আর কী করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা কা'কে দিয়ে যে কী করান, তার কি ঠিক আছে ? তাঁর জন্য প্রাণ যদি একবার কেঁদে ওঠে, তখন মানুষ সব পারে। চাকরী করেন, বাকরী করেন, যাই করেন, জীবনটা তাঁকে দেন, তাঁর কাজে লাগান। টাকা-পয়সা, নাম-যশের পায়ে জীবনটা বলি না দিয়ে ঈশ্বরের পায়ে বলি দেন। তাঁর হ'য়ে সব করেন।

হকসাহেব—পেটের ব্যবস্থা করতেই তো সব শক্তি ক্ষয় হ'য়ে যায়, তাঁর জন্য করব কখন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংসার, চাকরী, পেট সব যদি তাঁর জন্য হয়, তখন দেখবেন রং বদলে যাবে। আপনার সংস্পর্শে এসে কত মানুষ প্রভাবিত হ'য়ে যাবে। যেমন নিজে করতে হয়, তেমনি অন্যকে দিয়েও করাতে হয়। নিজে করাটা হ'লো যজন, অন্যকে দিয়ে করানটা হ'লো যাজন। দু'টো একসঙ্গে চালালে ভাব তাড়াতাড়ি পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। আর, নিজের ও সমাজের কল্যাণের দিকে চেয়েও এটা করা লাগে।

কথা হ'চ্ছে, এমন সময় কলকাতা থেকে একটি নবদীক্ষিত দাদা আসলেন।

তিনি আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, কখন আসলি ?

দাদাটি বললেন—এই আসাম-মেলে আসছি। আমি কয়েকদিন হ'লো হীরালালদার কাছ-থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' বেশ।

দাদাটি একটা ফুলের তোড়া ও প্রণামী-সহ প্রণাম করলেন। ফুলের তোড়াটি শ্রীশ্রীঠাকুর হাত পেতে নিলেন। পরক্ষণে ঐ দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা ওঁকে (হকসাহেবকে দেখিয়ে) দিই ?

দাদাটি বললেন—হ্যাঁ, আপনার যেমন খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ফুলের তোড়াটি হকসাহেবের হাতে দিয়ে বললেন—আপনার হাতে মানাবে ভাল।

হকসাহেব বিনীতভাবে নমস্কার ক'রে বললেন—আপনার আশীর্ব্বাদ।

কলকাতা থেকে দাদাটি কিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন। দেবীভাইকে ইঙ্গিত করতেই তিনি তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে মিষ্টি দিয়ে এলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতার দাদাদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলেন। দাদাটি অনেককেই চেনেন না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দেবীভাইকে সঙ্গে দিয়ে দাদাটিকে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দিলেন। বললেন—সব দেখিয়ে-শুনিয়ে হাওলা ক'রে দিয়ে আসিস্।

দেবী (চক্রবর্ত্তী)—আচ্ছা।

হকসাহেব এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও যাবার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার সুযোগ পেলে আসেন যেন।

হকসাহেব—পাবনায় আসলে আপনার এখানে আসবার আগ্রহ রইলো, আজ বড় আনন্দ পেয়ে গেলাম। (হাত জোড় ক'রে করুণভাবে বললেন)—একটু দয়া রাখবেন আমার প্রতি, যেন জীবনটা বিফলে না যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—পরমপিতার দয়া আছেই।

ওঁরা যাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আবার টর্চ্চ ধরতে বললেন।

চলে যাবার পর জিজ্ঞাসা করলেন—বেফাঁস কিছু বলিনি তো? ওঁরা দুঃখিত হয়নি তো?

সকলে একবাক্যে বললেন—না, ভরপুর হ'য়ে গেছে।

১০ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৮ (ইং ২৫।১২।৪১)

ভোরে তপোবনের শিক্ষকবৃন্দ ও শরৎদা (হালদার), সতীশদা (দাস) প্রভৃতি অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন। সবাই এসে প্রণাম ক'রে তাঁবুর মধ্যে উপবেশন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা বসেন, আমি একটু প্রস্রাব ক'রে আসি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে এসে তারাভরা আকাশের দিকে একবার চাইলেন, চেয়ে বললেন—এখনও রাত আছে মনে হয়।

একজন বললেন—প্রায় ৫টা বাজে, শীতের রাত কিনা, তাই আকাশে অতো তারা।

চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। প্রকৃতির এই মূর্ত্তি দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের মনও যেন গভীর ভাবাবেশে মগ্ন হ'য়ে উঠলো।

তিনি প্রস্রাব ক'রে ঘরে ফিরে তন্ময় হ'য়ে কী যেন ভাবছেন। হঠাৎ বললেন—দ্যাখেন, যে-জিনিস আপনারা পেয়েছেন, ভাল ক'রে অনুশীলন করেন। এ বড় সাচ্চা মাল, করলে হাতে-হাতে ফল, অবশ্য ফলের লোভে কিছু করতে যাবেন না। নাম-ধ্যান নেশার মত চালিয়ে যান, একটা দিনও বাদ দেবেন না। নিয়মিত বসা, নিয়মিত করা—এ খুব ভাল। ভাল না লাগলেও করা ভাল, করতে-করতে রস জ'মে ওঠে। নিজের মত ক'রে অনুভব না করলে মানুষের প্রত্যয় পাকা হয় না। নাম যত করবেন, কাজকর্ম্মও তত ভাল ক'রে করতে পারবেন, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও শক্তির অভাব বোধ করবেন না। অনেকে আছে, নাম করতে-করতে বুঁদ হ'য়ে পড়ে, কোন কাজকর্ম্মে মন দিতে চায় না, ও কিন্তু ভাল নয়। ওতে কিছুদিন পরে মানুষ নিথর হ'য়ে পড়ে। নাম-ধ্যান, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যাপারেও অগ্রগতি থেমে যায়, চড়ায় ঠেকে যাওয়ার মত হয়। কিন্তু নাম-ধ্যান ও কাজকর্ম্ম যারা নিত্যনিয়মিত ক'রে যায়, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে সুবিধা হয়। সংঘাতের ভিতর না পড়লে নিজের দোষ-দুর্ব্বলতাগুলি ধরা পড়ে না, আর কর্ম্মক্ষেত্রে বাস্তবে সেগুলি সংশোধন করা ছাড়া, মনে-মনে সংশোধন করলে হবে না। তাই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি এগুলি সমান তালে তো করবেনই, তা'ছাড়া আপনাদের যাকে যখন যা' করতে বলি, তা' কাঁটায়-কাঁটায় করতে চেষ্টা করবেন। এই বলার পেছনে আমার অনেক-কিছু উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু যখন যা' বলি তখন যদি তা' না করেন, তাহ'লে বড় অসুবিধার কারণ হয়। আবার কিন্তু ঠিকমত করলে অনেক বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারেন, শুধু বিপর্য্যয়ের হাত থেকে বাঁচা নয়, becoming (বিবর্দ্ধন)-এর পথও অনেকখানি খুলে যায়। এক-একজন যে কী হ'য়ে উঠতে পারেন, তার ঠিক নেই।

শরৎদা—অল্প সময়ের চেষ্টায় যা' সিদ্ধ হয়, তা' করতে আমাদের তত আটকায় না, কিন্তু ক্রমাগতি নিয়ে কিছু ক'রে চলা অনেক সময় আমাদের ধাতে পোষায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা যেখানে ক্রমাগতি সেখানে। মা যে সন্তানকে মানুষ ক'রে তোলে, তার পিছনে তাকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ক্রমাগত কী

কঠোর পরিশ্রমই করতে হয়। ছেলে হাগে, মোতে, কাঁদে, বিরক্ত করে, রোগে ভোগে, ক্ষিদে পেলে তাকে খাওয়াতে হয়, সময়মত তাকে জামা-কাপড় পরাতে হয়, তেল মাখিয়ে দিতে হয়, স্নান করাতে হয়, প্রতিটি মুহূর্ত্তে তার প্রতি নজর দিয়ে চলতে হয়, তবে সে বেঁচে থাকে, বড় হয়। মায়ের এই সেবার ক্রমাগতি যদি না থাকতো, তাহ'লে কি শিশু মানুষ হ'তে পারতো ? মহৎ কিছু পেতে গেলে তাই অনুরাগের সঙ্গে, ধৈর্য্যের সঙ্গে তার জন্য পরিশ্রম করা লাগে। আর, করতে করতে এই অভ্যাস পেকে ওঠে। তখন যা' হাতে নেয় তা' সমাধা না ক'রে পারে না।

মায়ের কথা বলছিলাম—তার এই টান এতখানি প্রখর যে ঘুমের মধ্যে পর্য্যন্ত সে সজাগ থাকে। তাই না সরোজিনী ?

সরোজিনীমা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসায় মানুষের অমনি হুঁশ বেড়ে যায়। তার চোখ, কান, নাক, গায়ের চামড়া, জিহ্বা প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ই সজাগ ও সাড়াপ্রবণ হ'য়ে ওঠে, কিছুই তার চেতনাকে এড়িয়ে যায় না। আমি যে এখানে ব'সে থাকি, আমার সবদিকে নজর থাকে, কোথায় কে যায় আসে, কী করে, কোথায় কোন্ শব্দটা হয়, কোথার থেকে কোন্ গন্ধটা আসে, কে কী মতলব নিয়ে ঘোরে, আমার সবদিকে লক্ষ্য পড়ে। এই নজর কিন্তু আপনাদের মধ্যে দেখতে পাই না। নাম-ধ্যান যত অটুট অনুরাগ নিয়ে করবেন, ততই দেখবেন, চলনা সজাগ হবে, বুদ্ধি-বিবেচনা বেড়ে যাবে।

শরৎদা—নাম-ধ্যানে আয়ু বৃদ্ধি পায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পায় বই কি ? অন্ততঃ হাতের মধ্যে যতখানি potency (সম্ভাব্যতা) আছে তার পুরো সুযোগ পাওয়া যায়। নাম-ধ্যানে vital current (প্রাণস্রোত) উদ্বেলিত ও পুষ্ট হ'য়ে ওঠে। এমন-কি নামের সাহায্যে বহু দুরারোগ্য রোগ সারান যায়, মুমূর্ষু রোগীকে বাঁচান যায়। কুষ্টিয়ায় ওরা অনেক করেছে।

শরৎদা—অনেকে বলে, ঠাকুর আগে কত কী দেখিয়েছেন, এখন আর তোমরা কী দেখছ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা miracle (সিদ্ধাই)-এর উপর নির্ভর করে, তাদের ভিত্তিই অজ্ঞতা, তারা বেশী দূর এগোতে পারে না। জগতে যা'-কিছু ঘটে তারই কারণ আছে, আমরা যেখানে কারণটা ধরতে পারি না, সেখানে সেইটেকে বলি অলৌকিক। অলৌকিকের উপর দাঁড়ালে টান হয় না, আর টান না হ'লে

মানুষের কোন লাভ হয় না। ধর্ম্মের সঙ্গে আছে ভক্তি, অনুরাগ, কর্ম্ম, জ্ঞান। এর ভিতর-দিয়ে প্রয়োজনমত সব আসে। ঝাড়ফুঁক, তুকতাকে বিশ্বাস কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাস নয়।

পূব দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ জানালাটা বন্ধ ক'রে দিতে বললেন।

এমন সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। কেষ্টদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসি-খুশি হ'য়ে বললেন—আসেন কেষ্টদা! বসেন।

কেষ্টদা ভিতরে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল সন্ধ্যায় হকসাহেব ব'লে একজন এসেছিল, লোকটি কিন্তু ভাল। আমার খুব ইচ্ছা করছিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আপনি কাজেকর্ম্মে ব্যস্ত আছেন ভেবে আর ডাকিনি।

কেষ্টদা—কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। কাল রাত্রেই আমি ভদ্রলোকের কথা শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন, সে খুব ভাল। Conference (অধিবেশন)-এর আগে ঘরোয়া বৈঠক যত বেশী হয়, মাথা-মাথা কর্ম্মীদের নিয়ে, ততই ভাল। মানুষের মাথায় জিনিসটা যত ধরিয়ে দেওয়া যায়, ততই কাজ সহজ হ'য়ে ওঠে। ধারণায় গোল থাকলে মানুষ কাজও সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না। আলাপ-আলোচনায় মানুষের মাথা সাফ হয়।

নূতন-নূতন কর্ম্মী, যাদের বাইরে নূতন-নূতন জেলায় পাঠাবেন, তাদের নিয়ে বার-বার বৈঠক করবেন, ভাল ক'রে equip (তৈরী) ক'রে ছেড়ে দেবেন। ওদের জামা-কাপড়, বিছানা, লেপ, কাঁথা, শীতবস্ত্রাদি আছে কিনা খোঁজ নেবেন, না থাকলে যথাসম্ভব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। প্রত্যেকে যা'তে শ্রেষ্ঠ-যাজী হয়, সে-কথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবেন। কর্ম্মী যারা বাইরে যাবে, তাদের আচার-আচরণ, চাল-চলন খুব দুরস্ত হওয়া চাই। তারা যদি সদাচারী না হয়, তাদের অভ্যাসগুলি যদি সুন্দর না হয়, ব্যবহার যদি শ্রদ্ধা-সন্দীপী না হয়, তাহ'লে মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

কেষ্টদা—অমি এইগুলির উপর খুব জোর দিচ্ছি। যেমন—ভোরে ওঠা, নিয়মিত নাম-ধ্যান করা, ব্যক্তিগতভাবে নিত্য কিছু পড়াশুনা করা, অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে পরিবেশের জন্য বাস্তবে কিছু করা ইত্যাদি। ওদের বলছি—আপনার যে-সব টোটকাগুলি দেওয়া আছে ঐগুলি টুকে রাখতে। এতে বহু মানুষকে সেবা দেওয়া যায়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে-সব ছড়া দেওয়া আছে

আপনার, সেগুলি সম্বন্ধেও ভাল ক'রে ওয়াকিবহাল ক'রে দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তো কাজের কাজ। একেই তো বলে আচার্য্য। আর, মুখে-মুখে ব'লে-ব'লে এমনভাবে তৈরী ক'রে দেবেন, যে যে-বিষয়েই, যে বাদ বা দর্শন সম্বন্ধেই প্রশ্ন করুক না কেন, তৎক্ষণাৎই যেন তার সহজ সমাধান দিতে পারে। যে-সব বই এদের পড়া প্রয়োজন, সে বইগুলিও এদের দিয়ে পড়িয়ে ফেলবেন। প'ড়ে কতটা হজম করলো, তা' আবার পরখ করবেন। প'ড়ে যেন note নেবার (প্রয়োজনীয় অংশ টোকার) অভ্যাস করে। আর, প্রত্যেকের অর্জ্জন-পটুত্ব যা'তে বৃদ্ধি পায়, তেমনভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলবেন। গাঁটের টাকা খরচ ক'রে ঘুরে-ফিরে যদি চ'লে আসে তাহ'লে তা'তে কিন্তু অভিজ্ঞতা বাড়ে না। সামান্য কিছু দিয়ে দিলেন। তাই নিয়ে বেরুলো, আর পথে-পথে মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা ক'রে, তাদের আপন ক'রে নিয়ে, তাদের প্রীতি-অবদানের উপর দাঁড়িয়ে হিল্লী-দিল্লী ঘুরে কাজ সমাধা ক'রে আসলো, এতে অনেকখানি বেশী শিক্ষা হয়। আপনারা আগে খালি হাতে বেরিয়ে কত কী সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসতেন। এর মধ্য-দিয়ে সব চেয়ে বেশী উপকার হয়েছে আপনাদের নিজেদের। টাকার উপর যদি দাঁড়াতেন, তাহ'লে কিন্তু তা' হতো না। কর্ম্মীদের মধ্যে নেবার আগ্রহের পরিবর্ত্তে দেবার আগ্রহকে যত ফুটিয়ে তুলতে পারবেন, ঐ আগ্রহই তা'দিগকে স্বাবলম্বী ও দক্ষ ক'রে তুলবে। আপনারা এইভাবে যখন ঘুরেছেন, বাইরের কত হোমরা-চোমরা লোক আপনাদের সাহায্য করতে পেরে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছে, আসার সময় ছাড়তে চায়নি, চোখের জলে বিদায় দিয়েছে। আপনাদের কাছে কত গল্প শুনেছি, শুনে একটা আত্ম-প্রসাদ অনুভব করতাম। মানুষকে আপন ক'রে পাওয়াই তো সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। গোপাল একবার দার্জ্জিলিং থেকে এসে গল্প করছিল, শুনে মনে হ'লো—একেবারে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ক'রে ফেলিছে।

কেষ্টদা—আশ্রমের এত কিছু যে গ'ড়ে উঠলো, সবই তো ভিক্ষার উপর, প্রীতি-অবদানের উপর। আপনি যতটুকু করিয়ে নিয়েছেন, তার উপর দাঁড়িয়ে এই বিশ্বাস হ'য়ে গেছে যে, টাকার অভাবে কিছু না-হওয়া থাকে না, অভাব যা', তা' কেবল মানুষের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাইতো ক্ষুধার্ত্তের মত আমি কেবল মানুষ খুঁজি। কি কন কেষ্টদা! আমার ক্ষুধা কি মিটবে না?

কেষ্টদা—আমরা যদি চারিদিকে ভাল ক'রে হাউড় দিতে পারি, তাহ'লে ভাল-ভাল মানুষ সব এসে পড়বে। মানুষ আছে বইকি? এত বড় একটা দেশে

মানুষ নেই, তা' কি হ'তে পারে ? যদি বাংলায় না জোটে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে চেষ্টা করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ম্লান হেসে)—সেই চেষ্টা করবার জন্য যে-ক'টা লোকের দরকার, তাই-ই যে জুটছে না।

কেষ্টদা—জুটে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তো তাই ভাবি। ঋষি, মহাপুরুষের দেশ যে একেবারে দেউলে হ'য়ে যাবে, এ বিশ্বাস আমার হয় না। কিন্তু সময় চ'লে যাচ্ছে, তাই ভয় হয়—সময়মত সব সামাল দেওয়া যাবে কিনা।

ইন্দুদা (বসু)—আমরা এই ভরসা রাখি যে, আপনি যখন মাথার উপর রয়েছেন তখন বেকায়দা কিছু হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' বলি তা' যদি কর, তাহ'লে বেকায়দা না হওয়াই সম্ভব, কিন্তু না করলে আমি তো নিরুপায়। তোমাদের প্রত্যেকের এমন হওয়া চাই যে, অন্য কোন consideration (বিবেচনা) যেন কাজের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে না পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার পাশ ফিরে বীরাসন ক'রে বসার মত বসলেন।

বঙ্কিমদা (রায়) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আব্দারের সুরে বললেন—আমার আরজীটা মনে আছে তো ? তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা ক'রে দাও লক্ষ্মী।

বঙ্কিমদা হেসে বললেন—আপনি যখন বলেছেন নিশ্চয়ই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই হ'লেই হয়।

বঙ্কিমদা—আপনি হুকুম করবেন, আমরা তামিল করব, সেইজন্যই তো এখানে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কি বায়নার অন্ত আছে ? তাই মাঝে-মাঝে সমীহ হয়। অবশ্য, আমার জন্য তাফাল স'য়ে যারা সুখী হয়, তাদের দেখে মনে হয়, তারাও ভাগ্যবান, আমিও ভাগ্যবান।

শরৎদা—আত্মসমর্পণের কথা বলে, কথাটা আত্মসমর্পণ, না, বৃত্তিসমর্পণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মসমর্পণ কথাটা আত্মসমর্পণের অন্তরায়, আত্মসমর্পণ তখনই হয়, যখন আমরা with all our passions (সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে) ইষ্টে interested (স্বার্থান্বিত) হই। ইষ্টে আপ্রাণ হ'লে মানুষ active evolving nature-এর হ'য়ে পড়ে অর্থাৎ সক্রিয় বিবর্ত্তনী স্বভাব-সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। আত্মসমর্পণ যে করে, সে টের পায় না যে সে আত্মসমর্পণ করেছে। ওই-ই তার কাছে একমাত্র জীবন, যার কল্পনা সে করতে পারে। অন্য কোন

প্রকার জীবন যে সম্ভব, তাই-ই তার মাথায় আসে না। তার বাঁচাটাই নিরর্থক মনে হয় প্রেষ্ঠকে বাদ দিয়ে। এর মধ্যে কোন তাত্ত্বিকতারই বালাই নেই। তার সত্তাই এই কথা কয়। মাছ যেমন বাঁচতে গেলে জলেই বাঁচে, ভক্তও তেমনি বাঁচতে গেলে ইষ্টেই বাঁচে, ইষ্টের জন্যই বাঁচে, নইলে সে বাঁচবে কী দিয়ে? বাঁচবে কী নিয়ে? (এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন)।

শরৎদা—আত্মা তো পূর্ণ। তার আবার বিবর্ত্তন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবাত্মার বিবর্ত্তন হয়, জীবাত্মা মানে প্রবৃত্তি-সমন্বিত আত্মা। জীব আবার বিভিন্ন স্তরের। যারা জীবকোটি, তাদের প্রবৃত্তি জীবনের উপর দিয়ে, ইষ্টের উপর দিয়েও প্রধান, ইষ্টও তাদের প্রবৃত্তি-পোষণের জন্য। আর, যারা ঈশ্বরকোটি, তাদের সুরত থাকে সম্যকভাবে আদর্শ-নিবদ্ধ, তারা সব প্রবৃত্তি দিয়েই ইষ্টের সেবা করে, যে-প্রবৃত্তি যেখানে ইষ্টসেবার অন্তরায় সৃষ্টি করে, সেখানেই তাকে নির্ম্মমভাবে পরিহার ক'রে চলে বা সহজেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোলে। ফলকথা, এমন কোন প্রবৃত্তি নেই, যা' ইষ্টসেবায় লাগান যায় না। গীতায় আছে, 'ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'। ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্য ধর্ম্মেরই অঙ্গ, ধর্ম্মেরই সাথিয়া। তারা অনর্থ তো সৃষ্টি করেই না, বরং জীবনকে সার্থক ক'রে তোলে। ঈশ্বরকোটি পুরুষ যারা, তাদের সব প্রবৃত্তিই ধর্ম্মানুগ হ'য়ে ওঠে, অর্থাৎ প্রবৃত্তির উপর আধিপত্য তাদের সহজ ও স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। এই আধিপত্য তাদের জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই বিস্তারলাভ করে। আর আধিপত্য মানেই, ধারণ-পালনী সম্বেগ-সমন্বিত আগ্রহ-উদগ্রীব সক্রিয়তা। তারা যে-কোন স্থানে পড়ুক না কেন, responsible (দায়িত্বশীল), active (সক্রিয়) leading position-এ (নেতৃত্বের পটভূমিতে) গিয়ে দাঁড়ায়, আবার সে-ও ইষ্টার্থে—আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নয়কো।

আস্তে-আস্তে রোদ উঠে গেল। আশ্রমের দাদারা ও মায়েরা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের স্বাস্থ্য, সুখ-সুবিধা, অসুবিধা ও কাজকর্ম্ম-সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। প্রেসের সংশ্লিষ্ট একজন কর্ম্মী তার অতিরিক্ত খাটুনির কথা বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ-মুখ ঘুরিয়ে তীব্র উদ্দীপনার সঙ্গে বললেন—শালা, কাজের কাছে হার মানবি কেন? বরং কাজই তোর কাছে হার মেনে যাবে। যত কাজই আসুক, তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে তুই তার উপরে উঠে দাঁড়াবি।

দাদাটি বললেন—শরীরে পেরে উঠি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজের মধ্যে বরং শরীর ভাল থাকে। অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু নজর দিবি। একটু দুধ-টুধ খাস্ তো? আর, কোন অসুখ-বিসুখ নেই তো?

উক্ত দাদা—অসুখ কিছু নেই। এমনি শরীর দুর্ব্বল লাগে। দুধ একটু ক'রে খাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে)—দুধ যদি হজম হয়, দুধ আর-একটু বাড়িয়ে দিলে পারিস্। দরকার হ'লে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিস্। আর, কাজকর্ম্ম একেবারে বাদ দিস্ না, তা'তে নিজেকে রোগী মনে হবে, ওতে আরো দুর্ব্বল বোধ করবি। স্বচ্ছন্দে যতটা পারিস্ কাজকর্ম্ম করিস্। অবশ্য তোর যদি ভাল লাগে।

দাদাটি হেসে বললেন—আপনি যেভাবে বলছেন, এতে তো কাজ করবার জন্য উৎসাহ-আগ্রহ হয়, কিন্তু কেউ যদি জোর ক'রে কাজ চাপাতে চায়, তাহ'লে যেন আর করতে ইচ্ছে করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—জোর ক'রে চাপালোই বা, এ তো তোর নিজের কাজ। নিজের স্বার্থের ব্যাপারে কেউ যদি তোর উপর জবরদস্তি ক'রে তোর ভাল করতে চায়, তা'তে কি তোর দুঃখ করার কিছু আছে?

দাদাটি এইবার খুব হাসিখুশি হ'য়ে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে কোন গলদ বা বিরুদ্ধভাব জমতে দিবি না। তা'তে দেখবি শরীর-মন দুই-ই চাঙ্গা থাকবে।

মন দুষ্ট হ'লেই জানিস্
রোগের আথাল হয়,

তারপর কি তো?—

প্রফুল্ল—ঐটেকে তুই এড়িয়ে গেলেই
করবি ব্যাধি জয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গাত্রোত্থান করলেন। মাতৃমন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় কিশোরীদার পরিচালনায় সমবেত বিনতি-প্রার্থনা সুরু হ'লো। অনেকেই সেখানে গিয়ে যোগদান করলেন। ভক্তগণের মিলিত প্রার্থনার সুর দূর-দূরান্তে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো। ধন্য হিমায়েতপুর, ধন্য সৎসঙ্গ আশ্রম, যেখানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অবিশ্রান্তভাবে প্রভাবিত হ'য়ে চলেছে ভাগবত লীলার অখণ্ড মন্দাকিনী-স্রোত। এই আশ্রমের প্রতিটি ধূলিকণাও কত পবিত্র। এই ধূলি অঙ্গে মেখে যুগযুগান্তে কত মানুষ

দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠবে। আসুন, এই মহাতীর্থ-বেদীতলে আমরা আভূমিলুণ্ঠিত প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় এসে বসলেন। একটু বাদে নবাব-মিস্ত্রী আসলো। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশদা ও বঙ্কিমদাকেও ডাকতে বললেন। শ্রীশদা ও বঙ্কিমদা আসলে, সকলকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে পোষ্ট অফিসের পাশে যেখানে ফিলান্থ্রপি অফিসের নূতন দালান উঠবে, সেই জায়গা দেখতে গেলেন। ক'টা ঘর হবে, বারান্দা কোন্ দিকে থাকবে, দরজা-জানালা কেমন হবে, কোন্ ঘর কতজনের উপযোগী হবে ইত্যাদি ব'লে সেইভাবে পরিকল্পনা করতে বললেন। নবাবকে বললেন—ভাল ক'রে বুঝে নিবি, পরে যেন কোন অসুবিধা না হয়। আর, দালান হওয়া চাই ছবির মত সুন্দর। একপাশ দিয়ে সিঁড়ি থাকবে। সেই সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে সেখানে যেন প্রয়োজনমত সভা-সমিতি করা যায়। বাড়ী যেন বেশ মজবুত হয়। প্রয়োজনমত যা'তে দোতালা করা যায়, তার ব্যবস্থা যেন থাকে।

নবাব বললো—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে এসে খেপুদার বারান্দায় বসলেন। বসে শ্রীশদাকে বললেন—এদিকের ব্যবস্থা খানিকদূর অগ্রসর হ'লে পঞ্জিকা দেখে গৃহারম্ভের দিন ঠিক ক'রে কাজ সুরু ক'রে দেন।

পাবনা কলেজের কয়েকটি ছাত্র বেড়াতে এসেছে, তাদের সঙ্গে ক্যামেরা আছে। তারা শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো তোলার অনুমতি চাইলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আচ্ছা।

তারা বললো—আপনি যেখানে ব'সে আছেন, ওখানে তো ফটো ভাল উঠবে না, যদি দয়া ক'রে রোদের দিকে বসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কোন ওজর-আপত্তি না ক'রে রোদের দিকে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বেঞ্চখানি সেখানে সরিয়ে দেওয়া হ'লো। তিনি বসলেন। তারপর ওরা ফটো তুলে নিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমরা কোথায় থাক? তোমাদের বাড়ী কোথায়?

ওরা বললো—আমরা হোষ্টেলে থাকি, আমাদের ক'জনের বাড়ী নাটোর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাটোরের কাঁচাগোল্লা খুব ভাল। তাই না?

একজন বলল—হ্যাঁ। তবে শুনি আগের মত জিনিস এখন পাওয়া যায় না। আগে আরো ভাল ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক জিনিসেই আজকাল ভেজাল ঢুকে যাচ্ছে। ভেজাল দিতে-দিতে খাঁটি জিনিস করবার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলছে। এটা জাতির পক্ষে সবদিক দিয়েই ক্ষতিকর।

উক্ত ভাই—মানুষ অভাবে প'ড়ে এমনতর করতে বাধ্য হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে বললেন)—আমার মনে হয় উল্টো। এমনতর বুদ্ধি যত ঢোকে, ততই মানুষ অভাবে পড়ে। মানুষের যদি সেবা-বুদ্ধি ও দক্ষতা দুই-ই থাকে, তাহ'লে তার অভাব না হবারই কথা। আর, দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা মানুষের আত্মমর্য্যাদার পক্ষেই অবমাননাকর। আগে মানুষ হামেসা বলতো—আমি অমুকের ছেলে, অমুকের নাতি, আমি কি কখনও এমন হীন কাজ করতে পারি? ঐ ধরণের কথা আজকালকার যুবকদের মধ্যে কমই শোনা যায়। পূর্ব্বপুরুষ-সম্বন্ধে গৌরববোধ মানুষের মধ্যে যদি তাজা থাকে, তাহ'লে তাদের ধারাটা, বিশেষতঃ তার মধ্যে সৎ ও শোভন যা', তা' ধ'রে রাখবার একটা আগ্রহ হয়। তা'তে মানুষ অনেকখানি ঠিক থাকে। তোমরা লেখাপড়া শিখছ, তোমরা ভাল ক'রে লাগলে দেশের হাওয়া ফিরিয়ে ফেলতে পার।

ছাত্রটি বলল—আমাদের আর ক্ষমতা কতটুকু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা যদি থাকে, অনুশীলন যদি কর, ক্ষমতার অভাব হবে না।

সে বিনীতভাবে বলল—সেই আশীর্ব্বাদই করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার আশীর্ব্বাদ আছেই।

এরপর ওরা প্রণাম ক'রে বিদায় নিল।

যাবার বেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুযোগ পেলে আবার এসো। ফাঁক পেলেই এসো।

ওরা সম্মতি জানালো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পর-পর কয়েকটি লেখা দিলেন।

দুপুরে মায়েদের বৈঠকে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ছেলে পৈতে নিয়েছে, সন্ধে-আহ্নিক ঠিক মত করে তো? প্রস্রাব ক'রে জলটল নেয় তো?

মা-টি বললেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব দিকে খুব নজর রাখবি। আর, খাদ্যখানা সম্বন্ধেও যেন খুব সাবধান থাকে, যেখানে-সেখানে যেন না খায়। দোকানে চা-টা খাওয়া মোটেই ভাল না। খানিকটা গোঁড়ামি থাকলে চরিত্রের একটা আঁট থাকে।

ফরিদপুরের একটি নবাগত মা জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা বরাবর লক্ষ্মীপূজা

করতাম, এখন দীক্ষা নিয়েছি, এখনও কি আমরা লক্ষ্মীপূজা করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারবি না কেন ? তবে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি বাদ দিয়ে কিন্তু নয়। এইগুলি ঠিক রেখে, তারপর যা' প্রাণে চায় করবি। লক্ষ্মীপূজার মধ্যে তো নাম করার ব্যাপার নেই, ফুলজল নৈবেদ্য দেওয়া, পাঁচালী পড়া—এই সব, সেটা স্বতন্ত্রভাবে করবি। নাম করার সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, এই নামের পর যেন অন্য কোন নাম না করা হয়। পূর্ব্বে যদি অন্য কোন নাম নেওয়া থাকে, আর সেটা যদি করতে ইচ্ছা করে, তবে আগে সেইটে ক'রে পরে এইটে করবে।

উক্ত মা—আমাদের বাড়ীতে রীতি আছে বিশেষ-বিশেষ তিথিতে ও বিশেষ-বিশেষ বারে বিশেষ-বিশেষ জিনিস খাওয়া হয় না, কিন্তু ছেলেরা তা' মানতে চায় না, এ-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি মানাই ভাল। কোন প্রথার মধ্যে ভাল-মন্দ কি আছে, না জেনে, না বুঝে, তা' ছাড়া ভাল না। যা' মানায় কোন লোকসান নেই, বরং না মানায় লোকসান হ'তে পারে, তা' মানাই ভাল। ভাল ক'রে অনুসন্ধান করলে এর মধ্যে জীবনীয় সম্পদ্ও মিলতে পারে। আমার মা বলতেন, "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

১০ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৪৮ (ইং ২৮।১২।৪১)

শীতের প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর পাবনা আশ্রমে বাঁধের ধারে টিনের তাম্বুতে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় ব'সে আছেন প্রীতিপ্রসন্নমুখে—স্নেহল, স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে। দিনের আলো এখনও দেখা দেয়নি, একটু ঘোর-ঘোর ভাব, পাখীর কাকলী ঊষার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে জাগরণী গান গাইছে—দূরবিসারী মাঠ থেকে হিমেল হাওয়া ভেসে আসছে। ঋত্বিক্-অধিবেশন আগতপ্রায়, বাইরে থেকে কর্ম্মীরা আসতে সুরু করেছেন, কয়েকজন গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকী ঘিরে বসলেন। কথা আরম্ভ হ'লো—

প্রফুল্ল—পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূল প্রভাব নিয়তির মত আমাদের পথে টেনে নিয়ে যায়—তাদের নিয়ে চলতে গিয়ে যে আমরা নিজেরাই বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়ি, তার প্রতিকার কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যবদনে বলতে লাগলেন—শাক্যসিংহ সেনের বাবা চন্দ্রশেখর সেনের কাছে গল্প শুনেছি—গ্রীন্‌ল্যাণ্ডে নাকি যখন-তখন দারুণ ঝড় ওঠে, সেই ঝড়ের সময় বাইরে থাকলে তার নাকি রক্ষা পাওয়াই মুশকিল, কিন্তু তাকে যদি কেউ উদ্ধার করতে যায়—তবে মাজায় নাকি একটা দড়ি বেঁধে যায়, সেই

দড়ির অন্যদিক ব'াধা থাকে ঘরের সঙ্গে। তখন সে সেই দড়ির সাহায্যে আবার ঘরে ফিরে আসতে পারে, অন্যকেও ঝড় থেকে ব'াচাতে পারে। আমরাও যদি তেমনি ইষ্টের সঙ্গে সমস্ত টান ও ঝোঁক নিয়ে ব'াধা থাকি, আমরা নিজেরা তো ব'াচতে পারিই, সঙ্গে-সঙ্গে প্রবৃত্তিমুখী মৃত্যুপথের পথিককে টেনে আনতে পারি।

একজন হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—জগতে যা'-কিছু হ'চ্ছে, ভগবানই তো মূলে, মানুষের হাত কোথায়, তিনি ইচ্ছা করলেই তো মানুষকে ভাল ক'রে গড়তে পারেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের হাতে মানে মানুষের হাতে। ছেলে বাপেরই সৃষ্টি, কিন্তু তা' সত্ত্বেও ছেলে স্বাধীন—তার স্বাধীন ইচ্ছায় সে বাপের অনুগত হ'য়েও চলতে পারে, বাপের বিরুদ্ধেও চলতে পারে। সেখানকারটাই এখানে হ'য়ে আছে—জানেন তো জগন্নাথ টুণ্ডা, হাত নেই, ধরতে পারে না, আমাদেরই হাত দিয়ে ধরতে হয় অর্থাৎ কোন মহাপুরুষ, কোন ভগবানই কারও কিছু করতে পারেন না, যদি কিনা তার tendency of attachment তাঁ'তে ligared না হয় (তার অনুরাগের টান দিয়ে সেই মহাপুরুষের সঙ্গে যুক্ত না হয়)।

সতীশদা—করলেই যদি হয়, ভালটা করি না কেন, তা'তেই তো সুবিধা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আমার দুঃখটা ভোগ করবে কে ? আমরা যে দুঃখ-বিলাসীর দল, মতলব ক'রে দুষ্টু চলনায় চলব, জীবনের বিধিকে অনুসরণ করব না, আর 'ভগবান' 'ঠাকুর' ইত্যাদি ব'লে অনুযোগের কান্না কাঁদব—এ-সব কপট ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত ভক্তের মধ্যে নীচস্বার্থযুক্ত লোলুপ হীনত্ববোধ থাকে না, ভালবাসার স্বরূপই তা' নয়। চাওয়া-পাওয়ার বালাই তার নেই, তার সর্ব্বশক্তি দিয়ে সে প্রেষ্ঠপূরণের ধান্ধায় পাগল, এতে যায় তার সব অপারগতা ঘুচে, সে হয় সার্থককর্ম্মা, আশাবাদী, সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ, আত্মপ্রত্যয়ে অটুট। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

আমারে ঈশ্বর ভাবে আপনারে হীন
তার প্রেমে কভু আমি না হই অধীন।

আর-একটা কথা আছে—

প্রভু প্রভু বলিস্ তুই দাস হলি তুই কবে
মেটে গর্ব্বে ফেটে মরিস্ বিভবের বৈভবে।

এই তো ব্যাপার।

কথার পর কথা, নানা কথা উঠতে লাগলো। কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতে লাগলেন—

এখন আমাদের বিশেষ ক'রে দরকার platform work—আমার কথা লোকের দরজায় গিয়ে নানান ধাঁজে পরিবেষণ করুন, মানুষগুলিকে integrated ও consolidated (যুক্ত ও সংহত) ক'রে তুলুন—তখন দেখবেন, সব sprout ক'রে (গজিয়ে) উঠবে, common Ideal-এ (এক আদর্শে) interested (অন্তরাসী) না ক'রে তুলে আন্দোলন যেন বালুর ডেলা,—তার স্থায়িত্ব কি ? Cementing force (সম্মিলনী শক্তি) কোথায় ? দেশে যত group (দল), যত পন্থীই থাক্ না কেন—সবাই হবে for the Ideal (আদর্শার্থে)। পরস্পরকে consolidated (সংহত) ক'রে তুলতে হবে যা'তে বোঝা যায়—আমি মানে এতগুলি, বোঝা যায় জোর, মনে হয় বীর।

অনুলোমের প্রবর্ত্তন ক'রে প্রতিলোম-প্রথা তুলে দিতে হয়, সঙ্গে-সঙ্গে চাই অভ্যাস, ব্যবহার, ঝোঁককে নিয়ন্ত্রিত ক'রে কার্য্যকরী শিক্ষা আর agricultural ও industrial activity launch (কৃষি ও শিল্পের প্রবর্ত্তন) ক'রে profitable becoming (উপচয়ী বিবর্দ্ধন)-এ যেতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে যা'-যা' প্রয়োজন তা' হাতে-কলমে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করতে হবে, কৃষি থেকে কৃষিজাত শিল্প হবে, instrument (যন্ত্র) দোয়াড়ে পরিবেষণ করা লাগবে, তাহ'লে কাণ্ড যা' হয়—তা' আর কওয়া যায় না। এর জন্য গোড়ায় দরকার প্রত্যেক জেলায়-জেলায় উপযুক্ত কর্ম্মী।

Consolidation (সংহতি)-সম্পর্কে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কয়েকটা মানুষ যদি ঠিক-ঠিকভাবে consolidated (সংহত) হ'য়ে ওঠে, তবে আর ভাবতে হয় না। যতগুলি আসে, সেই আওতায় ফেলে ঠিক ক'রে নেওয়া যায়।

অন্যান্য কথার পর শরৎদা কথা তুললেন—আপনার কাছে আগে বলেছি, আজও বলছি—সমাজতন্ত্রীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার মানে না। এর উত্তর কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার স্বাতন্ত্র্য ও সহজাত-সংস্কার নিয়েই তো আমার আমিত্ব—তাই খাটিয়েই তো আমার দুনিয়ায় চলা, এমন প্রতি-প্রত্যেকটি আমি নিয়েই তো সমাজ ও রাষ্ট্র। আমার activity (কর্ম্ম) ও service (সেবা)-এর প্রয়োজন যদি সমাজের থাকে তবে সে-সমাজের আমার interest (স্বার্থ), incentive (প্রেরণা), evolution (বিবর্ত্তন), enjoyment (উপভোগ) ও প্রতিষ্ঠা দেখবারও প্রয়োজন আছে। আর, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সন্তান হবে না কেন, তা' তো বুঝতে পারি না। বাপের চোখ-মুখের চেহারা, নানা

দোষগুণ—মায় syphilis (সিফিলিস) থাকলে তা' পর্য্যন্ত বিধির বশে সন্তানে বর্ত্তাবে—আর তার অর্জ্জিত ধন-সম্পদ্ তা'তে বর্ত্তাতে পারবে না—সে কেমন কথা ? সন্তান আত্মজ, তার মানে পিতারই continuation (ক্রমাগতি)—নানা রকমে সে নিজেকে অভিব্যক্ত করতে করতে চলেছে—তাই তাকে সন্তান বলে। সন্তান মানেই হ'চ্ছে বিস্তৃত হ'য়ে চলা। মাথার দলিল, রক্তের দলিল যদি উল্টাতে পার, তখন আইনগত কাজের দলিল উল্টাতে চেষ্টা করো। আর, এ-প্রথা উঠিয়ে দিলে মানুষ কাজে তেমন জোর পাবে না—তার স্বভাব হ'লো—সে মুছে যেতে চায় না, লুপ্ত হ'তে চায় না—যাদের সে ভালবাসে তাদের মধ্যে সে বেঁচে থাকতে চায়—তার অর্জ্জিত ধন বংশপরম্পরার ভিতর-দিয়ে অনন্তকাল ধ'রে ভোগ করতে চায়—এ সহজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'লে তার আট থাকবে না। যে-সব অসুবিধার কথা ভেবে socialist-রা এ-কথা বলে—তার প্রতিকার এটাকে উঠিয়ে দিয়ে নয়, বরং স্বস্ত্যয়নী ইষ্টোত্তর বেশী ক'রে রেখে সন্তানদের স্বস্ত্যয়নী-ব্রতধারী সেবাইতরূপে নিয়োগ ক'রে তা' হ'তে পারে। মূল গণ্ডগোল বেধেছে বর্ণবিধানের গণ্ডগোলে এবং বিয়ের গোলমালে—তাই আজ কত pauperistic ism (দৈন্যপীড়িত বাদ) গ'ড়ে উঠছে। বৈশিষ্ট্যানুসরণ, আদর্শানুসরণ, পারিপার্শ্বিকের সেবা, জীবিকার্জ্জন—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সব ছিল আমাদের আর্য্য-বিধানে একসূত্রে গাঁথা—হীনতাবোধের বালাই ছিল না। অযথা প্রতিযোগিতা বা পরস্পরের মুখের গ্রাস কাড়ার ভয় বা অসংযত লালসা ছিল না, টাকা তখন মানুষ ছাপিয়ে ওঠেনি, বেকার-সমস্যা ভয়াল হয়নি, সুষ্ঠু বর্ণবিধানের ফলে সমাজ ছিল সুস্থ, স্বস্থ—আজ আমরা সে-অবস্থা কল্পনাও করতে পারি না। আর পঞ্চাশ হাজার উকিলের দেশে কী দরকার ? লক্ষ-লক্ষ বিপ্র আজ শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন ক'রে চলেছে, তারা যদি যথাযথভাবে বিপ্রবৃত্তি নিয়ে থাকতো, বামনাই কাজ করতো, ঋত্বিকতা করতো—তবে ইষ্ট বাঁচতো, কৃষ্টি বাঁচতো, তারা বাঁচতো, দেশশুদ্ধ বাঁচাতে পারতো। তারা প্রত্যেকের পিছনে lovingly (প্রীতির সঙ্গে) হানা দিয়ে sexual life (যৌন-জীবন) থেকে public life (সমাজজীবন) পর্য্যন্ত সবদিক থেকে right channel-এ (ঠিক পথে) যদি goad (চালনা) করতো, তবে দেশ কি এতখানি পড়তে পারতো ? Pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি) দেশ থেকে ছুটে পালাতে বাধ্য হ'তো, এমন-কি ঢুকতেই অবকাশ পেতো না।

কেষ্টদা ঈশ-উপনিষদের একটা শ্লোকের মানে জিজ্ঞাসা করলেন—

"আত্মন্যেবানুপশ্যতি················ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে অন্যের অবস্থায় ফেলে সে হ'য়ে গিয়ে সেই চোখে তাকে ও নিজেকে দেখা, এবং নিজের দাঁড়ায় নিজের মত ক'রে অন্যকে দেখা—এই দুই দিক দেখলেই দেখা সম্পূর্ণ হয়। যেমন, আমার দাঁড়ায় ফেলে কুলিদের দেখেছিলাম এবং কুলিদের অবস্থায় কুলিদের মধ্যে মিশে কাজ ক'রে কুলিদের ও নিজেকে দেখেছিলাম, এতে ব্যাপারটা আমার পুরোপুরি বোঝা হয়েছিল। ওদের সঙ্গে মিশে বুঝেছিলাম—আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেদের stand (দাঁড়া) থেকে ভেবে ওদের যা' problem (সমস্যা) মনে করি, তা' আদৌ ওদের problem (সমস্যা) নয়। তাই সম্যকভাবে না দেখে যারা দরদী হ'য়ে ওদের জন্য movement (আন্দোলন) করতে যায়—তারা ওদের নিগূঢ় সমস্যা বোঝেও না, প্রতিকারও করতে পারে না। সব ক্ষেত্রেই এই রকম।

ভক্তের লক্ষণ কী, শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথাপ্রসঙ্গে বললেন—প্রকৃত ভক্তকে দেখলেই তার প্রেষ্ঠকে মনে পড়বে, তার কথাবার্ত্তা, আচার-আচরণ হয় বুককাড়া, মনকাড়া।

ঋত্বিক্‌দের কেমনভাবে শিক্ষিত হ'য়ে ওঠা উচিত, সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঋত্বিক্‌দের সব বিষয়ে thorough practical knowledge, thorough conception (সুসম্পূর্ণ কার্যকরী জ্ঞান ও ধারণা) থাকা চাই, যা'তে যে-কোন affair (ব্যাপার), situation (অবস্থা) বা topic (বিষয়)-কে masterfully deal (আধিপত্যের সঙ্গে চালনা) ক'রে ইষ্টস্বার্থ, ইষ্টপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।

আমিষ ও নিরামিষ আহার-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাছ খাওয়া না-খাওয়া দুটোই আমি ভাল ক'রে দেখেছি, ভাবলাম—মাছ খাওয়া বজায় রাখা যায় কিনা। মাছ না খেয়ে নাম ক'রে দেখেছি, অল্পতেই কেমন তরতর ক'রে মন উপরে উঠে যেত; আর যখন মাছ খেয়েছি, নাম করেছি, কিন্তু কী যেন রাহুর মত ঠেসে ধরত, ধারাটা কেটে যেত, continuity (ক্রমাগতি) কিছুতেই বজায় রাখতে পারতাম না, fatigue (ক্লান্তি) এসে ঘিরে ধরতো। যারা মাছ খায় না তারা সাধারণতঃ ছোটখাট ব্যারামে vitally injured (গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত) হয় না। মাছ খেলেই শরীরে যে toxin (বিষ) জন্মে, তা' আমি প্রস্রাব দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। সেই প্রস্রাব কয়েকদিন এক জায়গায় পড়লে সেখানকার গাছ, ঘাস জ্ব'লে যেত; ছয় মাস মাছ না খাওয়ার পর দেখেছি, সে-প্রস্রাবে তেমন হয়নি। মাছে তো এই করে আর অধিক ভোজন activity (কর্ম্মক্ষমতা)

নষ্ট করে, চিন্তার flow (প্রবাহ) কমিয়ে দেয়।

ধ্যান-সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধ্যান মানে লোকে বোঝে না, অযথা কসরৎ করে। Fixation (ত্রাটক) মানুষকে মূঢ় করে—আর লোকে সাধারণতঃ ধ্যান বলতে fixation (ত্রাটক) বোঝে। Fixation (ত্রাটক) এবং concentration (একাগ্রতা) এ দুইয়ে আকাশ-পাতাল ফারাক; concentration (একাগ্রতা)-কেই প্রকৃত ধ্যান বলে। Concentration (একাগ্রতা) মানে centre (কেন্দ্র)-সম্বন্ধীয় চিন্তা—এতে মনের দুনিয়া ও বাইরের দুনিয়ার সমস্ত বিরোধ ও অর্থহীন, সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন বৈচিত্র্য ইষ্ট-সম্পর্কে সম্পর্কিত হ'য়ে জীবনটাকে সার্থক ক'রে তোলে।

শিক্ষা-সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুকূল পোষণ না পাওয়ার দরুন মানুষের কত instinct (সহজাত সংস্কার) যে stunted (খর্ব্ব) হ'য়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই, তাই আজ দেশে একটা আস্ত গোটা মানুষ পাওয়া ভার—সবাই যেন ভাঙ্গাচোরা, বাড়তির পথে কত কী যেন gap (ফাঁক) প'ড়ে গেছে, বাদ প'ড়ে গেছে, গোঁজা মেরে-মেরে না দিলে যেন খাড়া হ'য়ে সব অবস্থায় চলতে পারে না, যখন-তখন নুইয়ে পড়ে। কলকাতার মত সহরে ছেলেপেলেদের কত instinct (সহজাত সংস্কার) উঠে কেঁদে-কেঁদে ফিরে যায়, জীবনের মাল-মসলা অযথা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের আশ্রমে কেমন শিক্ষার আবহাওয়া গ'ড়ে উঠেছিল—বিচিত্র কাজ-কর্ম্ম, গবেষণা ও আলোচনার স্রোতে শিক্ষা দক্ষিণা হাওয়ার মত বইত—শুধু ঘুরে বেড়িয়েই মানুষ কত শিক্ষা লাভ করতো।

সদ্‌গুরুর আনুকূল্য-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে সহায় থাকলে সদ্‌গুরু সহায় হন। সদ্‌গুরুর প্রতি টান আসে তাঁর প্রীতিজনক কর্ম্মে। সেই কর্ম্মপথের যত অন্তরায় সে অতিক্রম করে পরম তৃপ্তিভরে, আত্মপ্রসাদ কানায়-কানায় তার মনকে ভ'রে তোলে, যে-কাজ সে ধরে তা'তেই জয়যুক্ত হয়—কৃতকার্য্যতা প্রতিপদক্ষেপে তাকে অনুসরণ করে, গু ধরলে তার হাতে প'ড়ে সোনা হ'য়ে যায়, চারিদিকে ধন্য-ধন্য প'ড়ে যায়। পারিপার্শ্বিকের ইষ্টপ্রাণ সেবা তার স্বভাবসিদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ায়—দেখতে-দেখতে অর্থ, মান, যশ তাকে ঘিরে ধরে, লোকে বলে অদৃষ্ট—তাই বটে।

পারিপার্শ্বিককে সন্তুষ্ট করা যায় কেমন ক'রে সেই বিষয়ে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিপার্শ্বিককে সন্তুষ্ট কর, সে আবার কী কথা? পারি-পার্শ্বিককে সন্তুষ্ট করতে গেলেই সর্ব্বনাশ, এক-একজন এক-এক ফরমাজ করবে,

আর তাই তুমি তামিল করতে যাবে—তবে তো তুমি গিয়েছ। পারিপার্শ্বিকেরা করবে ইষ্টানুগ সেবা ও সম্বর্দ্ধনা—তা'তে তুমিও বাঁচবে, তা'রাও বাঁচবে। শুনেছি, একদিন একটা লোক এক গাধার পিঠে চ'ড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, একজন দেখে বললে—'সে কি, তুমি গাধার পিঠে চ'ড়ে যাচ্ছ? তোমার মত লোক তো দেখিনি।' সে ভাবলে, কাজটা অন্যায় হয়েছে, তাই গাধার পিঠ থেকে নেমে হাঁটিয়ে নিয়ে চলতে থাকলো। কিছুদূর যাবার পর আর একজন বললে—'ছি! ছি! গাধাটাকে কষ্ট দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, তুমি কেমন মানুষ গা?' সে ভাবলে তাই তো! এই ভেবে সে গাধার হাত-পা বেঁধে নিজের কাঁধে ক'রে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। এতে গাধা ও তার দুরবস্থার আর সীমা রইল না। কোন principle (আদর্শ)-এর দিক না চেয়ে পারিপার্শ্বিককে খুশি করতে গেলে এমনতর দশাই হয়।

১২ই পৌষ, শনিবার, ১৩৪৮ (ইং ২৭।১২।৪১)

দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ভরা মানুষের জীবন। তার আদি, অন্ত দুই-ই অজানা। তার মাঝখানকার স্থূল বাস্তব যেটা তা-ও অর্থপূর্ণ হ'য়ে ধরা দেয় না। তাই মানুষ যখন বেত্তাপুরুষের সন্ধান পায়, তখন অবুঝের মত তাঁর কাছে বার-বার প্রশ্ন করে। তার ধারণা, প্রশ্নের জবাব শুনে সে সবটুকু বুঝে যাবে, হৃদয়ঙ্গম করবে। কিন্তু তা' হয় না। তিনি বলেন—ক'রে জানতে, তাঁর নির্দ্দেশমত আমরা করার পথে যতটুকু অগ্রসর হই ততটুকুই জানতে পারি। অজানার দিগন্ত আমাদের সামনে প্রসারিত হ'য়েই থাকে, তাই প্রশ্নের অবধি থাকে না। রাত্রি অপগত হ'তে না হ'তেই তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বাঁধের ধারে তাসুতে জিজ্ঞাসুর দল এসে ভিড় ক'রে বসেছেন। মাঝে-মাঝে কাকলী শোনা যাচ্ছে, ঝিলের ওপাশটায় কুয়াসায় ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখাচ্ছে। ওদিকের চর যেন অনেকখানি মুছে গেছে।

শরৎদা (হালদার) নাম-সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানায় বসা। ডান পায়ের নীচে একটি কোল-বালিস, গায়ে পাতলা কাঁথা জড়ান। স্ফূর্ত্তিযুক্তভাবে ব'লে চললেন—নাম হ'লো কারণস্বরূপের স্পন্দনাত্মক প্রতিচ্ছবি। আপনি, আমি, দুনিয়ার যা-কিছুই কিন্তু ঐ নামেরই বিবর্ত্তিত রূপ। কারণরূপী যিনি তিনিই সূক্ষ্ম ও স্থূলে পর্য্যবসিত হয়েছেন। সৃজন-ধারার কথা ভাবতে গেলেই পুরুষ-প্রকৃতির কথা আসে, বিজ্ঞানে বলে positive (ঋজী), negative (রিচী)-এর কথা। এই দুইয়ের মধ্যে আছে

আকর্ষণ, বিকর্ষণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ। তার মধ্য-দিয়েই লীলায়িত হ'য়ে ওঠে স্পন্দন। স্পন্দনে-স্পন্দনে আবার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। এইভাবে পারস্পরিক সংঘাত ও সংযোগ-বিয়োগের ভিতর-দিয়ে সৃষ্টি গুণিত হ'য়ে চলে—ছন্দায়িত তালে। এক-একটির ছন্দ এক-এক রকম, তাই আমরা দেখতে পাই, সৃষ্টির কোন দুটি জিনিস একরকম নয়, প্রত্যেকটিই বিশিষ্ট। সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যের এই গুচ্ছকেই বলা হয় বর্ণ, তাই বর্ণ জিনিসটা কিন্তু মানুষের তৈরী নয়। এটা সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত। ফলকথা, বৈশিষ্ট্যবান স্পন্দনের ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিপ্লব চলছে দুনিয়াময়। তার মধ্য-দিয়েই সৃষ্টি নিত্য-নবীনভাবে উৎসারিত হ'চ্ছে—কারণ হ'তে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলে। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম ও কারণ-রাজ্যে যদি যেতে হয়, তবে যে স্পন্দন নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও রকমারির ভিতর-দিয়ে এত পথ বেয়ে আজ এই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে অনুসরণ ক'রেই যেতে হবে। নাম হ'লো সেই স্পন্দনেরই প্রাণবীজ, যে-কোন স্পন্দনের মরকোচ আছে এই নামের মধ্যে। তাই একে বলা হয় অনামী নাম। এই নাম যদি ঠিক-ঠিক ভাবে অনুশীলন করেন—নামীর প্রতি অনুরাগ নিয়ে, তবে আপনার সমস্ত অতীত আপনার সামনে উদ্ভাসিত ও উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে উঠবে। আপনি একেবারে মূলে চ'লে যেতে পারবেন। যেমন ধরেন, আপনার সামনে একগাছ দড়ি প'ড়ে আছে, সেই দড়িটা বাঁধা আছে দূরে একটা গাছের সঙ্গে, কোন্ গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে, তা' যদি আপনি জানতে চান, এই দড়িটা ধ'রে এগিয়ে গেলেই তা' জানতে পারবেন। নাম ও নামীও তেমনি এই অজানাপথে আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—নামী লাগবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামী হলেন তিনি যিনি নামের চেতন মূর্ত্ত প্রতীক বা নামকে উপলব্ধি করেছেন জীবনে, এক-কথায় নাম যাঁর মধ্যে জীবন্ত, বাস্তবায়িত, আয়ত্তীকৃত। নামের উপলব্ধির উপর দাঁড়িয়ে বিশ্বের যা-কিছুই তাঁর কাছে ব্যাখ্যাত ও অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে—করা, বলা, ভাবার সুসঙ্গত-সমন্বয়ে, সপরিবেশ জীবন-বৃদ্ধির সার্থকতায়। নামকে যদি এমনভাবে আমার জীবনে সার্থক ক'রে তুলতে চাই, তবে ঐ নামীকে অনুসরণ ক'রেই তা' সম্ভব। নাম আমার মধ্যে জীয়ন্তই হ'য়ে উঠবে না ঐ নামীর সঙ্গে যোগ ছাড়া। তাই বলে—তজ্জপস্তদর্থভাবনঞ্চ। তদর্থভাবনা মানে নাম যাঁতে সার্থক হয়েছে, নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তেমন-তর হ'য়ে ওঠা, ভাবনার মধ্যে আছে হওয়া, শুধু চিন্তা নয়। আমার কিছু হ'তে গেলে তাঁর জীবন্ত রূপটি আমার সামনে থাকা চাই। তাঁর নির্দ্দেশমত

চ'লেই আমি তবে সহজে হ'তে পারব—আমার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আমি যেমন হ'তে পারি। এর মূল জিনিস হ'লো, তাঁতে, সক্রিয় প্রাণের যোগ, টানের যোগ। তাই দেখুন নামীর প্রয়োজন কোথায়।

চুনিদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, কী খবর ?

চুনিদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা কোথায় রে ?

চুনিদা—ঘরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি করে ?

চুনিদা—পড়ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্মিতহাস্যে)—পড়ার নেশা আর কেষ্টদার কমে না।

প্যারীদা (নন্দী)—ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যানের সার্থকতা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের বাহ্যিক চেহারাটা তার ভিতরেরই প্রতিচ্ছবি। জ্ঞানময়, চিরচেতন যিনি, তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান করতে-করতে তাঁর অন্তরের সম্পদ্‌ও আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। আর, ধ্যান মানে শুধু ইষ্টের চেহারা চিন্তা করা নয়, তাঁর চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, চাহিদা, পছন্দ, নির্দ্দেশ সব-সম্বন্ধেই চিন্তা করা লাগে, এবং নিজেকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এক কথায়, ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠামূলক চিন্তাই ধ্যান। আমার মধ্যে ভাল-মন্দ যা'-কিছু থাক্, তা' কেমন ক'রে ইষ্টানুকূল ক'রে তুলব, সেই চিন্তাই ধ্যান, শুধু চিন্তা ক'রে ক্ষান্ত হ'লে চলবে না, বাস্তবে সেইভাবে চলতে হবে। তা'তেই ধ্যানের সার্থকতা।

প্যারীদা—ধ্যানের সময় তো অনেক আজে-বাজে চিন্তা আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-চিন্তাই আসুক না কেন, কোনোটাকে জোর ক'রে চাপা দিতে নেই। তোমার চিত্তজগতে ইষ্টের সঙ্গে অনন্বিত যাই থাক না কেন, তাকে ইষ্টে অন্বিত ক'রে তোলাই তোমার কাজ। যেটাকে তা' না করতে পার, তাকে প্রত্যাহার করবে, পরিবর্জ্জন করবে। ইষ্টের প্রতি টান থাকলে তা' আদৌ কষ্টকর মনে হবে না। ধর, একজনের প্রতি তুমি রূঢ় ব্যবহার করেছ। কিন্তু অভিমানের দরুন তার কাছে যে তুমি ক্ষমা চাইবে, তা' পারছ না। ধ্যান করতে ব'সে সেই কথাটা তোমাকে পীড়া দিচ্ছে। যখন এটা ধরা পড়লো, তোমার উচিত, সব অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে যথাসত্বর তার সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলা। এইভাবে গলদ ক'মে যায়, কোন প্রবৃত্তিই আর ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষের শক্তি ও আনন্দ বেড়ে যায়। যে নিজেকে

এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করাও তার পক্ষে সহজ হয়। সেইজন্য নিজের কোন দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করতে নেই।

ফরিদপুর থেকে নিবারণদা (চক্রবর্ত্তী) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেই উল্লসিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি নিবারণদা! কখন আসলেন? হাতে ও কী?

নিবারণদা—এই আসছি। আপনার জন্য দেশ থেকে কিছু ভাল পাটালি নিয়ে আসছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখি কেমন পাটালি?

নিবারণদা পাত্রটা খুলে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখে তো মনে হয় খাসা মাল। যান, বড়বৌকে দিয়ে আসেন গিয়ে, যদি পায়েস-টায়েস করে।

নিবারণদা—গন্ধও খুব ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর কবেন না। দেখেই আমার মন অস্থির। (এই ব'লে শিশুর মত সরল আনন্দে হাসতে লাগলেন)।

নিবারণদা পাটালি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে পৌঁছে দিয়ে আবার এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার চেহারাটা যেন একটু কাহিল দেখছি।

নিবারণদা—মাঝে জ্বর হয়েছিল, সেই থেকে শরীরটা আর ফিরছে না, পেটটাও ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারীকে দেখাবেন, ও দেখেশুনে আপনাকে একটা ওষুধ ঠিক ক'রে দেবে। প্যারী! ফাঁক-মত দেখিস্ তো!

প্যারীদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিবারণদা! আপনি ডুব-সাঁতার কাটতে পারেন না?

নিবারণদা—পারি। আজকাল আর তেমন অভ্যাস নাই, একসময় খুব পারতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক ডুবে কতদূর যাবের পারেন?

নিবারণদা—তা' বোধহয় ২০।২৫ হাত পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাঁতার কাটা, বেড়ান, দৌড়ান—এ-সব অভ্যাস রাখা ভাল। মাটিকাটা, বাগান-করা—এ-সবও করবেন। শারীরিক পরিশ্রম বাদ দেবেন না। তাহ'লে আমার মত অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়বেন। আর, আপনি তো ঋত্বিক্-মানুষ, গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে যাজন-টাজন করবেন। যাজন খুব ভাল জিনিস, ওতে শরীর-মন চাঙ্গা থাকে। ওরা একটা বই প'ড়ে শুনিয়েছিল—ধর্ম্মযাজকরা নাকি সবচেয়ে দীর্ঘায়ু হয়।

নিবারণদা—বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে শরীর-মন দুই-ই যেন নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে। আগের মত উৎসাহ লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (দৃপ্ত উল্লাসে)—উৎসাহ-আনন্দের চাবিকাঠি আপনার হাতেই আছে। সেই পথে চললেই হয়। মানুষের যা'তে ভাল হয়, মানুষ যা'তে ইষ্টমুখী হয়, সবদিক দিয়ে উন্নতিলাভ করে, সেই ধান্ধা নিয়ে চলুন, করুন, দেখবেন—উৎসাহের জোয়ার ব'য়ে যাবে। অমৃতের সন্তান আমরা, অমৃত পরিবেষণে যতই ব্যাপৃত থাকব, ততই রোগ-শোক-জরা দূরে হ'টে যাবে। কি বলেন নিবারণদা? জীবন এইভাবে কাটান ভাল না?

নিবারণদা—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনার কথায় এখনই যেন একটু গায় জোর লাগতেছে, আশার আলো দেখতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মন যে-ঘাটে বেঁধে রাখি, সেই ঘাটেই বিচরণ করতে থাকে। নৈরাশ্যের ঘাটে বেঁধে সত্তাটাকে নিপীড়িত ক'রে লাভ কী? আর, তা'তে আমাদের স্বার্থই বা কোথায়? তাই জীবনের স্বার্থে, বাঁচার স্বার্থে ইষ্টীপূত আশা, আনন্দ ও উদ্দীপনাকে জীইয়ে রাখতে হয়। আশাবাদী যে, সে বিপদের কালোমেঘের মধ্যেও সম্পদের সুবর্ণলেখা দেখতে পায়, আর তাই-ই তাকে চেতিয়ে রাখে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় সবার চোখ-মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদার দিকে চেয়ে বললেন—একটু তামুক খাওয়াও।

প্যারীদা তামাক সেজে দিলেন।

আস্তে-আস্তে অনেকে এসে হাজির হলেন।

বাইরে একটি বৃদ্ধা মা ব'সে আছেন, তাঁর গা-ঘেসে একটি গরু এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে তাড়ালেও সে সরছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না তাড়িয়ে ওকে একটু আদর কর। ও বলছে, আমি তোমার কাছে এসেছি, আমাকে তাড়িও না, বরং আমাকে একটু সোহাগ কর।············ সোহাগখোর কেউ কম নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই নীরবে হাসতে লাগলেন।

মা'টি গরুটার গলায় হাত বুলিয়ে দিলেন। গরুটা আরো গলা বাড়িয়ে দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখছিস্ তো! কেমন খুশি হয়েছে। একেই বলে অনুসন্ধিৎসু সেবা। এই অনুসন্ধিৎসু সেবা যদি থাকে তবে শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু, গাছপালাকেও বশ করা যায়।

উক্ত মা—গাছপালাকে বশ করা মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখিস্‌নি ? এক-এক জনের যত্নে গাছপালা বেশী ফল দেয়। যে বুঝে-বুঝে দরদের সঙ্গে গাছের সেবা করে, তার হাতে ফলন বেশী হয়। গাছেরও কৃতজ্ঞতা আছে, সে ঐ ভালবাসা ও যত্নের প্রতিদান দিতে চায়, সুস্থ-সজীব থেকে, বেশী ফল ফলিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে বিছানায় বসেছিলেন, এবার পা-দু'টি নীচেয় ঝুলিয়ে দিলেন। প্যারীদা পা-দুখানি ঘ'সে দিতে লাগলেন। পা ঘসতে-ঘসতে প্যারীদা জিজ্ঞাসা করলেন—পুরুষোত্তমের অবর্ত্তমানে মানুষ সাধন-ভজন করবে কিভাবে ? তখন ধ্যান করবে কাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষোত্তমই মানুষের ইষ্ট। পুরুষোত্তমই ধ্যেয়। তিনি চ'লে গেলে পুরুষোত্তমের অনুগামী ঋত্বিকের কাছ-থেকে পুরুষোত্তম-প্রবর্ত্তিত দীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে ঐ পুরুষোত্তমেরই অনুসরণ করবে, ঐ পুরুষোত্তমকেই ধ্যান করবে, যাবৎ পুনরায় তাঁর আবির্ভাব না হয়। পরবর্ত্তী আসলে আবার তাঁকে গ্রহণ করবে, কারণ, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তীরই নব কলেবর।

বিমলদা (মুখোপাধ্যায়)—একটা কথা শুনি—'যা' আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা' আছে ভাণ্ডে'। তার মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা' আছে, তা' আমাদের শরীরেই আছে। যে-সব উপাদানের সমবায়ে ও সমাবেশে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত হয়েছে, তা' সংহতভাবে আমাদের দেহবিধানেই আছে। নাম-ধ্যান, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের সাহায্যে যখন আমরা আমাদের সত্তাটাকে সমগ্রভাবে জানতে পারি, তখন বিশ্বব্যাপারের যা'-কিছুও আমরা সহজে জানতে পারি। শরীরের একটা কোষ, কি একটা বালুকণাকেও যদি আদ্যন্ত সামগ্রিকভাবে জানা যায়, তার মধ্য-দিয়েও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হয়। জগতে কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়, একটাকে পুরোপুরি জানতে গেলে সেই সঙ্গে সব-কিছুর জ্ঞান এসে পড়ে। কোন-কিছুকে পুরোপুরি জানা মানে তার সঙ্গে অন্য যা'-কিছুর সঙ্গতি ও সম্পর্ক শুদ্ধ জানা। সেইজন্য আমি বলি, যা' করবে, তা' thoroughly (পুরোপুরি) করবে, নিখুঁতভাবে করবে। এই নিখুঁত করা ও জানার অভ্যাসই আমাদের পূর্ণতার পথে এগিয়ে দেয়। অনেকে হীনম্মন্যতার বশে স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ম্মকে ত্যাগ করতে চায়। তার চাইতে ভুল আর নেই। সহজাত কর্ম্ম তা' যার যাই হোক না কেন, তার ভিতর-দিয়েই মানুষ চরম জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারে। নইলে তার জ্ঞানের কপাট খোলে না। তাই গীতায় আছে, 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'। তোমার যা' সম্পদ্ আছে, তার উপর দাঁড়িয়েই তুমি আরোর পথে হাত বাড়াও। তোমার সম্পদ্‌কে তুমি যদি অবহেলা কর, তবে বাইরের সম্পদ্‌কেও তুমি আয়ত্ত করতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একবার তামাক খেয়ে গাত্রোত্থান করলেন।

খানিকটা পরে এসে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় চৌকিতে পাতা বিছানায় বসলেন। বাইরে রেশ রোদ, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানে বসেছেন, সেখানে রোদ নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে মাত্র একটি আদ্দির চাদর। আজকাল যুদ্ধের বাজারে ভাল কুইনাইন পাওয়া যাচ্ছে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেনদাকে বললেন—ছাতিম-ছালের গুণাগুণ দেখেন তো। আমার মনে হয় ছাতিমছাল দিয়ে কুইনাইনের প্রয়োজন অনেকখানি মেটান যায়।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বই দেখে বললেন—হ্যাঁ। তা' হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাথায় রাখবেন। কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তাও ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন। পরে আপনার সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করব। আমাকে মনে করিয়ে দেবেন। আর, নদীয়া এদিকে থাকে তো ওকে একবার ডাকেন তো।

বীরেনদা নদীয়া-দাকে (বসাক) ডাকতে গেলেন।

ইতিমধ্যে একখানা উড়োজাহাজ খুব নীচু দিয়ে চ'লে গেল। কয়েকজনে বললেন—খুব নীচু দিয়ে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ঔৎসুক্যভরে চৌকী থেকে নেমে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখলেন।

পরে নিজের জায়গায় এসে বসলেন। শ্রীশদাকে (রায়চৌধুরী) বললেন—Aeroplane (উড়োজাহাজ) ইত্যাদি করা যে খুব কঠিন, তা' আমার মনে হয় না। আমার ইচ্ছা ছিল, আপনাদের এমন ক'রে তৈরী করি যে, আপনাদের অপারা, অজানা কিছুই থাকবে না। বিশ্ববিজ্ঞান, কারখানা ইত্যাদি করার পিছনেও আমার ঐ উদ্দেশ্য। কি বিজ্ঞানের দিক দিয়ে, কি যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে—কোন দিক্ দিয়ে আমাদের দেশের খাঁকতি থাকে, তা' আমার ভাল লাগে না। ধর্ম্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আপনারা সব ব্যাপারে অদ্বিতীয় হ'য়ে ওঠেন, এই আমার ইচ্ছা। এই বাস্তব দক্ষতা যদি না ফোটে, তবে ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায় শুধু কথার কথা। শিক্ষা কাকে বলে, সভ্যতা কাকে বলে, কৃষ্টি কাকে বলে, দেবদক্ষ চৌকস মানুষ কাকে বলে, আমার বড় সাধ হয় তার নমুনা দেখাতে। আপনারা যে ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে বাইরে কাজকর্ম্ম করছেন, আপনারা কত অসাধ্য সাধন করছেন। সাড়া-ব্রিজে আপনারা কী কাণ্ডটা করলেন,

সাহেবরা পর্যন্ত অবাক্ হ'য়ে গেল। তাই দেখেন, আপনাদের ক্ষমতা কিন্তু কম নয়। একমুখী হয়ে লাগলেই হয়। সব চাইতে বড় অভাব দাঁড়িয়েছে মানুষের। আপনারা গোটা কয়েক মানুষ, এখন কোন্ দিক যাবেন, আর কি করবেন। তাই তো বলি লোক-সংগ্রহের কথা, যাজনে চারিদিক flood (প্লাবিত) ক'রে দেন, ভাল-ভাল কর্ম্মী সব নিয়ে আসেন। ১৩০ টাকার ব্যাপার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেন। একসঙ্গে সব দিকে ধুম লাগায়ে দেবো নে। যুদ্ধ ঘরের দোরে এসে পড়েছে। আমাদের এখন খুব দ্রুত চলা লাগবে।

শ্রীশদা—এই ডামাডোলের মধ্যে কাজ করাই কঠিন। তারপরে মানুষগুলি এত callous (অসাড়) যে, কিছুই যেন মাথায় ঢোকে না। সম্মুখে সমূহ বিপদ দেখেও হুঁশিয়ার হয় না। বললেও বুঝতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই তো কাজের সুবর্ণ সুযোগ। অসাড় যাকে বলছেন—তার মধ্যেও যা'তে সাড়া জাগে, তেমনতর সম্পদ্ নিয়ে আপনার হাজির হ'তে হবে তার কাছে। লোহাকে যদি গলাতে চান, তবে লোহা যে তাপে গলে, সেই তাপে ফেলেন তাকে। আপনাদের তপস্যা ও আগ্রহ-উন্মাদনা এতখানি প্রবল হওয়া চাই, যার সান্নিধ্যে কেউই অসাড় না থাকতে পারে। বনের পশুও যেন আপনাদের কাছে এসে ধরা দেয়। সারা দেশটাকে ভূমিকম্পের মত নাড়া দেন, সাড়া নিশ্চয়ই জাগবে। পূর্ব্বপুরুষের রক্ত এখনও মরেনি।

প্রেরণার অনল-দীপনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ-মুখ জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠেছে। উপস্থিত সবাই উদগ্র আগ্রহে সেই দিব্যদ্যুতি নিরীক্ষণ করছেন, আর তাঁদের প্রাণ অমৃত-উদ্দীপনায় ভরপূর হ'য়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে নদীয়াদা ও সেই সঙ্গে রাধারমণদা (জোয়ার্দ্দার) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ২।১ জনকে ছাড়া আর সবাইকে স'রে যেতে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাছে-দূরে ধানের জমি যা' পাও, সেগুলির জন্য খোঁজ হাটাতে থাক। কোন্ সময় কী অবস্থা এসে পড়ে বলা যায় না। কত লোক হয়তো তোমাদের আশ্রয় নেবে। তাদের খাওয়াতে হবে। জমি না থাকলে পারবা না। এখন যে জমির চাষ হ'চ্ছে না, পতিত অবস্থায় আছে, অথচ চাষযোগ্য, তাও কিনতে পার। বেশী গরজ দেখাতে গিয়ে আবার দাম বাড়ায়ে দিও না। আর, বেশী সোরগোল ক'রো না। চুপিসারে কাম সা'রে ফেলবা। কোন জমি কিনতে গেলে সর্ত্ত-টর্ত্ত ভাল ক'রে দেখে-শুনে নেবা। জমি কিনতে যেয়ে যেন কতকগুলি মামলা কিনে ব'সো না। যেখানে যা' কর স্থানীয় মোড়লদের হাতে ক'রে নিয়ে করবা। দলিল-দস্তাবেজ, রেজিষ্ট্রী অফিসের কাগজ-পত্র, ম্যাপ,

পরচা, সীমানা, সরিক, খাজনা-বাজনা সব-সম্বন্ধে ভাল ক'রে খোঁজ নেবা। তাড়াহুড়ো ক'রে কিছু করবার দরকার নেই। তোমরাও খোঁজ-খবর নিতে থাক। আমিও প্রস্তুত হই। যেমন-যেমন খোঁজ-খবর পাবা, বঙ্কিমকে জানায়ে রাখবা।

ওঁরা সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার ওখান থেকে উঠে মাতৃমন্দিরের পাশ দিয়ে খেপুদার বারান্দার দিকে আসছেন। চটি পায় দিয়ে থপথপ ক'রে পা ফেলছেন, শরীরটা একটু দুলছে। পাশে কয়েকজন দোকানদার তরিতরকারি ও পাটালি নিয়ে বসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আসতেই তারা উঠে দাঁড়ালো। শ্রীশ্রীঠাকুর স্নিগ্ধ হাসিতে তাদের অভ্যর্থনা করলেন, তারা খুশি হ'য়ে উঠলো। আসতে-আসতে আশ্রম-প্রাঙ্গণের বাবলাগাছটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর এক-জোড়া সুন্দর নীল পাখী দেখে বললেন—'এ কী পাখী রে?' যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরা কেউ বলতে পারলেন না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ দোকানদারদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এই, তোরা দেখ্ তো, ঐ দুটো কী পাখী?' তারাও দেখে বলতে পারল না, শুধু বললো, 'সবসময় এ পাখী দেখা যায় না। শীতকালে কোন-কোন সময় আসে।' শ্রীশ্রীঠাকুর আরো অনেককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু কেউই নাম বলতে পারলেন না। ইতিমধ্যে পাখী-দুটো উড়ে দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, 'চ'লে গেল, না হ'লে বড়খোকাকে ডাকলে সে বোধ হয় বলতে পারতো। পাখী-দুটো বড় সুন্দর। কোন্ দেশ থেকে এখানে এসেছে, ভেবেছে, আসলাম যখন আশ্রমটা দেখেই যাই। এসেছে তো একক আসেনি, দোসর নিয়ে এসেছে। ওদের চেহারা দেখলে মনে হয়, ওরা যেন কত সুখী। আর একটু পরে আসলে ওদের দেখা পেতাম না। আবার আসবে কি না ঠিক কি?'

বলতে-বলতে খেপুদার বারান্দায় এসে বসলেন। একটা হাতলওয়ালা বেঞ্চে পেছন দিকে ঠেস দিয়ে, পা'টি রোদে রেখে পূর্ব্বাস্য হ'য়ে বসেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে বঙ্কিমদা (রায়), উমাদা (বাগচী), শশধরদা (সরকার) প্রভৃতি অনেকে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে রহস্যজড়িতভাবে বলছেন—অচানক কত কথা মনে হয়। কত স্মৃতি জাগে। মনে হয় সব সত্যি। সব কথা কই না। ভাবি, মানুষ হয়তো পাগল ভাববে। হঠাৎ একটা গরু, কুকুর, পাখী, মানুষ, গাছ বা ফুল দেখে মনে হয়, যেন আগে একে কোথায় দেখেছি, সেই সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রের পর চিত্র ভেসে আসে, জীয়ন্ত সে চিত্র। এগুলি কী, ভাল ক'রে ঠাওর পাই না।

প্রফুল্ল—সবাইকে দেখলে কি অমন মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, তা' নয়। তবে যাকে দেখি তাকেই মনে হয় যেন আমার

জিনিস। ও ভাল থাক্, সুখে বেঁচে-বর্ত্তে থাক্।

কালিদাসীমা—কেউ যদি দীক্ষিত না হয়, তাহ'লেও এই মনে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পোকাটাকেও দেখলে তার জন্যও স্বতঃই এমনি একটা আগ্রহাকুল ইচ্ছা জেগে উঠে, আপনা থেকেই এমন হয়। কারও জন্য কিছু করতে পারলে আমার মনে হয়, আমিই বর্ত্তে গেলাম। কারও জন্য কিছু করণীয় বুঝেও যদি কোন কারণে করতে না পারি, তাহ'লে আমার আপসোসের সীমা থাকে না। অবশ্য, কেউ দীক্ষিত শুনলে আমার খুব ভাল লাগে। কারণ, একজন যদি আমার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হয়, তবে আমি তার জন্য করার সুযোগ পাই বেশী। মানুষের জন্য কিছু করতে গেলে তার ইচ্ছার সূতো ধ'রে করতে হয়। আমি যতটুকু জানি, যতটুকু বুঝি তা' বলি, সেই নির্দ্দেশগুলি যদি কেউ মেনে চলে, সে যতটুকু উপকৃত হবে, যে মেনে চলবে না, সে ততখানি উপকৃত হ'তে পারে না। আমি তার ভাল যতই চাই না, সে যদি সহযোগিতা না করে, সেখানে আমার কিছু করবার থাকে না। সেখানে তারও কষ্ট, আমারও কষ্ট। অথচ নিরুপায়।

অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য)—আপনার দয়া থাকলে তার মনও ঘুরে যেতে বাধ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া সবার উপর এমনিতেই আছে। থাকলে বা যদি ব'লে কোন কথা নেই। সেই দয়া সফল হয় না, যদি পরমপিতার উপর আমাদের দয়া না থাকে, তাঁকে যদি রক্ষা ক'রে না চলি আমরা। তিনি সবসময়েই আমাদের মঙ্গল করার জন্য ব্যস্ত, তিনি মঙ্গলস্বরূপ। আমরা অমঙ্গল টেনে আনি আমাদের স্বেচ্ছাচারিতা দিয়ে। কুকর্ম্মের ফলে দুঃখে প'ড়ে আমরা অনেক সময় বলি, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা ! আমি কী করব ?' কিন্তু ঈশ্বর কখনও চান না যে আমরা অযথা দুঃখে ভুগি। আমরা বাঁচি, বাড়ি, সার্থকথার পথে চলি, এই তিনি চান। সত্তারূপে তিনি সবার মধ্যেই আছেন, কেউ কি চায় যে তার সত্তা খামাকা নিপীড়িত হো'ক ? আমাদের সত্তা মূলতঃ তাঁরই। তাঁ থেকেই যা'-কিছু উৎসৃষ্ট হয়েছে।

অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য)—তবু আমরা দুঃখ পাই কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখ পাই প্রবৃত্তিমুখী হ'য়ে। আশু যদি আপনার কথা না শুনে নিজের খেয়ালে চ'লে দুঃখ ভোগে, সেখানে কি আপনি ঠেকাতে পারেন ? আপনি তো চান না যে সে বেচাল চলনে চ'লে দুঃখ পায়, কিন্তু কথা যদি না শোনে কীই বা আপনি করতে পারেন ? হয়তো শাসন করতে পারেন, কিন্তু শাসন করলেও যদি না শোনে ?

এমন সময় সুরেশদা (মুখোপাধ্যায়) আসলেন। সুরেশদাকে দেখেই

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বললেন—সুরেশদাকে বসতে দে।

সুরেশদা (হাতজোড় ক'রে)—ঠাকুর, আপনি আমাকে বসাবার জন্য অতো ব্যস্ত হ'লে আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি কথা ? আপনি বুড়ো মানুষ, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, সে কি আমার ভাল লাগে ? আর, এদেরও তো সেদিকে খেয়াল থাকা চাই, আমার ব্যস্ত হওয়া লাগে না, বলা লাগে না, এরা যদি হুঁশিয়ার হয়। এদের নজর নেই দেখে আমার বার-বার স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। এই শ্রদ্ধা দেখানটুকু যদি না শেখে তবে যে কিছুই হবে না।